যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের ডক্টরেট অফ ফিলজফি (পি এইচ ডি) উপাধির আংশিক শর্ত পূরণে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭)

গবেষক

আজহারুল মিদ্দা

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI0402717

রেজিস্ট্রেশন তারিখ: 12/12/2017

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়

প্রফেসর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

কলকাতা ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৪

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের ডক্টরেট অফ ফিলজফি (পি এইচ ডি) উপাধির আংশিক শর্ত পূরণে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭)

গবেষক

আজহারুল মিদ্দা

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI0402717

রেজিস্ট্রেশন তারিখ: 12/12/2017

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়

প্রফেসর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

কলকাতা ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

"ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০ – ১৯৪৭)" submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of ***Dr. Suchetana Chattopadhyay, Professor, Department of History, Jadavpur University*** And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:

Candidate:

Dated:

Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০–১৯৪৭)" গবেষণা কাজটি পূর্ণতা পেতে যার নাম না করলেই নয় তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া। তিনি আমাকে আমার গবেষণা কার্যে তাঁর নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও যথাসম্ভব সহযোগিতা করেছেন। আমার গবেষণা সম্পর্কিত দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য বই দিয়ে এবং তার হদিশ পাইয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। এজন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক সুচেতনা মহাশয়ার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে গবেষণা করার সুবাদে আমার গবেষণা কার্যটি কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং গবেষণায় কীভাবে মৌলিকত্ব আনবো সে সম্পর্কে আমার তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস বিভাগের রূপ কুমার বর্মণ, মেরুনা মুর্মু, নূপুর দাশগুপ্ত, মহুয়া সরকার, সুদেষ্ণা ব্যানার্জী প্রমুখ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন। তাই এনাদের সকলের প্রতি আমি চিরঋণী। আমাদের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দেবজিৎ দত্ত এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক বিজয়া কুমার দাস মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এনারা গবেষণা কাজে আমার উপদেষ্টক হিসাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভুলগুলি ধরিয়ে দেন যারফলে আমি গবেষণা কার্যটি সমৃদ্ধ করতে পারি। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক কৌশিক রায় মহাশয়কে যিনি নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

গবেষণা কার্যের আকর উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, ঐতিহ্যবাহী মেরিটাইম আর্কাইভ, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভ প্রভৃতি সংগ্রহশালার কর্মকর্তাগণ আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য প্রদান করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাগণও বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বইয়ের সন্ধান পেতে আমাকে সহায়তা করেছেন। তাই এদের সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার গবেষণা কাজটি সমৃদ্ধ করার জন্য সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, বাংলার নাবিক বংশোদ্ভূত কলকাতার তালতলায় বসবাসরত সৈয়দ মাসুদ আলিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যিনি তাঁর পূর্ব পুরুষদের নাবিক কর্মজীবনের বিভিন্ন বিষয় তাঁর স্মৃতিচারণায় আমাকে জানিয়েছেন। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Central Library –র কর্মকর্তাগণ এবং আমাদের ইতিহাস বিভাগের Departmental Library –র বনানী দি, শিশির দা ও

জয়শ্রী দি বইগুলি আমাকে যত্নসহকারে দিতেন যা আমি আমার গবেষণা কার্যে ব্যবহার করার অবকাশ পেয়েছি। ইতিহাস বিভাগের অফিসের কর্মকর্তাগণ ভরত দা, সজল দা, প্রতিমা দি বিভাগীয় নানা কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাই সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার গবেষণা কাজে আমি আত্রি দি, সুমিত, ঋত্বিক, কাবেরী, সুশীল, প্রসেনজিৎ, কৃষ্ণ দা, শেখর দা, সোমা দি, সরফরাজ, ইয়াংদেন, উমি, ইমরান, নাসির এ সকল সহ-গবেষকবৃন্দের কাছে নানা ভাবে উপকৃত হয়েছি। আমার গবেষণায় রাকিব দা টেকনিক্যাল সমস্যা জনিত বিষয়গুলি সংশোধন করে দিয়ে আমাকে অনেকটা সহযোগিতা প্রদান করেছে। আরও জানাই আমার স্ত্রী ফারহানা পারভিন গবেষণার সমস্ত অংশটির বাক্য এবং বানান সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সংশোধন করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করাই আমি অনেকটা উপকৃত হয়েছি। এছাড়াও আমার গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আরও অনেকেই সহযোগিতা করেছে বা করেছেন তাদের সকলের নাম আমার অজ্ঞাতে বা স্বল্প পরিসরের মধ্যে উল্লেখ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাদের সকলের উদ্দেশ্যে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

আজহারুল মিদ্দা
গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সাংকেতিক শব্দসমূহ (Abbreviation)

ADMN – Administration Department (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট)

AIML – All-India Muslim League (অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ)

AITUC – All India Trade Union Congress (নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস)

AISF – All India Seamen's Federation (নিখিল ভারত সীমেন্স ফেডারেশন)

ARP – Air Raid Precautions (এয়ার রেড প্রিকিউশন)

ASU – Asiatic Seamen's Union (এশিয়াটিক সীমেন্স ইউনিয়ন)

BISN – British India Steam Navigation Company (ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি)

BTUF – Bengal Trade Union Federation (বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন)

CDC – Continuous Discharge Certificates (কন্টিনিউয়াস ডিস্‌চার্জ সার্টিফিকেট)

CPI – Communist Party of India (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া)

FOP – Floating outpost and its Personnel (ফ্লোটিং আউট পোস্ট অ্যান্ড ইটস্ পারশোনেল)

IB – Intelligence Branch (ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ)

I.G.N. & R. – India General Navigation and Railway Company (ইন্ডিয়া জেনারেল ন্যাভিগেশন অ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি)

IGSN – India General Steam Navigation Company (ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি)

IJMA – Indian Jute Mills Association (ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন)

ILO – International Labour Organization (ইন্টারন্যাশানাল লেবার অর্গানাইজেশন)

INC – Indian National Congress (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস)

INSU – Indian National Seamen's Union (ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন)

ISU – Indian Seamen's Union (ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন)

ISBU – Indian Seamen's Benevolent Union (ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়ন)

ITF – International Transport workers' Federation (ইন্টারন্যাশানাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন)

IQMU – Indian Quarter Masters' Union (ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার্স ইউনিয়ন)

KPT – Kolkata Port Trust (কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট)

P.C. – Port Commissioner (পোর্ট কমিশনার)

P&O – Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (পেনিন্সুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি)

R.S.N. – River Steam Navigation Company (রিভার স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি)

TUC – Trade Union Congress (ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস)

WBSA – West Bengal State Archives (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা)

পরিভাষাকোষ (Glossary)

- **অলি-আউলিয়া:** অলি বা ওলি এর বহুবচন হল আউলিয়া, এটি একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হল রক্ষক বা সাহায্যকারী।
- **আড়কাঠি:** আড়কাঠি শব্দের অর্থ হল শ্রমিক সংগ্রহকারী। ঔপনিবেশিক বাংলাতে আড়কাঠিদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এরা ইউরোপীয় কোম্পানি মালিকদের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে দালাল হিসাবে কাজ করত। গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষদের বিদেশে কিংবা জাহাজে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারক আড়কাঠিরা তাদের বিদেশী কোম্পানির হাতে হস্তান্তর করত এবং কোম্পানি এদের ক্রীতদাস হিসাবে বিদেশে পাচার করে দিত।
- **কুলি:** স্বল্প পারিশ্রমিকে নিযুক্ত শ্রমিকদের কুলি বলা হয়। এরা মূলত ঔপনিবেশিক ভারতে মালবহনকারী কাজে নিযুক্ত থাকত। অঞ্চলভেদে এদের কোলিস (Kolis), ললস (Lols) প্রভৃতি নামে ডাকা হত।
- **বাবু:** ঔপনিবেশিক ভারতে বাবু শব্দটি সরকারী অফিস কেরানিদের নামের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। যেমন মশাই, বাবুজি, স্যার ইত্যাদি।
- **খোরাকি:** খাইখরচ, আহারাদির জন্য যে টাকা প্রদান করা হয় তাই খোরাকি।
- **খালাসি:** খালাসি বলতে ডকইয়ার্ড কর্মী বা নাবিক বা লস্করদের বোঝানো হয়।
- **খিলাফত:** খিলাফত হল ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা হজরত মহম্মদ (সাঃ) :এর উত্তরাধিকারীর দ্বারা মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক একতার প্রতিনিধিত্বকারী।
- **ঘাট-সারেং:** জাহাজে নাবিক শ্রমিক সরবরাহকারী দালালদের ঘাট-সারেং বলা হয়।
- **দাদন:** কোনো কাজের জন্য অগ্রিম যে টাকা দেওয়া হয় তা দাদন নামে পরিচিত।
- **দালাল:** ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি কাজে অর্থের বিনিময়ে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিদের দালাল বলা হয়।
- **নাবিক:** নৌ বা জাহাজ পরিচালনায় দক্ষ ব্যক্তিকে বলা হয় নাবিক।

- **পয়গম্বর:** পয়গম্বর একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হল বার্তাবাহক।
- **পীর:** পীর একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ বয়োজ্যেষ্ঠ। সুফি সাধক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের মূলত পীর বলা হয়।
- **ফাইফরমাশ:** ছোটোখাটো বা টুকিটাকি কাজ কর্মের হুকুম।
- **মহাজন:** মহাজন সংস্কৃত শব্দ, যার আক্ষরিক অর্থ মহৎ মানুষ। তবে ঔপনিবেশিক বাংলায় যারা সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দিত বা বাট্টার বিনিময়ে টাকাকড়ি ভাঙিয়ে দিত তারা মহাজন হিসাবে পরিচিত ছিল।
- **মুহাজির:** মুহাজির শব্দটি আরবি থেকে এসেছে। ৬২২ সালে হজরত মহম্মদ (সাঃ) এবং এর অনুসারীগণ মক্কা থেকে মদীনা শহরে আগত হয়ে বসবাস শুরু করেছিল। মক্কা থেকে মদীনা শহরে আগত ব্যক্তিদের বলা হত মুহাজির। উর্দুতে এই মুহাজির শব্দের অর্থ হল অভিবাসী। ১৯৪৭ সালে পকিস্থান সৃষ্টির পর অভিবাসী হিসাবে পাকিস্থানে থেকে যাওয়া ভারতীয় মুসলিমদের মুহাজির বলা হয়ে থাকে।
- **মুরুব্বি:** অভিভাবক বা সহায়ক বা পৃষ্ঠপোষক।
- **লস্কর:** ফার্সি ও উর্দুর সংমিশ্রণে লস্কর শব্দের উদ্ভব হয়েছে, যার অর্থ হল সৈনিক। তবে ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের লস্কর হিসাবে চিহ্নিত হতে দেখা গিয়েছে।
- **সর্দার:** দলপতি বা গোষ্ঠীর প্রধানকে সর্দার বলা হয়।
- **সারেং:** জাহাজের প্রধান পরিচালক 'সারেং' বা 'সারেঙ' নামে পরিচিত।
- **সাহেব:** সাহেব আরবি শব্দ সাহিব থেকে এসেছে যার অর্থ প্রভু বা মালিক।
- **সুখানী:** জাহাজের চালককে সুখানী বলা হয়।
- **হিজরত:** হিজরত কথার অর্থ পরিত্যাগ করা। মূলত ৬২২ সালে হজরত মহম্মদ (সাঃ) এবং তার অনুসারীরা মক্কা থেকে মদীনায় গমন করার ঘটনার পর থেকে হিজরত কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

চিত্র ও সারণি সূচি

চিত্র সূচি:

- চিত্র সংখ্যা: ১. গান্দা সিং -এর (Ganda Singh) এবং গান্দা সিং –এর আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার Emergency Certificate -এর ছবি ১১৯
- চিত্র সংখ্যা: ২. "Lascar War Memorial" –এর বাইরের দৃশ্য এবং এর সম্মুখ ভাগ অংশের ছবিগুলি ১২২
- চিত্র সংখ্যা: ৩. "Lascar War Memorial" –এর ভিতরের ছবিগুলি ১২৩
- চিত্র সংখ্যা: ৪. মুজফ্ফর আহ্মদের সম্পাদিত "গণবাণী" পত্রিকা ১৫৭
- চিত্র সংখ্যা: ৫. ১৯৪৬ সালের ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত "স্বাধীনতা" পত্রিকা ১৫৯
- চিত্র সংখ্যা: ৬. ১লা আগস্ট ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত "আজদ" পত্রিকা ২১৫

সারণি সূচি:

- সারণি সংখ্যা: ১. আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে বাংলার অভিবাসী নাবিকদের মিশ্র বিবাহ (১৯২২-১৯৩৭) ১১৪
- সারণি সংখ্যা: ২. ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমুদ্রগামী স্টিমার লাইনের সম্মতিতে ১৯১৯ সালের জুলাই–এ শিপিং মাস্টার কর্তৃক অনুমোদিত পরিবর্ধিত মজুরি বৃদ্ধির হার ১৪২-১৪৪
- সারণি সংখ্যা: ৩. শিপিং মালিক পক্ষ "no war – no war risk money" –এর অজুহাত ব্যবহার করে মজুরি হ্রাস করতে সফল হলে নাবিকদের মাসিক এবং বার্ষিক বঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ১৬৯
- সারণি সংখ্যা: ৪. ১৯২০ সালে শিপিং কোম্পানি এজেন্ট ও অভ্যন্তরীণ স্টিমার কর্মীদের যৌথ আলোচনায় ডেক-ক্রুদের নির্ধারিত বেতন হার ২০১
- সারণি সংখ্যা: ৫. ১৯২০ সালে শিপিং কোম্পানি এজেন্ট ও অভ্যন্তরীণ স্টিমার কর্মীদের যৌথ আলোচনায় ইঞ্জিন-ক্রুদের নির্ধারিত বেতন হার ২০১-২০২

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: i-ii

সাংকেতিক শব্দসমূহ: iii-iv

পরিভাষা শব্দ কোষ: v-vi

চিত্র ও সারণি সূচি: vii

ভূমিকা: ০১-৩১

প্রথম অধ্যায়:

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের ইতিহাস ৩২-৫৭

১.১. ভূমিকা ৩২

১.২. অবস্থানগত দিক দিয়ে বাংলার গুরুত্ব এবং কলকাতা বন্দর দ্বারা সংযোগ রক্ষাকারী শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের প্রবেশ ৩৪

১.৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বাংলার নাবিকদের সংগ্রামী জীবন পদ্ধতি ৩৮

১.৪. কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গঠন, বন্দর এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বন্দর ও নাবিক শ্রমিকদের যোগদান ৪৩

১.৫. বাংলার নাবিকদের উত্থান এবং ‘লস্কর’ নামে পরিচিতি লাভ ৪৮

১.৬. উপসংহার ৫১

টীকা ও সূত্র নির্দেশ ৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়:

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক স্বার্থে সীমেন্স ইউনিয়নের গঠন প্রক্রিয়া ও তার কার্যাবলী ৫৮-১০৪

১.১. ভূমিকা ৫৮

১.২. ঐতিহাসিক চৈতন্যের দ্বারা শ্রমিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার সীমেন্স ইউনিয়নের দিক্ নির্দেশনা ৬৩

১.৩. বাংলাতে অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের পাশাপাশি বৃহত্তর ইউনিয়ন রূপে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের আবির্ভাব ৬৭

১.৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান নামক ইউনিয়নটির বাংলার লস্করদের স্বার্থে ভূমিকা গ্রহণ ৭৬

১.৫. সীমেন্স ইউনিয়ন গঠনের প্রথমিক পর্ব ৭৯

১.৫.১. ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian Seamen's Union) ৮২

১.৫.২. আঞ্জুমান-ই-জাহাজাইন (Anjuman-i-Jahajian) ৮৫

১.৫.৩. ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian National Seamen's Union) ৮৫

১.৫.৪. ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃস্বার্থ যোগদান ৮৬

১.৬. ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian Seamen's Union) এবং এর সাংগাঠনিক কার্যাবলী ৮৭

১.৭. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের গুরুত্বলাভ ৯২

১.৮. উপসংহার ৯৬

টীকা ও সূত্র নির্দেশ ৯৮

তৃতীয় অধ্যায়:

বাংলার নাবিকদের বহির্বিশ্বে অভিগমনের মধ্যদিয়ে অভিবাসন লাভ এবং স্বদেশে আগত আভিবাসী নাবিকদের বিদেশে কর্মসম্পাদনের স্মৃতিচারণা ১০৫-১৩৬

১.১. ভূমিকা ১০৫

১.২. বাংলার নাবিকদের জাহাজের কর্মসূত্রে ভ্রাম্যমাণ শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ এবং অভিবাসন লাভের প্রক্রিয়া ১০৯

১.৩. যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বহির্বিশ্বে সমুদ্র যাত্রাকালীন সময়ে জাহাজে কর্মরত বাংলার নাবিকদের সংকটকালীন পরিস্থিতি ১১৯

১.৪. বাংলার সিলেটিদের জাহাজে নাবিক হিসাবে যোগদান এবং অভিবাসন লাভের ঘটনা ১২৭
১.৫. উপসংহার ১৩১
টীকা ও সূত্র নির্দেশ ১৩৪

চতুর্থ অধ্যায়:

বাংলার নাবিকদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন, সমাবেশ এবং ধর্মঘট (১৯২০-১৯৪৭) **১৩৭-১৮৪**

১.১. ভূমিকা ১৩৭
১.২. বাংলার নাবিকদের উত্থাপিত দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া ১৪০
১.৩. বাংলায় নাবিক স্বার্থে ISU -এর নেতৃত্বাধীন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘট ১৪৯
১.৪. বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলার নাবিকদের দ্বারা সংগঠিত ধর্মঘট ১৬০
১.৫. বাংলার জাহাজী নাবিকদের পাশাপাশি কলকাতা বন্দরকেন্দ্রিক শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে সমাবেশ এবং ধর্মঘট ১৭২
১.৬. উপসংহার ১৭৭
টীকা ও সূত্র নির্দেশ ১৮০

পঞ্চম অধ্যায়:

বাংলায় নদীকেন্দ্রিক ও উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন **১৮৫-২২৯**

১.১. ভূমিকা ১৮৫
১.২. বাংলার নদীপথে জলযানগুলির যাত্রাপথের সঙ্গে সম্পর্কিত নাবিকদের কর্মজীবন ১৯০
১.৩. বাংলার অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে কর্মরত নাবিকদের আশু অভাব-অভিযোগের ভিত্তিতে সংগঠিত ধর্মঘট, আন্দোলন ও সমাবেশ ১৯৯

১.৪. বাংলার নাবিক জীবন সম্পর্কিত শ্রম চেতনায় কবি এবং সাহিত্যিকদের লেখনীগুলির সাহিত্যে প্রতিফলিত রূপ নিদর্শন ২১৬
১.৫. উপসংহার ২২০
টীকা ও সূত্র নির্দেশ ২২৩

উপসংহার: **২৩০-২৩৭**

নির্বাচিত গবেষণা উপাদান ও তথ্যসূত্র: **২৩৮-২৫৫**

পরিশিষ্ট: **২৫৬-২৭৬**

ভূমিকা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রধরে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ভারতে যে শিল্পায়ন (Industrialisation) ঘটেছিল সেখানে বিদেশী পুঁজিপতিরা পুঁজি বিনিয়োগ করে আর্থিক মুনাফা লাভের মাধ্যমে তাদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়েছিল। এরা শুধু আর্থিক মুনাফা লাভেই ক্ষান্ত থাকেনি, এই পুঁজি ভিত্তিক কোম্পানি এবং সংস্থাগুলির তীব্র প্রতিযোগিতা শ্রমিক শোষণের একটি বাড়তি মাত্রা সংযুক্ত করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে পাটকল, বস্ত্রকল, চা-বাগিচা, কয়লা, লৌহ-ইস্পাত, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, জাহাজ, বন্দর, প্রভৃতি শিল্প এবং কলকারখানাগুলি ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। এই গড়ে ওঠা শিল্প কলকারখানাগুলির ক্রমশ উন্নতিসাধন ঘটলে একই সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সম্প্রসারণ ঘটেছিল, যারফলে শিল্প কলকারখানাগুলিতে বিপুল শ্রম চাহিদা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, সেইসূত্রে ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক পরিবহনে ব্যবহৃত জলযানগুলিতে বৃহৎ সংখ্যক শ্রমের সংযোগসাধন ঘটেছিল। তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জলপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত ছিল এজন্য এই ক্ষেত্রটিতে বিপুল সংখ্যক শ্রম চাহিদা দেখা গিয়েছিল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড, পর্তুগিজ প্রভৃতি ইউরোপের উন্নতদেশগুলি ল্যাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশের অনুন্নত বিভিন্ন দেশগুলিতে উপনিবেশায়ন (Colonization) ঘটিয়ে ইউরোপের স্বতন্ত্র কোম্পানি বা এজেন্সিগুলির দ্বারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগের (Private investment) মাধ্যমে পুঁজি শোষণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণ ঘটিয়েছিল। এখানে শ্রেণী কাঠামোয় শ্রমিকদের জাতিগত বর্ণ বৈষম্যের দ্বারা শ্রেণী বিভাজন ঘটিয়ে শ্রমিক ইতিহাসে একটি নতুন দিক সংযোজিত হয়েছিল।[১]

ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের দিকটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার আগে পূর্বে শ্রমিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলি অনুধাবন করার জন্য ইউরোপীয় শ্রমিকদের ক্ষেত্রটি কীরূপ ছিল সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। ইউরোপে শ্রমিকদের উত্থানের পশ্চাতে ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।[২] অষ্টাদশ শতকের ছয়ের দশকের পর ইউরোপে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল তা ইউরোপীয় দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী

করে তুলেছিল ঠিকই তবে এখানে ধনতান্ত্রিক পুঁজি ব্যবস্থাপনার মধ্যদিয়ে সামাজিক পরিকাঠামোতে শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান ঘটতে দেখা গিয়েছিল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপে গড়ে ওঠা আধুনিক শিল্প এবং কলকারখানাগুলি পুঁজিগত ব্যক্তি মালিকানার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং এখানে রাষ্ট্রগুলিও পুঁজি স্বার্থের নিয়ন্ত্রক ছিল। ইংল্যান্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই তবে শ্রমিকরা গণভিত্তিক, রাজনৈতিক এবং বৈপ্লবিক রূপে নিজেদের সামিল করার রসদ খুঁজে পেয়েছিল। এরফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর ইউরোপে একে একে শ্রমিক আন্দোলনগুলি সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল।[৩]

চার্টিস্ট আন্দোলনের সময়কালে দ্য একজাইলস লীগ (১৮৩৪ – ৩৬), ফেডারেশন অব দ্য জাস্ট (১৮৩৬ – ৪১), কমিউনিস্ট লীগ (১৮৪৭ – ৫২) এগুলির মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত করা। ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্কের অবনতির অন্যতম কারণ ছিল পুঁজিপতি মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের উপর অবাধ শোষণ।[৪] পুঁজি শোষণ থেকে শ্রমিকদের পরিত্রাণের জন্য কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালে *Das Capital* রচনা করেন যেখানে তিনি পুঁজি এবং শ্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৫] তাঁর এই গ্রন্থে সামাজিক পরিকাঠামোতে সাম্যতার কতটা প্রয়োজনীয়তা আছে তা যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এঞ্জেলস মার্কসের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে দেখানো হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীকে কোন পথ অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন, যেটি ছিল মূলত ধনতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের বিপ্লবী পথ। আবার এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূল মন্ত্র বর্ণিত হয়েছিল মার্কস এবং এঞ্জেলসের রচিত কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'তে। মেনিফেস্টো'তে বিশ্বের অন্য সকল দেশের শ্রমিকদের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। ধনতান্ত্রিক শোষণ শুধুমাত্র কোনো একটি বিশেষ দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল না এই প্রক্রিয়া বিশ্ব জুড়ে অব্যাহত ছিল। এজন্য শ্রমিক আন্দোলনকেও সর্বস্তরে চূড়ান্তভাবে ধনতন্ত্রের মোকাবিলা করার জন্য সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকদের একযোগে সংঘবদ্ধ রূপে সামিল হতে হবে। পরবর্তীকালে মার্কসীয় চিন্তা চেতনার প্রভাব পড়েছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে। এখানে চিন্তাশীল যুক্তিবাদী নেতা লেনিনের নেতৃত্বে মার্কসীয় প্রভাবকে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন "প্রতিভাদীপ্ত, স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতায় এই রচনাটিতে

রূপায়িত হয়েছে নতুন বিশ্ববীক্ষা, সমাজ, জীবনের ক্ষেত্রের উপরও প্রযোজ্য সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সব থেকে সর্বাঙ্গীণ ও সুগভীর মতবাদ- দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব"।[৬]

শ্রমিক আন্দোলনগুলি ধনতান্ত্রিক পুঁজি স্বার্থ বিরোধী হিসাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের অবস্থানকালের নিরিখে চরিত্রগত ভিন্নতা দেখা গিয়েছিল। ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনগুলি মূলত পুঁজি বিরোধী, যেখানে শ্রমিকদের মূল দাবিগুলির মধ্যে বেতন বৃদ্ধি, বেতনের মাপকাঠিতে শ্রমিকদের কর্মের সময়কাল নির্ধারণ এবং এরই সঙ্গে শ্রম সংক্রান্ত হিতকর রাষ্ট্রীয় আইনি বিধিগুলি কার্যকর করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। রাশিয়ায় যে শ্রমিক আন্দোলন ঘটেছিলে সেখানে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে শ্রমিকেরা তাদের অভাব অভিযোগগুলি ব্যক্ত করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক আন্দোলনগুলির মধ্যেও রাজনৈতিক এবং সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রতিফলিত হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল।[৭] রজনীপম দত্ত মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণের একটি প্রতিচ্ছবি তাঁর *India To-day* নামক শীর্ষক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিভিন্ন পর্যায়গুলি দেখিয়েছেন, যেখানে শোষণের ব্যাপকতা এতটাই বেশি ছিল যে নিম্নস্তরের শ্রমজীবী মানুষের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল যা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। তিনি আরও দেখিয়েছেন ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে ইউরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যিক কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রভৃতি সংস্থাগুলি লগ্নি পুঁজি দিয়ে ঔপনিবেশিক শোষণ ঘটিয়েছিল।[৮] ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় শ্রেণী শোষণে এই পুঁজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল। আবার এরই সঙ্গে বিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশকে অস্থির করে তুলেছিল এবং ১৯১৪ সালে ইউরোপে সংগঠিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক ভারতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি এই মহাযুদ্ধের সামরিক-অসামরিক ব্যয়ভার এবং যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির বিপুল অর্থনৈতিক চাপ ঔপনিবেশিক ভারতের উপর আরোপ করেছিল। যুদ্ধের এই ক্ষতিকর প্রভাবগুলি ঔপনিবেশিক ভারতে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটলে এর ভয়ঙ্কর প্রভাব সাধারণ জনগণ সহ শ্রমিক কূলকে সর্বস্বান্ত করে তুলেছিল।[৯] বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) গঠন

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯২০ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (AITUC) প্রতিষ্ঠা লাভ ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের প্রাথমিক ভাবে এক ছত্রতলে আনতে পেরেছিল। এরফলে বিংশ শতকের দুইয়ের দশকের পর শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মধ্যদিয়ে সংগঠিত হয়ে পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের অবকাঠামো থেকে মুক্তির জন্য সভা-সমাবেশ, আন্দোলন এবং ধর্মঘটগুলির মধ্যদিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রধরে ভারতে যে শিল্পায়ন ঘটেছিল তা বাংলার পটভূমিতে হুগলী নদী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই নদীকে কেন্দ্র করে শিল্প নগরী হিসাবে কলকাতার আত্মপ্রকাশের মূলে একদিকে যেমন বিভিন্ন শিল্পের সমাহার ছিল অন্যদিকে জলপথে অন্তর্দেশীয় এবং বহির্দেশীয় বাণিজ্যের ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। জলপথে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটার ফলে কলকাতা বন্দরের জৌলুস বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার দীর্ঘ দেড়শো বছরের অধিক সময়কাল যাবৎ কলকাতা ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী শহর হিসাবে স্থায়িত্ব লাভের ফলে বহু ইউরোপীয় পুঁজি সংস্থার ব্যবসায়িক সূত্রে আগমন হওয়ার দরুন এখানে স্থায়ীভাবে শিল্পায়ন ঘটাতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা বহন করেছিল। ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে ইউরোপীয় পুঁজির সহবস্থানে শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল ঠিকই তবে এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যদিয়ে ঔপনিবেশিক শোষণ শ্রমিকদের আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে ফেলেছিল। ঔপনিবেশিক সময়ে পাট, বস্ত্র, লৌহ-ইস্পাত, কয়লা, চা-বাগিচা প্রভৃতি লাভজনক বৃহৎ শিল্পগুলি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। বাংলার সাধারণ কৃষিভিত্তিক মানুষগুলি নতুন জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে এই শিল্পগুলিতে যোগদান করেছিল। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে মহেশের বেদনাদায়ক মৃত্যুর পর অভাবের তাড়নায় গফুরের চটকলে কাজের জন্য গ্রাম থেকে শহরে আসার ঘটনাটির একটি প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেছে।[১০] অন্যদিকে ঔপনিবেশিক বাংলায় বিদেশী পুঁজির সন্নিবেশ ঘটে শ্রম সহযোগে যেভাবে স্থানীয় শিল্পগুলি সেজে উঠেছিল একইসাথে শিল্পের সঙ্গে বাণিজ্যিক সেতু বন্ধনে বন্দর পরিকাঠামো এবং জাহাজ, স্টিমার, বোট প্রভৃতি জল পরিবহণে ব্যবহৃত জলযানগুলির অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন ঘটেছিল। শিল্পের মতো বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জলযানগুলিতেও ব্যাপক শ্রমের চাহিদা দেখা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় এই শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রগুলিতে গ্রাম বাংলার

অগণিত মানুষের ঢল ইউরোপীয় পুঁজি মালিকদের কাছে একটি সস্তা শ্রম বাজার হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। এরফলে এসকল শ্রমিকদের খুব সহজেই শোষণ করা গিয়েছিল। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ঔপনিবেশিক ভারতের শাসন কাঠামোয় পুঁজি শোষণ ভয়ংকর রূপে উপবিষ্ট হওয়ার দরুন এর ক্ষতিকর দিকগুলি শ্রমিকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

শ্রমিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার নাবিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

বিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ভারতে শ্রমিক ইতিহাস নিয়ে যত নাড়াঘাটা চলতে থাকে তত শ্রমিক শ্রেণীর কাঠামোগত ভাবনাগুলি শ্রম ইতিহাস চেতনায় অভিনব তত্ত্বের দ্বারা উপস্থাপিত হতে দেখা গিয়েছে। প্রাচ্যবাদী (Orientalism) ধারণাগুলি পূর্বে দাসপ্রথা এবং বর্ণপ্রথার অনুসারী ছিল। যদিও ঔপনিবেশিক ভারতে জাতি ও বর্ণগত হেনস্থার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী উপজাতি (Tribal) বিদ্রোহ বা আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এই জাতিগত বর্ণবিদ্বেষ শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমশ সঞ্চারিত হতে দেখা গিয়েছিল। শ্রমিকদের মধ্যেই এই ভেদাভেদটি ছিল সমাজে সৃষ্ট উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের যেখানে সামাজিক স্থান, শিক্ষা এবং কর্মদক্ষতার মাপকাঠিতে শ্রমিকদের বিভাজন ঘটিয়েছিল।[১১] এই বিষয়গুলি নিয়ে ১৯৮০ -র দশকে বেশকিছু ঐতিহাসিক পুঁজি স্বার্থের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়টি ছাড়াও গোষ্ঠী, জাতি, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় বিশেষে উচ্চ নিচ শ্রেণী বৈষম্যের দিকটি নিরূপণ করে ভারতে শ্রমিক ইতিহাসে মার্কসীয় চেতনায় গ্রামশি ভাবধারার একটি নতুন রূপ দান করেছিল যেটি সাবলটার্ন (Subaltern) চর্চা নামে পরিচিত। রণজিৎ গুহ প্রথম ভারতে শ্রমিকদের নিয়ে এই ঘরানার ইতিহাস চর্চার আগমন ঘটিয়েছিলেন।[১২] তবে দীপেশ চক্রবর্তী ছাড়া আর কোনো ঐতিহাসিকের শ্রমিক ইতিহাসে সাবলীলভাবে এই ধারার প্রয়োগ করতে দেখা যায়নি।

ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাস চর্চার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তা শ্রম ইতিহাস চেতনায় অভিনব তত্ত্বের দ্বারা ভারতের শ্রমিক ইতিহাসকে আলোড়িত করেছিল। সনৎ কুমার বসু[১৩], সুকোমল সেন[১৪], এ. আর. দেশাই[১৫], রণজিৎ দাশগুপ্ত[১৬], অমিয় কুমার বাগচি[১৭], দীপেশ চক্রবর্তী[১৮], নির্বাণ বসু[১৯], শুভ বসু[২০], শমিতা সেন[২১] প্রভৃতি মার্কসবাদী ঘরানায় লেখনীগুলি শ্রমিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছে। ভারতে শ্রমিকদের শ্রেণী ভিত্তিক পরিকাঠামোয়

শ্রমিকদের অবস্থান নিরূপণের বিষয়টি নিয়ে লেখার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে দেখা গিয়েছে। দীপেশ চক্রবর্তী ঔপনিবেশিক ভারতে 'কুলি' শব্দটি শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণে বহুল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। যদিও এটি প্রাক্ পুঁজি কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। অঞ্চলভেদে এই 'কুলি' শব্দটি বিভিন্ন অপভ্রংশে ব্যবহৃত হত। কুলিদের দক্ষিণ ভারতে কোলিস (Kolis), ললস (Lols) বা একটি শ্রেণীর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই সকল দরিদ্র ভারতীয় নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীরা স্বল্প বেতনে সহজলভ্য ছিল।[২২] একইভাবে সামাজিক পরিক্ষেত্রের মধ্যে 'বাবু' (babu) একটি উচ্চবর্গীয় শ্রেণী গোষ্ঠী হিসাবে ঔপনিবেশিক ভারতে অবস্থান লাভ করেছিল। এরা সামাজিক মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই উঠে এসেছিল। 'বাবু' শব্দের ব্যবহার অঞ্চল ভেদে সাহেব (Sahib), সর্দার (Sardar), ম্যানেজার (Manager) প্রভৃতি ক্ষমতাশীল শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করা গিয়েছিল। এই 'বাবু' শ্রেণীর ব্যক্তি মর্যাদার জন্য এরা বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংকিং সংস্থা এবং সরকারী অফিস-কাছারিতে কেরানি বা অধঃস্তন কর্মী হিসাবে এই White-collar জীবিকাকে বেছে নিয়েছিল। এইভাবে বাবু-কুলির সম্পর্কে একটি শ্রেনীগত ব্যবধান মার্কসীয় চেতনায় সংবেদনশীল ভাবগুলির দ্বারা শ্রেণী কাঠামোয় শ্রমিকদের অবস্থানটি নিরূপণ করা গিয়েছিল।[২৩] শ্রম ইতিহাসকে নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে শ্রমিকদের অবস্থানটি খুঁজে পাওয়া গেলেও ঔপনিবেশিক ভারতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে শ্রমিকদের চরিত্রটি বোঝা অনেকটাই মুশকিল। তবে, ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রম ইতিহাসগুলি অধ্যয়নের মধ্যদিয়ে তৎকালীন সময়ে সামজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় শ্রমিকদের অবস্থানটি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

ঔপনিবেশিক ভারতে এই 'কুলি' শব্দের মতই বহু শব্দ শ্রমিক শ্রেণীর চিহ্নিত রূপ হিসাবে সামাজিক পরিকাঠামোতে উপস্থাপিত হয়েছিল। আমার গবেষণার বিষয় "ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭)", এখানে জাহাজে কর্মরত বাংলার নাবিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 'লস্কর', 'খালাসি' প্রভৃতি চিহ্নিত শব্দ রূপগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার জাহাজের কাজে নাবিকদের নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে 'ঘাট-সারেং' প্রকৃতির মধ্যস্বত্বভোগী দালাল শ্রেণীর অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এরা বাংলার লস্কর বা খালাসি নাবিকদের কাছে উৎকোচ হিসাবে অর্থ গ্রহণ করত। এসকল ঘাট-সারেংরা নিজেদের স্বার্থে ঔপনিবেশিক বাংলায় কলকাতার শিপিং অফিসে শ্রম সরবরাহের গুরু দায়িত্ব পালন করত। এভাবে এদের মধ্যে একটি শ্রেণী গত বিভাজন লক্ষ্য করা

গিয়েছিল যেখানে এক শ্রেণী পুঁজির সহায়ক হিসাবে কাজ করেছিল আবার অন্য একটি শ্রেণী পুঁজি (জাহাজ কোম্পানি) শোষণের শিকার হয়েছিল এবং একই সাথে ঘাট-সারেংদের মতো দালালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে শোষিত হয়েছিল। এভাবে শ্রেণী চেতনায় শ্রমের অবস্থানগত দিকগুলি পর্যালোচনা করে আমার মনে হয় যে বাংলার নাবিকেরা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসকল শ্রমিকেরা বাংলার বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছিল, যদিও এদের বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলিম পরিবারের অধিবাসী ছিল যারা ঔপনিবেশিক বাংলায় কলকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যদিয়ে জাহাজে নাবিক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোতে বাংলার নাবিকেরা পুঁজি শোষণের শিকার হয়ে একটি সর্বহারা (proletariat) শ্রেণী হিসাবে সমাজে উপস্থাপিত হয়েছিল। ইউরোপীয় জাহাজ কোম্পানিগুলি পুঁজির আধার হিসাবে একদিকে বাংলার নাবিকদের শোষণ ঘটিয়েছিল অন্যদিকে বর্ণগত বৈষম্যের জন্য ইউরোপীয় নাবিকরা বাংলার নাবিকদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পদমর্যাদার বিভিন্ন দিকগুলি থেকে বঞ্চিত করেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোতে এই অবকাঠামোগুলি দূরীকরণের জন্য পুঁজি বিরোধী আন্দোলন, শ্রেণী সংঘাত এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বিরোধী বহুমুখী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল। এটিই হল শ্রম চেতনায় ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের নিয়ে আমার গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয়।

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক শ্রমিকদের ইতিহাসকে অনুধাবন করার পূর্বে ঔপনিবেশিক ভারতে নাবিকদের নিয়ে গবেষণা কাজগুলির প্রতি অবলোকন করতে হবে। *Indian Shipping: A History of the Sea-Borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earlist Times* গ্রন্থটিতে ১৯১২ সালে কলকাতার একজন তরুণ ইতিহাসবিদ রাধাকুমুদ মুখার্জী (Radha Kumud Mookerji) দেখিয়েছেন প্রাচীনকাল থেকে ভারত বহির্দেশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং জাহাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে এসেছিল। এখানে সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য, সমুদ্রপথে যাত্রা করার বিষয়গুলি গ্রন্থে জায়গা পেলেও জাহাজে নাবিকদের কর্মগত দক্ষতা এবং এখানে এদের কর্মজীবন কীভাবে অতিবাহিত হয়েছিল তা অধরাই থেকে গেছে।[২৪] ভারতে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হওয়ার পরে পরেই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটলে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভীষণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এখানে পুরাতন পালতোলা জাহাজগুলির

পরিবর্তে জাহাজে স্টিম ইঞ্জিনকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। এই উদ্ভূত নিত্য নতুন উন্নত জলযানগুলি ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় ব্রিটিশেরা শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করেছিল ফলস্বরূপ এরা ভারতীয় বন্দর শহরগুলির সঙ্গে অটুট যোগসূত্র স্থাপন করেছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনকালের সূচনালগ্ন থেকে কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী শহর হিসাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল একইভাবে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসাবে বাংলায় হুগলী নদীর তীরে কলকাতা বন্দর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।[২৫] বাংলায় কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের সমাগম হতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এরই মধ্যে বাংলায় পাট শিল্পকে কেন্দ্র করে যে বিপুল শ্রমিকের সংযোগসাধন ঘটেছিল সেই শ্রমিকদের নিয়ে বাংলার কিছু স্বনামধন্য ঐতিহাসিকগণ দৃষ্টিপাত করেছেন এই ঐতিহাসিকদের কথাগুলি পূর্বোক্ত অংশে বলা হয়েছে। যাইহোক, এই পাট শিল্প বা আরও বিভিন্নপ্রকার শিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যকে তরান্বিত করার জন্য কলকাতা বন্দর মারফৎ বিপুল সংখ্যক জাহাজের আনাগোনা জলপথ পরিবহন ক্ষেত্রটিতে বৃহদায়তন শ্রম চাহিদা তৈরি করেছিল। বাংলার লস্কর বা খালাসি নাবিক শ্রমিকরা এই শ্রম চাহিদা পূরণ করেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় এই নাবিকদের কর্মজীবনে পুঁজি শোষণ, অত্যাচার, বর্ণগত বৈষম্য জনিত হেনস্থা প্রভৃতি প্রতিকূলতামূলক দিকগুলিকে সঙ্গে নিয়ে এদের পুঁজি এবং ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী সংগ্রামগুলি ইতিহাসে অধরা রয়ে গেছে। যদিও বাংলার বিশিষ্ট কিছু গবেষকের সূক্ষ্ম অধ্যয়নগুলি আমার গবেষণা কার্যের আকর্ষণীয় স্থল হয়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের নিয়ে আমার গবেষণা কাজে দিশা দেখিয়েছে। রজত রায়[২৬], সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়[২৭], শুভ বসু[২৮] বাংলায় শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে অন্য সকল শ্রমিক ইউনিয়নগুলি গড়ে ওঠার পাশাপাশি সীমেন্স ইউনিয়ন গড়ে ওঠার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। ফারহিন খানামের অপ্রকাশিত M. Phil. গবেষণা কার্যটিতে বিংশ শতকের পর কলকাতায় নাবিক সংগঠন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া এবং কার্যকারিতার দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।[২৯] আবার ঔপনিবেশিক বাংলায় কলকাতা বন্দর এবং জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত জাহাজ, বোট, স্টিমারগুলির চটজলদি উন্নতিসাধনের ফলে প্রচুর ওয়াটার ফ্রন্ট ওয়ার্কারদের (জেটি, কুলি, ঘাট এবং বোট কর্মী শ্রমিকদের) উপস্থিতি লক্ষ্য করা

গিয়েছিল। এই সকল কর্মী শ্রমিকদের উপর ইউরোপীয় বিভিন্ন কোম্পানিগুলির তীব্র শোষণ পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই শ্রেণী শোষণের দিকটি অনিরুদ্ধ বসু ফুটিয়ে তুলেছেন।[৩০] তবে এখানে সার্বিকভাবে বাংলার নাবিকদের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি এবং এর সময়কালটিও বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও তার এই আলোচনার ক্ষেত্রটি বাংলার নাবিকদের প্রাক্ অবস্থানটি বুঝতে আমাকে অনেকাংশে সহায়তা প্রদান করেছে।

ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার নাবিকদের সঙ্গে ভারত উপমহাদেশীয় বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাবিকদের কর্মযোগের ক্ষেত্রটির প্রতি মেরিটাইম ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হতে দেখা গিয়েছে। ইউরোপীয় কোম্পানির জাহাজগুলিতে উপমহাদেশীয় নাবিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, চুক্তি, জাহাজ জীবন, জাহাজ থেকে পালানো (Ship Jump), অভিবাসন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের কাজগুলি ঐতিহাসিকদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে যা তাঁদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিশেষে বাংলার নাবিকদের অবস্থানটি বুঝতে সহায়তা প্রদান করেছে। আবার বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ঘটনা নাবিকদের জীবনে গভীর সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ নাগাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা একই ঘটনার পুনারাবৃত্তি নাবিকদের জীবনে সর্বাপেক্ষা অনেকখানি জীবন সংকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এই বিষয়টি ঔপনিবেশিক ভারতে নাবিকদের কর্মজীবনে কী প্রভাব ফেলেছিল তা ঐতিহাসিকদের গবেষণায় আলোকিত হয়েছে। কনরাড ডিক্সন (Conrad Dixon) এবং ফ্রাঙ্ক ব্রোজ (Frank Broeze) নামক দুইজন মেরিটাইম ঐতিহাসিকের ঔপনিবেশিক ভারতের নাবিকদের নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৩১] রোজিনা ভিস্রাম (Rozina Visram) ১৭৫০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ব্রিটেনে ভারতের অন্যান্য অভিবাসীদের সঙ্গে লস্করদের অভিজ্ঞতার বিষয়টির পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শীপবোর্ডে লস্করদের অবস্থানকালীন সময়ে তাদের আবাসের বন্দোবস্ত এবং তাদের কল্যাণের বিষয়ে সংসদীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর পরবর্তী কাজগুলি বিংশ শতাব্দীতে লস্করদের ধর্মঘট, মজুরির দাবি এবং আন্দোলন সম্পর্কিত ছিল। এই শতকের পূর্বে শীপবোর্ডে লস্করদের প্রতিবাদের বিষয়টি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। জাহাজে লস্করদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হলে তারা এই কাজ থেকে পরিত্রাণের জন্য বিদেশে ঝুঁকি নিয়ে থাকতে শুরু করে। মাইকেল এইচ. ফিশার (Michael H.

Fisher) ভিস্রামের উত্থাপিত অনেক বিষয়ের উপর কাজগুলিকে সম্প্রসারিত করেছেন। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়নে তিনি ব্রিটেনে ভারতীয়দের নিয়োগ, কর্মসংস্থানের ধরণ, বাসস্থান, জাতিগত উত্তেজনা এবং ধর্মপ্রচারের কার্যকলাপের মতো সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন। লস্করদের সম্পর্কে তিনি যুক্তি দেন ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ব্রিটেনে ভারতীয়দের অভিবাসী হওয়ার রূপটি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ব্রিটেনে লস্করদের সহিংসতার পরিচয় পাওয়া যায় জাহাজে আগুন লাগানোর মতো ঘটনার মধ্যদিয়ে তবে ফিশার দেখিয়েছেন কীভাবে লস্করদের এই প্রতিবাদী রূপটি তাদের আইনি জটিলতা থেকে সরিয়ে রেখেছিল, এই বিষয়টি ব্রিটেনে অভিবাসী লস্করদের চরিত্র অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[৩২]

রভি আহুজা (Ravi Ahuja) ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে উপমহাদেশীয় লস্করদের শ্রমের বাজার ক্ষেত্রের দিকটি পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর স্টিমশিপ শ্রমিক নিয়োগ কাঠামো নিয়ে গবেষণামূলক কাজটি অন্য সকল গবেষক এবং পণ্ডিতগণের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে লস্করগণ আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক শ্রম বাজারে দেশীয় কিছু নাবিকদের অধীনস্ত থেকে কাঠামোগত ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। লস্কররা আংশিকভাবে এবং অস্থায়ীভাবে কর্ম জগতের ক্ষেত্রে অবকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য তারা পুনর্গঠিত হয়েছিল।[৩৩] অন্যদিকে জ্যানেট জে. ইওয়াল্ড (Janet J. Ewald) দেখিয়েছেন পূর্ব আফ্রিকা এবং ভারতীয় মুক্তিকামী নাবিকদের কেবলমাত্র জাহাজই নয়, স্থলভাগে মূলত বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করে কর্ম যোগসূত্রের মধ্যদিয়ে ভারত মহাসাগরীয় ক্ষেত্রটি একটি বিশ্ব কর্ম বলয়ের সৃষ্টি করেছিল।[৩৪] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে ভারতীয় লস্করদের প্রভাব নিয়ে জর্জি ওয়েমসি (Georgie Wemyss) তাঁর *The Invisible Empire* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।[৩৫] শম্পা লাহিড়ী (Shompa Lahiri) তাঁর কাজে ব্রিটেনে লস্করদের বসতি স্থাপনে বিভিন্ন ধরনের এজেন্সির ভূমিকা লক্ষ্য করেছেন। তিনি লন্ডনে লস্কর এবং ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়টি যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন। লস্কররা ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো অন্তরালে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এখানে তিনটি বিষয় কাজ করেছিল ধর্মীয় উদাসীনতা, উত্তপ্ত ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়া এবং মিশনারীদের আশাবাদকে কাজ লাগানো।

লাহিড়ী লস্কর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রটি নিয়ে অন্বেষণ করেছেন। তিনি মজুরি, কল্যাণ, বাসস্থান এবং নিয়মানুবর্তিতার বিষয় নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে লস্করদের বিরোধের প্রসঙ্গটি আলোচনায় এনেছেন যেখানে এই লস্কররা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণমূলক আইনকে অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার পায়।[৩৬] ব্রিটিশ মার্চেন্ট শীপে আধুনিক বাংলাদেশের সিলেটি নাবিকদের দীর্ঘকালীন কর্মযোগের মাধ্যমে বিদেশে সিলেটিদের অভিবাসন প্রক্রিয়াটি ক্যাটি গার্ডেনের (Katy Gardner) আলোচনায় ফুটে উঠেছে।[৩৭] আবার আশফাক হোসেন (Ashfaque Hossain) পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) সিলেট এবং আসাম জেলার অধিবাসীদের ঊনবিংশ শতকের সাতের দশক থেকে নিয়ে বিশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত নাবিকের কাজে নিযুক্ত হয়ে আমেরিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশে দেশান্তরিত হয়ে অভিবাসী হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনে বিশ্বায়নের প্রভাব পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলীয় আসাম এবং সিলেট পর্যন্ত ছুঁয়ে গিয়েছিল। বৈশ্বিক চা শিল্পে বিদেশী পুঁজির সাথে স্থানীয় উদ্যক্তাদের সম্পৃক্ততা ঘটায় পূর্ব ভারতে আঞ্চলিক শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রটি ব্যাপক সংখ্যক সিলেটি নাবিকদের মার্চেন্ট শীপগুলিতে যোগদানের মাধ্যমে উন্মুক্ত পরিসর পেয়েছিল।[৩৮]

বিবেক বাল্‌দ্‌ (Vivek Bald) তাঁর *Bengali Harlem and the lost Histories of South Asian America* বইয়ে দেখিয়েছেন বাংলার বহু মুসলিম যুবকেরা আমেরিকার নিউ ইয়র্ক বন্দরে জাহাজের কর্মসূত্রে ঘনঘন যাতায়াতের মাধ্যমে সেখানের সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উন্নত জীবনধারণ করেছিল। এই বিভিন্ন পেশাগুলির মধ্যে রেস্তোরাঁ, পান্থশালা, ফার্স্টফুডের স্টল, ফ্যাক্টারী, শিল্প, গাড়ি মেরামতি কারখানা এবং ফেরিওয়ালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। দেশীয় বহু যুবকদের আমেরিকাতে সহজে নাগরিকত্ব লাভের জন্য বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে দেখা গিয়েছিল। কর্ম এবং সামাজিক মেলবন্ধনের ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের বিষয়টিও অভিবাসনের (Migration) ফলশ্রুতিতে ঘটেছিল যা ভৌগলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপন্থী ছিল।[৩৯]

লোরা তাবিলি (Laura Tabili) তাঁর *"We Ask for British Justice", Workers and racial difference in late imperial Britain* গ্রন্থে আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা প্রভৃতি

অনুন্নত উপনিবেশ শাসিত দেশের কৃষ্ণকায় নাবিকদের পাশাপাশি ঔপনিবেশিক ভারতীয় উপমহাদেশীয় লস্করদের ব্রিটিশ শক্তির দ্বারা বর্ণগত বৈষম্য জনিত কারণে নিপীড়িত এবং শোষিত হওয়ার দিকটি তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি আরও দেখিয়েছেন ইউরোপ বহির্ভূত এই লস্কররা ব্রিটেনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জাতি ও বর্ণগত ভেদাভেদ জনিত আচরণের বিরুদ্ধে কীভাবে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ মুখী হয়েছিল। আবার লস্করদের লিঙ্গগত সমস্যা জনিত ভেদাভেদ নিয়ে যে সকল স্বনামধন্য ঐতিহাসিকেরা কাজ করেছেন তাঁর মধ্যে লোরা তাবিলি ছিলেন একজন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন লস্করদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা স্টুয়ার্ড এবং বাবুর্চির কাজের জন্য বেশি দক্ষ ছিল।[৪০] কৃষ্ণবর্ণের সমুদ্রগামী নাবিকদের শ্রমবাজারে তাদের অধঃস্তন অবস্থানের বিরুদ্ধে ব্রিটেনে অভিবাসন এবং বসতি জড়িত ছিল। আবাসন ও উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মে প্রবেশাধিকারের জন্য নিয়োগকর্তা এবং কৃষ্ণবর্ণের নাবিকদের মধ্যে শ্রেণী সংঘাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৯২০ এবং ১৯৩০ -এর দশকে বেশ কিছু সংকটময় মুহূর্তে ব্রিটিশ রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখা এই সংগ্রামগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে এসেছিল। একইভাবে নাবিক ও নিয়োগকর্তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিল। বিশেষত, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতবর্ণের রাষ্ট্রীয় নিয়োগকর্তারা তাদের বর্ণবাদী শ্রম অনুশীলনের জন্য সামাজিক অবনমনের প্রতিকার স্বরূপ জবাবদিহি করতে চেয়েছিল। নিয়োগকর্তারা জাতিগত বাধাগুলিকে নিয়মতান্ত্রিক করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে যে অস্পষ্টতার হুমকি দিয়েছিল তা কৃষ্ণকায় নাবিকদের প্রতিবাদ করতে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।[৪১]

ঔপনিবেশিক ভারতের নাবিকদের নিয়ে যে সকল গবেষণা কাজগুলি হয়েছে তার মধ্যে গোপালন বালাচন্দ্রন (Gopalan Balachandran) -এর *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870 – 1945* কাজটি আধুনিক ভারতের নাবিকদের নিয়ে একটি দীর্ঘ অধ্যয়নে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক জাহাজগুলিতে ভারতীয় উপমহাদেশের নাবিকদের নিয়ে যে সামুদ্রিক শ্রম বাজারের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল তা এই গ্রন্থের মধ্যে ফুটে উঠেছে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় ভারতের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যদিয়ে এই নাবিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, তাদের সামুদ্রিক ভ্রাম্যমাণ জীবন, কাজের ক্ষেত্র, মজুরি ও একইসাথে এদের প্রতিবাদ আন্দোলনের ধরণ সামাজিক এবং আঞ্চলিকভাবে তাদেরকে

সংগঠিত করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন যখন মধ্যগগনে তখন শিল্প, বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদী শোষণ ভারতে নাবিকদের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। বালাচন্দ্রন এই কাজের ক্ষেত্রটিতে ঔপনিবেশিক সময়ে নাবিকদের নিয়োজিত হওয়ার বিষয়ে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল বা ঘাট-সারেংদের প্রভাবটি চিহ্নিত করেছেন। এই দালালদের আরোপিত কঠোর শর্ত এবং ঔপনিবেশিক পুঁজি শোষণ নাবিক বা লস্করদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গের একটি জায়গা করে দিয়েছিল যারফলে এদের জাহাজের কাজ পরিত্যাগ করে বিদেশে অভিবাসী হওয়ার দিকটি উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল। এভাবে তিনি ভারতীয় নাবিকদের প্রথম বৈশ্বিক শ্রমিকদের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪২]

ঔপনিবেশিক ভারতে নাবিকদের নিয়ে ইতিহাসবিদদের গবেষণা কাজগুলি আমাকে ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকদের নিয়ে গবেষণা কাজে যেমন উৎসাহ যুগিয়েছে একইভাবে বাংলার নদ-নদী ও উপকূলীয় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং তাদের নিজস্ব জীবন কেন্দ্রিক বোট, নৌকা, স্টিমার যাত্রাগুলির উপর ভিত্তি করে বাংলার নাবিকদের কর্মকান্ডের জায়গাটিও আমার আকর্ষণীয় স্থল হয়ে উঠেছে। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব* গ্রন্থে বাংলার নদ-নদী, বন্দর, নৌকার বিবরণ, জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য, যাত্রা প্রভৃতি বিষয়গুলি সুন্দরভাবে ভাবে তুলে ধরেছেন, যেখানে লক্ষ্য করা যায় সুদূর অতীত কাল থেকে বাংলার মানুষের সঙ্গে নদীপথের একটি নিবিড় সম্পর্ক বজায় ছিল।[৪৩] যদিও ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোতে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জল পরিবহণের চিত্রটি অনেকটা পরিবর্তন হতে দেখা গিয়েছিল। পুঁজি অর্থনীতির ক্ষেত্র হিসাবে অভ্যন্তরীণ জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ফেরী পরিবহণের বিভিন্ন জায়গাগুলিতে ইউরোপীয় কোম্পানির স্টিমার এবং জলযানগুলি বাংলার নাবিকদের জীবন জীবিকার অবলম্বনস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সকল ক্ষেত্রগুলি নিয়ে বিংশ শতকে কবি এবং সাহিত্যিকদের কবিতা, গল্প এবং বিভিন্ন চিঠিপত্রের মতো সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখালেখিগুলি বাংলার নাবিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের নিয়ে এই সাহিত্য বিষয়ক লেখালেখিগুলির গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিকে ইতিহাসের আলোকে অবলোকন করা হয়েছে।

সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় (Suchetana Chattopadhyay) তাঁর *An Early Communiest, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913 – 1929* গবেষণামূলক গ্রন্থে ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকদের নদীকেন্দ্রিক জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। তিনি দেখিয়েছেন সন্দ্বীপে বসবাসকারী নাগরিকরা চারিপাশে জলরাশি দ্বারা আবৃত ভূখন্ডে বিশেষ কোনো জীবিকায় আকৃষ্ট না হয়ে নৌকা বা ছোট আকৃতির বোটে কাজকর্মের সূত্রে বিভিন্ন নদীর চ্যানেল পথে এবং সমুদ্র উপকূলীয় শহরগুলিতে যাতায়াত করার মাধ্যমে শিল্পসমৃদ্ধ কলকাতা ও এর সমতুল্য বন্দর শহরগুলিতে উন্নত জীবনধারণের জন্য বসবাস শুরু করেছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের শুরুর দিকে সন্দ্বীপ এবং এর পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামের মুসলিম মধ্যবৃত্ত পরিবারের লস্করেরা বৃহত্তর বাণিজ্যিক জাহাজগুলিতে কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কলকাতা বন্দরে জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল।[৪৪] এটি একটি জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র স্তরীয় আঞ্চলিক স্থানান্তরণ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অভিবাসন ঘটার উন্মুক্ত পরিসর পেয়েছিল।

ঐতিহাসিক এবং গবেষকদের এসকল প্রাসঙ্গিক আলোচনাগুলি ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের নাবিকদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ক্ষেত্রগুলির তত্ত্বগত ভাবনার পরিবেষ্টিত রূপটি ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকদের নিয়ে আমার গবেষণা কাজের রসদ যুগিয়েছে। তাঁদের এই কাজগুলিতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোয় আর্থ-সমাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনার মধ্যদিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনে নাবিকদের অবস্থানটি ফুটে উঠেছে। ভারতে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনে বাংলার শিল্প এবং অর্থনীতিতে পুঁজির সন্নিবেশ বাংলার শ্রমিকদের উপর যে প্রভাব ফেলেছিল তা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদের দ্বারা প্রস্ফুটিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার নাবিকদের পুঁজি অর্থনীতির চাপে পড়ে শোষিত হওয়ার দিকটি গবেষণা আলোচনায় ফাঁক থেকে গেছে। এজন্য ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০–১৯৪৭) শিরোনামের গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য গৌণ আলোচনাগুলিকে অনুধাবন করার পাশাপাশি আকর উপাদানগুলি ব্যবহার করে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে তাদের উত্থান, সংগঠিত হওয়া, অভিবাসন এবং সংগ্রামের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণের মধ্যদিয়ে। প্রথমিক পর্বে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে পুঁজি এবং রাষ্ট্র বিরোধী শ্রমিক আন্দোলনগুলিতে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় শ্রমিকদের শোষিত হওয়ার দিকটি শ্রমিক ইতিহাসে বিপুলভাবে চর্চিত হয়েছে যা ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ই. পি. থমসন এবং এরিক. হবসবম নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত করেছেন। থমসন সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক শ্রেণীর কথা তুলে ধরেছেন তাঁর *The Making of the English Working Class* বইয়ের মাধ্যমে। এই সকল মহান ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলায় সনৎ কুমার বসু, সুকোমল সেন, নির্বাণ বসু, রণজিৎ দাশগুপ্ত, দীপেশ চক্রবর্তী, অমিয় কুমার বাগচী, শুভ বসুর মত ঐতিহাসিকগণ ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের ইতিহাস নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এছাড়া শমিতা সেন ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোতে নারী শ্রমিকদের ইতিহাস নিয়ে তাঁর চিন্তাচেতনা গবেষণা কার্যের মধ্যদিয়ে পরিস্ফুট করেছেন।

ঔপনিবেশিক বাংলাতে শ্রমিকদের নিয়ে যেমন পাট শিল্প শ্রমিক, বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, চা-বাগিচা শ্রমিক, খনি শ্রমিক, রেলওয়ে শ্রমিক, ট্রামওয়ে শ্রমিক, নারী শ্রমিক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা কার্য সম্পন্ন হয়েছে। আবার ঔপনিবেশিক ভারতের নাবিকদের নিয়ে গোপালন বালাচন্দ্রন, লোরা তাবিলি, রজিনা ভিশ্রাম, রভি আহুজা, বিবেক বাল্‌দ্‌ প্রভৃতি খ্যাতনামা গবেষকদের গবেষণা কাজগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার নাবিকদের প্রসঙ্গগুলি আমার গবেষণা কাজে হাতছানি দিয়েছে। তবে বাংলাতে নাবিক শ্রমিকদের গবেষণা চর্চার দিকটি অনালোচিত থেকে গেছে, যদিও রজত রায় ও সুচেতন চট্টোপাধ্যায় বাংলাতে সীমেন্স ইউনিয়নের গঠন নিয়ে গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করেছেন। তাঁদের এই গবেষণা কার্যের সময়কাল বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ফারহিন খানাম কলকাতায় ইন্ডিয়ান সীমেন্‌স ইউনিয়নের গঠন প্রক্রিয়া এবং তার কার্যকারিতা নিয়ে একটি অপ্রকাশিত M. Phil. গবেষণা কার্য সম্পন্ন করেছেন। তবে তাঁর গবেষণায় বিংশ শতকে বাংলার নাবিকদের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার নাবিকদের নিয়ে সেভাবে কোনো গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয়নি।

ঔপনিবেশিক বাংলায় একপ্রকার শ্রমিক আমাদের চোখের আড়ালে জাহাজের মধ্যে নিরলস এবং অবিরত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিল। বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার ফলে ঔপনিবেশিক শোষণ তীব্রতর হয়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলার বহু নাবিক লস্কর বহির্দেশীয় সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মে যাত্রাবস্থায় ব্রিটিশ শত্রুপক্ষের চোরাগোপ্তা সাবমেরিনের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আহত, নিহত এবং নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তাদের এই ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টির প্রতি ইউরোপীয় শিপিং কোম্পানিগুলি সহানুভূতিশীল ছিল না। বাংলার বহু ক্ষতিগ্রস্ত নাবিকদের কলকাতার শিপিং অফিস থেকে প্রতারিত করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই একই সময়ে নাবিকদের নিয়োজিত হওয়ার প্রক্রিয়টিতে ঘাট-সারেংদের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এরা নাবিকদের নিয়োজিত করার জন্য তাদের কাছ থেকে ঘুষ হিসাবে অর্থ আত্মসাৎ করত। এছাড়া এই নাবিকদের উপর কর্মকালে বাড়তি দাদন চাপিয়ে দিয়ে মুনাফা লাভ করে প্রতারিত করেছিল। জাহাজে উচ্চপদগুলি ইউরোপীয় নাবিকদের মধ্যেই বহাল রাখা হয়েছিল এখানে বাংলার নাবিকদের সমদক্ষতা থাকা সত্বেও তারা এই আসনগুলি গ্রহণ করতে পারত না। এভাবে বাংলার নাবিকেরা আর্থিক বঞ্চনা এবং শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। এই বিষয়টি নাবিকদের সংগঠিত হওয়ার পথে চালিত করেছিল। এরফলে ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) নামে একটি নাবিক সংগঠন বাংলায় গড়ে উঠেছিল। এই ইউনিয়নের হাত ধরে বাংলার নাবিকরা তাদের অভাব-অভিযোগগুলি উত্থাপন করেছিল এবং নানান ধর্মঘট, সমাবেশ এর মধ্যদিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। ১৯২০ সালে ইতালির জেনেভাতে ILO -এর বাৎসরিক সভাতে বাংলায় ISU -এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই একই সময়ে ঔপনিবেশিক ভারতে AITUC -এর গঠন যা ভারতের বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকদের এক ছত্রতলে আনার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল যেখানে ISU ইউনিয়নটির সঙ্গে সংযুক্ত (Affiliated) হয়ে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা বহন করেছিল।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলি আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় এবং এই সময়কাল অর্থাৎ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ আমার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, তাই উক্ত সময়কালটি আমি আমার গবেষণা কার্যের সূচনাকাল নির্ধারণ করেছি। ১৯৪৭ সাল হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিনাশ ঘটেছিল। শ্রমিক শ্রেণী এবং তার মধ্যে জাহাজে কর্মরত বাংলার

নাবিকেরাও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বৈষম্যমূলক আচরণ, শাসন ও শোষণের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। তাই এই সময়কালটিকে আমি আমার গবেষণার অন্তিম পর্ব হিসাবে পরিগণিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলার নাবিকদের বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সীমেন্স ইউনিয়নের সহায়তায় এসময়ে ঔপনিবেশিক শাসন ও পুঁজি শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার নাবিকদের দ্বারা সভা-সমাবেশ, ধর্মঘট আন্দোলনগুলি ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়েছিল। এগুলি সমাজ জীবনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল যা বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার নাবিকদের এই পুঁজি ও ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী ধর্মঘট এবং আন্দোলনগুলি শ্রেণী শোষণ বিরোধী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এরা সমাজে আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে শোষিত হয়েছিল। এই বিষয়টি সামাজিক অসাম্য এবং অবকাঠামোগুলির মধ্যদিয়ে পুঁজি শোষণের মাধ্যমে শ্রেণী বিভাজন ঘটিয়েছিল, মার্কসীয় চেতনায় বাংলার নাবিকদের শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ, জীবনপ্রণালী, কর্মপদ্ধতি ও তাদের সংগ্রামী জীবনধারার ইতিহাসের উপর আলোকপাত করাই আমার গবেষণা কাজের মূল্য উদ্দেশ্য।

গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী

গবেষণা কার্যটি চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় আমি কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। এই প্রশ্নগুলি হল নিম্নরূপ –

প্রথমত: ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক হিসাবে কাদের চিহ্নিত করব? এরা কিভাবে জাহাজের কাজে নিয়োজিত হয়েছিল? এদের লস্কর বলার যৌক্তিকতা কি? জাহাজ কর্মে এসকল শ্রমিকদের কি ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল? বাংলার নাবিকেরা ইউরোপীয় নাবিকদের দ্বারা কিভাবে বর্ণ এবং জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল? লস্করেরা জাহাজে নিত্যদিন প্রতিকূল অবস্থায় কাজের মধ্যদিয়েও কীভাবে তাদের বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পেয়েছিল?

দ্বিতীয়ত: কেন ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকেরা সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল? বাংলায় কিভাবে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) গড়ে উঠেছিল? বাংলার নাবিকদের স্বার্থে এই ইউনিয়নটি কি ভূমিকা রেখেছিল? ISU এবং -এর পাশাপাশি বাংলায় গড়ে ওঠা অন্য সকল সীমেন্স ইউনিয়নগুলি ঔপনিবেশিক এবং পুঁজি শোষণের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?

তৃতীয়ত: ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকেরা কিভাবে এবং কেন দেশান্তরিত হয়ে অভিবাসিত হয়েছিল? বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়কালে বহির্বিশ্বে জাহাজে কর্মরত নাবিকদের জীবন কেমন ছিল? এবং কিভাবে এই বিশ্বযুদ্ধ বাংলার নাবিক তথা লস্করদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল? কেন বাংলার নাবিকদের মধ্যে বহু নাবিক জাহাজের কর্মজীবন পরিত্যাগ করে বিভিন্ন উন্নতশীল দেশগুলিতে নাগরিকত্ব গ্রহণ করার জন্য পাথেয় হয়েছিল?

চতুর্থত: ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকদের সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে সামিল হওয়ার দিকগুলি কি ছিল? এরা কীভাবে পুঁজি শোষণ এবং ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী অবকাঠামোগুলি দূর করার জন্য সমাবেশ, হরতাল এবং ধর্মঘটের পথকে বেছে নিয়েছিল? এই ধর্মঘট এবং সংগঠিত আন্দোলনগুলিকে বাংলার সীমেন্স ইউনিয়ন কীভাবে পরিচালিত করেছিল? তৎকালীন সময়ে বাংলার সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি নাবিক জীবন সংগ্রামে কী ভূমিকা বহন করেছিল?

পঞ্চমত: ঔপনিবেশিক বাংলায় নদীকেন্দ্রিক এবং উপকূলীয় অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের জীবন কেমন ছিল? এই জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের পদোন্নতি লাভের প্রক্রিয়াগুলি কি ছিল? এই অভ্যন্তরীণ জলযানে বাংলার নাবিকেরা কোন দিকগুলি নিয়ে আন্দোলন এবং ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল? ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের নিয়ে বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের ভাবনাগুলি সামাজজীবনে কী বার্তা বহন করেছিল?

গবেষণা উপাদান ও পদ্ধতি:

"ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০–১৯৪৭)" শিরোনামের গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য প্রথমিকভাবে ঔপনিবেশিক সময়কালে শ্রমিক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থগুলি অনুধাবনের মাধ্যমে আমার ভাবনার মধ্যে নাবিকদেরও শ্রমিক হিসাবে কিভাবে চিহ্নিত করা যায় সেটির অনুসন্ধান চালিয়েছি। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন বাংলায় কলকাতা বন্দর এবং শহরকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে পাট, বস্ত্র এবং এরই সঙ্গে আরও কিছু আনুষঙ্গিক শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের অবস্থানটি কেমন ছিল তা বাংলার স্বনামধন্য গবেষকদের গবেষণা কাজগুলির মাধ্যমে উঠে এসেছে যেখানে আমি বাংলার নাবিকদের অবস্থানটি অনুধাবন করতে পেরেছি। ঔপনিবেশিক শাসন এবং পুঁজি বিরোধী এই নাবিকরা শ্রমিক রূপে বিবেচিত হওয়ার জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত তা

মার্কসীয় ভাবধারার মধ্যদিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি। ঔপনিবেশিক ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার নাবিকদের নিয়ে মেরিনার ঐতিহাসিকদের গৌণ উপাদানগুলি (Secondary Sources) আমার গবেষণা কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু না হলেও গবেষণা কাজটির দিক নির্দেশনায় আমায় সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলার নাবিকদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলার বিভিন্ন কবি এবং সাহিত্যিকদের সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখনীগুলির (Literary Sources) তাৎপর্য কী ছিল তা শ্রম ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জানার চেষ্টা করেছি।

গবেষণাটির মৌলিকত্ব আনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। মূলত প্রাথমিক উপাদানগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানার (West Bengal State Archives, Kolkata) IB ফাইলগুলি থেকে বাংলার নাবিক সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যগুলিকে আমার গবেষণা কাজে ব্যবহার করেছি। একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী মেরিটাইম আর্কাইভস, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের (Maritime Heritage Centre, Kolkata Port Trust, Kolkata) আকর উপাদানগুলি অনুসন্ধানের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছি যেগুলি আমার গবেষণা কাজকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া এই গবেষণা কাজকে উৎকৃষ্ট সম্পন্ন করার জন্য কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের (National Library, Kolkata) সংরক্ষিত পুরাতন পত্র-পত্রিকা, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুস্তিকাগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আবার এই গবেষণায় নতুনত্ব আনার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিজিটাল লাইব্রেরীর (Digital Library of the West Bengal Secretariat) মাধ্যমে বাংলার কিছু স্ট্যাটিস্টিক রিপোর্ট (Statistic Report) এবং ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (District Gazetteer) গুলি লক্ষ্য রেখেছি। আমার গবেষণা ভাবনায় যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য Jstore, Internet Archives, Academia প্রভৃতি ইন্টারনেট মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং গবেষণা প্রবন্ধগুলির উপর সর্বদা লক্ষ্য রেখে আমার গবেষণা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যের সুবাদে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের Central Library এবং আমাদের ইতিহাস বিভাগের Departmental Library - তে সংরক্ষিত আমার গবেষণা সম্বন্ধিত গ্রন্থ এবং গবেষণা জার্নালগুলি ব্যবহার করার অবকাশ পেয়েছি।

অধ্যায় বিন্যাস:

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭) শিরোনামের আমার গবেষণা সন্দর্ভের মূল আলোচনার ক্ষেত্রটি ভূমিকা এবং উপসংহার ব্যতীত মূলত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। অধ্যায়গুলি হল–

প্রথম অধ্যায়: ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক স্বার্থে সীমেন্স ইউনিয়নের গঠন প্রক্রিয়া ও তার কার্যাবলী।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলার নাবিকদের বহির্বিশ্বে অভিগমনের মধ্যদিয়ে অভিবাসন লাভ এবং পরবর্তীকালে স্বদেশে আগত অভিবাসী নাবিকদের বিদেশে কর্মসম্পাদনের স্মৃতিচারণা।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলার নাবিকদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন, সমাবেশ এবং ধর্মঘট (১৯২০-১৯৪৭)।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলায় নদীকেন্দ্রিক ও উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন।

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০–১৯৪৭) এই গবেষণায় বিন্যস্ত অধ্যায়গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন জায়গাগুলি গবেষণার সুবিধার্থে আলাদাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে, ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের উত্থান, সংগঠন, নিয়োগ ও কর্মপদ্ধতি এবং কাজের শর্তগুলি কেমন ছিল তা দেখানো হয়েছে। উন্নত পরিকাঠামোয় কলকাতা বন্দরের উত্থান এবং বন্দরের এই উত্থানকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের মধ্যদিয়ে বাংলার নাবিকদের জাহাজ কর্মে সংযোগের বিষয়টি তুলে ধরেছি। ঔপনিবেশিক বাংলায় মধ্যস্বত্বভোগী দালাল এবং ঘাট-সারেংদের বাংলার বন্দরগুলিতে নাবিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব এবং এদের দ্বারা নাবিকদের প্রতারিত হয়ে শোষিত হওয়ার দিকটি দর্শানো হয়েছে। জাহাজ কর্মে ইউরোপীয় নাবিকদের দ্বারা বাংলার নাবিকদের জাতি ও বর্ণগত বৈষম্যের মাধ্যমে নির্যাতিত এবং লাঞ্ছিত হওয়ার বিষয়টি এখানে উল্লেখিত আছে। বাংলার নাবিকদের লস্কর বলে চিহ্নিত করণের দিকটি

এই অধ্যায়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলার নাবিকদের বিভিন্ন প্রতিকূলতাময় সংগ্রামী কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক শাসনে তাদের শোষিত ও বঞ্চিত হওয়ার দিকটি এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সীমেন্স ইউনিয়ন গড়ে ওঠার দিকটি আমার গবেষণায় উত্থাপন করা হয়েছে। উক্ত অধ্যায়ে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) -এর ধাপে ধাপে একটি পরিপক্ক ইউনিয়ন রূপে গড়ে ওঠার পর্বগুলি দেখানো হয়েছে। বাংলায় গড়ে ওঠা এই ইউনিয়নটি নাবিক স্বার্থে যে বিভিন্ন হিতকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন এবং এর পাশাপাশি অন্য সকল সীমেন্স ইউনিয়নগুলি ঔপনিবেশিক পুঁজি শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার নাবিকদের কিভাবে সংগঠিত করেছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, সমুদ্রগামী জাহাজে কাজের সূত্রধরে বাংলার নাবিকদের বহির্বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশগুলিতে অভিবাসী হওয়ার বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলার নাবিকদের বহিঃসমুদ্রে জাহাজে কর্মসম্পাদনের সময় তাদের সংকটকালনী অবস্থার বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। জাহাজ কর্ম পরিত্যাগ করে বাংলার নাবিকেরা বহির্বিশ্বের উন্নত দেশে নিজেদের অভিবাসন ঘটিয়ে নতুন জীবিকা অবলম্বন করে ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণের মুক্তির পথ রচনার বিষয়টি এই অধ্যায়ে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের সংগঠিত ধর্মঘট এবং আন্দোলনগুলি কীরূপ ছিল সে বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধকালে তীব্র ঔপনিবেশিক শোষণে বাংলার নাবিকদের দৈনন্দিন কর্মজীবন অনেকটা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল যার ফলে তারা তাদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য মালিক পক্ষের কাছে দাবিগুলি বারং বার উত্থাপিত করেছিল। কিন্তু পুঁজি মালিকরা পুঁজি স্বার্থের জন্য নাবিকদের বেতন বৃদ্ধি জনিত দাবিগুলি মানেনি। এরফলে ফলে নাবিকদের মধ্যে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে তারা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগদান করে আন্দোলন এবং ধর্মঘটের সূচনা করেছিল। এই ধর্মঘট এবং আন্দোলন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU)

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল। ইউনিয়নের সহায়তায় নাবিকদের ধর্মঘট এবং সমাবেশগুলি তাদের দাবি পূরণে অনেকটা সহায়ক হয়েছিল। ইউনিয়নের ছত্রতলে থেকে নাবিকদের এই সংগ্রামী লড়াকু চেতনার বিষয়গুলি উক্ত অধ্যায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, নদীপথ ও উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে কর্মরত বাংলার নাবিকদের কর্মজীবনের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার নদীপথগুলির বিচিত্রময় পরিবেশের সঙ্গে নদীর যাত্রাপথের ভয়ঙ্কর দিকগুলির কথাও এখানে বলা হয়েছে, যেখানে বাংলার নাবিকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিল। তৎকালীন সময়ে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন এবং ঔপনিবেশিক শোষণের দিকগুলি নিয়ে কবি ও সাহিত্যিকদের ভাবনাগুলি বিভিন্ন ভাবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমার গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১। K N Panikkar, Terence J Byres, Utsa Patnaik (eds.), *The Making of History, Essays presented to Irfan Habib*, New Delhi, Tulika Books, 2000, pp. 306-309.

২। Steven M. Beaudoin (ed.), *The Industrial Revolution,* David S. Landes, *Defining the Industrial Revolution, The Unbound Prometheus,* New York, Houghton Mifflin Company, 2003, p. 8. এখানে ডেভিড এস. ল্যান্ডিস দেখিয়েছেন সামাজিক ক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধির দরুন শিল্পায়নে বিকাশ ঘটে, যারফলে পূর্বের কৃষি নির্ভর জমি মালিকানা ভিত্তিক পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিনাশ ঘটে। এরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত উন্নতিসাধন ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব ঘটার অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। হারগ্রীভসের স্পিনিং জেনী, আর্করাইটের জলশক্তি চালিত চাকা, স্যমুয়েল ক্রমটনের স্পিনিং মিউল, কাটরাইটের যন্ত্রচালিত তাঁত এবং জেমস ওয়াটের স্টিম-ইঞ্জিন প্রভৃতি আবিষ্কারগুলি ইউরোপে নিত্য নতুন আধুনিক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটিয়েছিল। শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম ব্রিটেনে ঘটতে দেখা গিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ব্যাপক শিল্প উন্নয়নের ফলে শিল্পগুলিতে পুঁজির সন্নিবেশ ঘটে মাত্রাতিরিক্ত শ্রম সংযোগ হওয়ার বিষয়টির প্রতি ই. পি. থমসন দৃষ্টি রেখেছেন। Steven M. Beaudoin (ed.), *The Industrial Revolution*, E. P. Thompson, *Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism,* New York, Houghton Mifflin Company, 2003, pp. 162-173.

৩। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০-২০০০,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ১-২।

৪। তদেব, পৃ. ৩-৪।

৫। Karl Marx, *Capital, Vol. I*, London, penguin Books, 1982.

৬। সুধাংশু দাশগুপ্ত, *কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাতা থেকে*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ১৫।

৭। Sanat Kumar Bose, *Capital and Labour in the Indian Tea Industry*, All-India Trade Union Congress, Bombay, 1954, pp. 96-97.

৮। R. Palme Dutt, *India To-day*, London, Victor Gollancz LTD, 1940, pp. 135-143.

৯। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৩, পৃ. ১৪৩-১৫০।

১০। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহেশ গল্পটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *হরিলক্ষ্মী গল্পগ্রন্থ, হরিলক্ষ্মী ও অভাগীর স্বর্গ, মহেশ,* কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, চৈত্র, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৩ই মার্চ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ।

১১। K N Panikkar, Terence J Byres, Utsa Patnaik, *The Making of History, Essays presented to Irfan Habib*, New Delhi, Tulika Books, 2000, pp. 300-301.

১২। Ranajit Guha (ed.), *Subaltern Studies I, Writings on South Asian History and Society*, Delhi, Oxford University Press, 1982, p. 6.

১৩। ঔপনিবেশিক ভারতে অসংগঠিত চা-বাগিচা শ্রমিকেরা ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় পুঁজি শোষণের শিকার হয়েছিল এবং একইসঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল ও সর্দারদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অত্যাচারিত হয়েছিল। এই অংগঠিত শ্রমিকেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তায় সংগঠিত হয়ে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই বিষয়টি সনৎ কুমার বসু তাঁর গবেষণা কার্যে তুলে ধরেছেন। Sanat Kumar Bose, *Capital and Labour in the Indian Tea Industry*, Bombay, All-India Trade Union Congress, 1954.

১৪। সুকোমল সেন ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের উদ্ভব এবং গঠনগত দিকটির দৃষ্টি প্রদানে ইউরোপীয় শ্রমিকদের প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করে দুই ভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। ইউরোপীয় শ্রমিকেরা শিল্প অর্থনীতির সঙ্গে অনেকটা খাপ খাইয়ে নিতে পরেছিল কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকেরা ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় শিল্প অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি। এখানে দক্ষ, অদক্ষ শ্রম বিভাজন যেটি শ্রমিকদের গ্রাম অর্থনীতির দিকে ফিরিয়ে

দিয়েছিল। এছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে কুসংস্কার এবং মান্ধাতীয় চিন্তা তাদের অনেকটা পিছিয়ে রেখেছিল। এরফলে এই শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন ঘটিয়ে শোষণ করা অনেক সহজতর হয়েছিল। তবে বিংশ শতকের পর থেকে রাজনৈতিক চেতনায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্নিবেশে শ্রমিকেরা একতাবদ্ধ হতে পেরেছিল। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনে শ্রমিকদের একতাবদ্ধ হয়ে সংগঠিত হওয়ার বিষয়টি শ্রমিকদের পুঁজি শোষণে সচেতন করেছিল যা তাদের অধিকারগুলি আদায়ের জন্য আন্দোলন এবং সংগ্রামের পথ দেখিয়েছিল। Sukomal Sen, *Working Class of India, History of Emergence and Movement, 1830-1970,* Calcutta, K. P. Bagchi and Company, 1977.

১৫। A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Bombay, The Popular Press, 1948. এই গ্রন্থে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্থানের দিকগুলি দেখিয়েছেন। ভারতে জাতীয় আন্দোলনে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা এবং সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির কারণগুলি সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক পরিকাঠামোয় অনেকটা সুবিধা প্রদান করেছিল। অন্যদিকে, A. R. Desai (ed.), *Labour Movement in India: Documents: 1918-1920*, New Delhi, Indian Council of Historical Research, 1988. এই সম্পাদিত গ্রন্থটিতে ভারতে ১৯১৮ – ১৯২০ সালে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম, সংগঠন এবং উদীয়মান শ্রেণী চেতনার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যা থেকে ঔপনিবেশিক সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর চিত্রটি অনুধাবন করতে পারি।

১৬। ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের ক্ষেত্রটি প্রাক্-বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে ছিল, যদিও ঔপনিবেশিক শাসনে পুঁজির আগমন ঘটার জন্য ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীর অবস্থানটি *বাবু (babu), সাহেব (Sahib), সর্দার (Sardar)* শ্রেণীর মধ্যে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। এখানে শ্রেণী কাঠামোয় *কুলি (cooli)* শ্রেণীর অবস্থানটি *সর্বহারা (Proletariet)* শ্রেণী হিসাবে উঠে এসেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে পাট, কয়লা, চা-বাগিচা প্রভৃতি শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে এই শ্রমিকদের সামাজিক অবমাননা, অতিরিক্ত শ্রম, স্বল্প বেতন প্রদানের মধ্যদিয়ে সর্বাধিক পুঁজি শোষণ পরিলক্ষিত করা গিয়েছিল। এই বিষয়টি রণজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর নিম্নোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বিদেশী পুঁজি শোষণ এবং দেশীয় উচ্চবর্গের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতারিত হয়ে শোষিত হওয়ার দিকটির

প্রতি আলোকপাত করেছেন। Ranajit Das Gupta, *Labour and Working Class in Eastern India, studies in Colonial History,* Calcutta, K. P. Bagchi & Company, 1994.

১৭। Amiya Kumar Bagchi, *Private Investment in India, 1900-1939*, New York, Cambridge University Press, 1972. এখানে দেখা গেছে ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় পুঁজি গোষ্ঠীর একচেটিয়া শিল্প এবং বানিজ্যিক অর্থনীতির ব্যাপক প্রয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর প্রবল চাপ বাড়িয়েছিল। বাজার অর্থনীতিতে উপযুক্ত পরিবেশ, তথ্য-প্রযুক্তি, পুঁজি এবং শ্রম সামাজিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের এক বিশেষ পদ্ধতির মধ্যদিয়ে পুঁজি অর্থনীতির বিকাশে মুনাফা বাড়িয়েছিল ঠিকই তবে এটি সামাজিক পরিকাঠামোতে শ্রমিকদের উপর জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে শোষণ প্রক্রিয়াটি শ্রেণী শোষণের ইঙ্গিত বহন করেছিল। এই বিষয়টি অমিয় কুমার বাগচী তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ভারতীয় সমাজে শ্রেণী বিভাজন ঘটে শ্রেণী সংঘাতের দিকে শ্রমিকেরা নিজেদের পরিচালিত করেছিল। Amiya Kumar Bagchi, *Capital & Labour Redefined, India and the Third World,* New Delhi, Tulika Books, 2002.

১৮। দীপেশ চক্রবর্তী ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিক ইতিহাসকে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন আঙ্গিকে পরিবেষ্টিত করেছেন। কলকাতায় হুগলী নদীর তীরে পাটকলগুলিতে শ্রমিকদের ব্যাপক সংখ্যক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনে পাট শ্রমিকরা পুঁজি কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছিল। এই বিষয়টি শ্রেণী সংহতির মধ্যদিয়ে তাদের সংগ্রামী পদক্ষেপগুলিকে শ্রেণী চেতনায় পরিশীলিত 'post-structuralist' ভাবনার সঙ্গে সুসজ্জিত করেছিল। Dipesh Chakrabarty, *Rethinking Working-Class History, Bengal 1890-1940,* New Jersey, Princeton University Press, 1989.

১৯। নির্বাণ বসু ঔপনিবেশিক বাংলায় পাটশিল্প শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং তাদের পর্যায়ক্রমিক সংগ্রামের পর্বগুলি আলোচনা করেছেন। ১৯২০ সালের পর ভারতবর্ষে শ্রমিক স্বার্থে গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই পাট শিল্প শ্রমিকদের দাবিগুলি আদায়ের জন্য বিভিন্ন সভা, ধর্মঘট এবং আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিল যে বিষয়গুলি নির্বাণ বসু তুলে ধরেছেন। শ্রমিকদের

এই আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি জুড়ে গিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম দেখা গিয়েছিল তা ঔপনিবেশিক কাঠামোয় শ্রম চেতনাকে নতুন আলোকে পর্যবসিত করেছিল। Nirban Basu, *The Working Class Movement, A study of Jute Mills of Bengal 1937-47,* Calcutta, K. P. Bagchi & Company, 1994.

২০। শুভ বসু ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিকদের সংগঠিত হয়ে বহিঃপ্রকাশের রূপটি পরিলক্ষিত করেছেন। শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোয় সামাজিক সংগঠন, কর্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন দ্বন্দ্ব, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দলগত সংগঠন প্রভৃতি বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন। কলকাতা শহর পার্শ্ববর্তী পাটকলগুলিতে শ্রমিকদের রাজনৈতিক ভাবে সংঘবদ্ধ হতে দেখা গিয়েছিল। এভাবে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক উত্থানের সাথে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিক ভাষাগত ঐক্যতার মধ্যদিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মোচন ঘটেছিল। যদিও এই ঐক্যতার বিষয়গুলি জটিল প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত এবং একাধিক প্রতিযোগিতার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর উত্থানে বাংলার বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ১৯২০ সালের পর কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মধ্যদিয়ে শ্রমিক আন্দোলনগুলিতে শ্রেণী চেতনায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সঞ্চারণ ঘটানো হয়েছিল। Subho Basu, *Does Class Matter? Colonial Capital and Workers' Resistance in Bengal (1890-1937),* New Delhi, Oxford University Press, 2004.

২১। শমিতা সেন ঊনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক বাংলায় পাট শিল্পে নারী শ্রমিকদের অবস্থানে লিঙ্গগত অসাম্যতা পরিলক্ষিত হতে দেখেছেন। ভারতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল যাবৎ নারী শ্রমকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল। বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাগুলি নারীদের সামাজিক পরিকাঠামোতে যেভাবে পেছিয়ে রেখেছিল একইভাবে নারী শ্রমিকদের উপর এই ছাপগুলি তাদের কর্মজীবনকে বিচলিত করেছিল। যে বিষয়টি শমিতা সেন মার্কসীয় ঘরানায় উপস্থাপিত করার মধ্যদিয়ে শ্রমিক ইতিহাস চেতনায় লিঙ্গগত ভাবনার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেছেন। Samita Sen, *Women and Labour in Late Colonial India, The Bengal Jute Industry,* Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

২২। K N Panikkar, Terence J Byres, Utsa Patnaik, *The Making of History, Essays presented to Irfan Habib*, New Delhi, Tulika Books, 2000 p. 281.

২৩। *Ibid* pp. 281-282.

২৪। G. Balachandran, *Globalizing labour? Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945,* New Delhi, Oxford University Press, 2012, p. 10.

২৫। Nilmani Mukherjee, *The Port of Calcutta, A Short History*, Calcutta, The Commissioners for the Poort of Calcutta, 1968. কলকাতা বন্দর গড়ে ওঠা এবং কীভাবে এই বন্দরের উন্নতিসাধন ঘটেছিল সেই দিকটি নীলমণি মুখার্জী তাঁর এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। আবার কলকাতা শহর এবং বন্দরকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠার মধ্যদিয়ে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশে পুঁজি গোষ্ঠীর উদ্যোগের দিকটি প্রজনানন্দ ব্যানার্জী তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থে দেখিয়েছেন। Dr. Prajnananda Banerjee, *Calcutta and its Hinterland, A Study in economic History of India, 1833-1900*, Calcutta, Progressive Publishers, 1975.

২৬। রজত রায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কলকাতায় বিভিন্ন ইউনিয়নগুলি গড়ে ওঠার প্রথমিক রূপটি বিশ্লেষণ করেছেন যার মধ্যে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) ছিল একটি। বাংলার নাবিকদের স্বার্থে ১৯২০ সালে এই সীমেন্স ইউনিয়নের একটি ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে গড়ে ওঠার বিভিন্ন দিকগুলি তিনি তুলে ধরেছেন। Rajat Ray, *Urban Root of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939*, Calcutta, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979, p. 84.

২৭। সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে কলকাতায় ইন্ডিয়ান সীমেন্স ক্লাব গঠনের মধ্যদিয়ে কিভাবে বাংলায় প্রথম শ্রমিক সংগঠন গড়নের প্রাথমিক প্রচেষ্টা চলেছিল। এভাবে শহর কলকাতার বন্দর এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মধ্যদিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটার প্রারম্ভিক প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালে বাংলায় ISU নামক সীমেন্স ইউনিয়নটি নব কলেবরে একটি পরিপক্ক সীমেন্স ইউনিয়ন রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। Suchetana Chattopadhyay, *An Early*

Communist, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913-1929, New Delhi, Tulika Books, 2011, p. 56.

২৮। শুভ বসু তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থে দেখিয়েছেন বাংলায় সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার মধ্যে মুসলিম ট্রেড ইউনিয়নগুলি কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯২৫ সাল নাগাদ মহম্মদ দাউদ ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের একটি সভা গঠনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যায় বেঙ্গল প্যাক্টের বিরোধিতা করেছিল। Subho Basu, *Does Class Matter? Colonial Capital and Workers' Resistance in Bengal (1890-1937)*, New Delhi, Oxford University Press, 2004, pp. 192-193.

২৯। Farhin Khanam, *Labour and Union Formation in Late Colonial Calcutta: A Case Study of the Indian Seamen's Union*, Unpublished M. Phil. Research Dissertation, Jadavpur University, 2014. (Unpublished)

৩০। Aniruddha Bose, *Class Conflict and Modernization in India, The Raj and the Calcutta Waterfront (1860-1910)*, New York, Routledge, 2018.

৩১। Conrad Dixon, 'Lascars: The Forgotten Seamen', in Rosemary Ommer and Gerald Panting (eds.), *The Working Men Who Got Wet*, St. Johns', Newfoundland, 1980, Frank Broeze, 'The Muscles of Empire: Indian Seamen and the Raj, 1919-1939', *Indian Economic and Social History Review*, Vol. XVIII, No. 1, 1981, pp. 43-67.

৩২। Rozina Visram, *Ayahs, Lascars and Princes, The Story of Indians in Britain, 1700-1947*, Routledge, New York, 1986. Michael H. Fisher, *Counterflows to Colonialism, Indian Travellers and Settlers in Britain and in Between, 1600-1857*, Permanent Black, New Delhi, 2004, pp. 137-79, *idem* "Working across the Seas: Indian Maritime Labourers in India, Britain and in Between, 1600-1857", *International Review of Social History*, 51, 2006, Supplement, pp. 21-45.

৩৩। Ravi Ahuja, 'Mobility and Containment: The Voyages of South Asian Seamen, c. 1900 – 1960', *International Review of Social History*, Vol. 51, 2006, pp. 111-141.

৩৪। Janet J. Ewald, "Crossers of the Sea: Slaves, Freedmen, and Other Migrants in the Northwestern Indian Ocean, c. 1750 – 1914", *The American Historical Review*, Vol. 105, No. 1, 2000, pp. 69-91.

৩৫। Georgie Wemyss, *The Invisible Empire: White Discourse, Tolerance and Belonging,* London, Ashgate Publishing Limited, 2009.

৩৬। Shompa Lahiri, Patterns of Resistance: Indian Seamen in Imperial Britain, Anne J. Kershen (ed.), *Language, Labour and Migration*, New York, Routledge, 2017.

৩৭। Katy Gardner, *Global Migrants, Travel and Transformation in Rural Bangladesh*, New York, Oxford University Press, 1995.

৩৮। Ashfaque Hossain, *Colonial Globalization and Its Effects on South Asia, Eastern Bengal, Sylhet and Assam, 1874 – 1971,* New York, Routledge, 2023.

৩৯। Vivek Bald, *Bengali Harlem, and the Lost Histories of South Asian America*, Cambridge, Harvard University Press, 2013.

৪০। Laura Tabili, *"We Ask for British Justice", Workers and racial difference in late imperial Britain,* New York, Cornell University Press, 1994.

৪১। *ibid*, pp. 58-59.

৪২। G. Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping. C. 1870 - 1945,* New Delhi, Oxford University Press, 2012.

৪৩। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, বৈশাখ, ১৪২০, পৃ. ৪৫২-৪৫৫।

88। Suchetana Chattopadhyay, *An Early Communiest, Muzaffar Ahmad in Calcutta, 1913 – 1929,* New Delhi, Tulika Books, 2011, pp. 10-11.

প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের ইতিহাস

১.১. ভূমিকা:

ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার নাবিকরা মূলত পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান থেকে কলকাতা বন্দরে এসে অন্তর্দেশীয় এবং বহির্দেশীয় বাণিজ্যিক জাহাজগুলিতে কর্মজীবন শুরু করেছিল। নদীমাতৃক বাংলার ব-দ্বীপে মাঝি মাল্লার অভাব ছিল না, যদিও এদের আকস্মিকভাবে এই জাহাজের কাজে অংশ নিতে দেখা যায়নি। তবে এখানে বাংলার নাবিকেরা জাহাজ কর্মে নিজেদের প্রতিপন্ন করে বহিঃসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী বিচরণ করে জাহাজী শ্রমিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[১] ব্রিটিশ শাসিত ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের সূচনাকাল থেকে নিয়ে প্রায় দীর্ঘ ১৫০ বছরের অধিককাল যাবৎ কলকাতা ভারতের রাজধানী শহর ছিল (১৯১১ সাল পর্যন্ত)। ১৯১২ সালে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলেও কলকাতা নদী মোহনা এবং সমুদ্র সন্নিকটস্থ হওয়ায় বন্দর হিসাবে যেমন এর গুরুত্ব কমেনি, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যতেও কোনোভাবে ভাটা পড়তে দেখা যায়নি। বাংলাতে চট্টগ্রাম বন্দরটিও জলপথে যাত্রা ও বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণে কলকাতার সংযোগ রক্ষাকারী সহযোগী বন্দর হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নদী তীরবর্তী শহরগুলিতে বিভিন্নপ্রকার শিল্প কারখানার উদ্ভব ঘটেছিল। এই শিল্প কারখানাগুলিতে যেভাবে অগণিত বাংলার কৃষক, বেকার যুবক, বিপর্যস্ত শিল্পীরা দলে দলে যোগদান করেছিল সেভাবে বন্দরগুলিকে সচল রাখার জন্য বন্দর শ্রমিক এবং সমুদ্রগামী ও নদীপথে চলাচলকারী জাহাজের কাজকর্ম বজায় রাখতে বাংলার নাবিকদের অবস্থানটিও ছিল নজরকাড়া। তবে কলকাতায় শিল্প কল-কারখানার শ্রমিকদের জায়গাটি শুধুমাত্র গ্রাম বাংলার মানুষেরা ধরে রাখেনি সেখানে কলকাতা শহরতলির দরিদ্র কর্মসন্ধানী মানুষগুলিও শিল্প শ্রমিক হিসাবে কাজে অংশ নিয়েছিল। এরা কিছু স্থানীয় ছিল আর বাকী সিংহভাগই ছিল যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান সংযুক্ত উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ), বিহার এবং উড়িষ্যা (বর্তমান ওড়িশা) থেকে আসা কর্মসন্ধানী

মানুষ।[২] আবার কলকাতাতে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে আফগানিস্থান থেকে আগত কাবুলিওয়ালাদের প্রবেশ ঘটতে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এরা জীবিকার তাগিদে নিজেদের ফেরী (Peddler) কিংবা শিল্প শ্রমিক হিসাবে কর্মে নিয়োজিত করেছিল। কর্মপদ্ধতির দিক দিয়ে শিল্প কারখানার শ্রমিক এবং নাবিকদের নিয়ে পর্যালোচনা করা হলে তাদের মধ্যে অনেকটা তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের নতুন শিল্পদ্রব্য উদ্ভাবনের জন্য কারিগরি এবং সহযোগী কর্মীদের হেল্পার হিসাবে কর্মসম্পাদন করতে হত এবং তারা কাজ সমাপ্ত করে দিনের শেষে নিজের গন্তব্যে অবস্থান করত। কিন্তু নাবিকদের নির্ধারিত কাজকর্ম পরিসমাপ্তি করে কমপক্ষে অর্ধ বৎসর যাবৎ আবার কখনো এক কিংবা দুই বৎসর অবধি দীর্ঘকালীন সময়সীমা জাহাজের মধ্যে অতিবাহিত করতে হত। এছাড়াও সমুদ্রে যাত্রাকালীন সময়ে আপৎকালীন ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জাহাজে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দালাল এবং ঘাট-সারেংদের উপস্থিতি নাবিকদের শোষণ যন্ত্র হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছিল যা নাবিক সমাজকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে বাংলার নাবিকদের সঙ্গে ইউরোপীয় নাবিকেরাও জাহাজে অবস্থান করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার নাবিকেরা নানাভাবে বৈষম্যতার শিকার হয়েছিল। ইউরোপীয় নাবিকেরা বাংলার নাবিকদের কষ্টকর এবং জীবন ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলি বলপূর্বক করিয়ে নিত। যদিও বাংলার নাবিকেরা এই শ্রমসাধ্য কাজগুলি সাহসিকতার সঙ্গে করে ফেলত। তারা সামুদ্রিক সংকটময় জীবনকে তুচ্ছ করে জাহাজের কাজগুলি ভয়হীন ভাবে দক্ষতার সহিত সম্পাদন করতে পারত বলে এদের 'লস্কর' বলে ডাকা হত।[৩] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুটি ঘটনা গোটা বিশ্বের সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করেছিল এবং জীবন ও জীবিকার জন্য জাহাজে কর্মরত নাবিকদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই নাবিকেরা কর্মসূত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিল। বহির্দেশীয় নাবিকেরা সংগঠিতভাবে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে যে আন্দোলন ও সমাবেশ করত তা নিয়ে পরবর্তীকালে স্বদেশে ফিরে এসে বিদেশে ঘটে যাওয়া আন্দোলনগুলির প্রেক্ষিতে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে বাংলায় নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করেছিল।

১.২. অবস্থানগত দিক দিয়ে বাংলার গুরুত্ব এবং কলকাতা বন্দর দ্বারা সংযোগ রক্ষাকারী শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের প্রবেশ:

ঔপনিবেশিক ভারতে বাংলা অবস্থানগত দিক দিয়ে একটি বিশেষ অংশ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বাংলা মূলত পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ (বর্তমানে বাংলাদেশ), বিহার, ও উড়িষ্যা (বর্তমান ওড়িশা) নিয়ে গঠিত ছিল।[৪] রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশেরা নিজেদের সুবিদার্থে বাংলাকে বিভাজিত করলে বাংলার আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক দিকগুলি ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং দেশীয় বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপোষক স্বদেশী ও বয়কট প্রভাব শুধুমাত্র বাংলাতেই অবস্থান করেনি এটি ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে গণজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। এই গণজাগরণে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বঙ্গভঙ্গ এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলার বিক্ষুব্ধ জনগণ রাজনৈতিক আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছিল। বাংলার জাতীয়তাবাদীরা গণ-সংগ্রামে শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। শ্রমিকদের আশু অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবি-দাওয়াগুলি সমর্থন জানিয়ে এরা শ্রমিকদের এই সংগ্রামে সামিল করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। শিল্প শ্রমিকদের অংশগ্রহণ গণ-সংগ্রামে একটা জঙ্গী প্রকৃতির রূপ নিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরফলে এই অসংখ্য শ্রমিকরা সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গণ-আন্দোলনে পর্যবসিত করতে পেরেছিল।[৫] এছাড়া রাজনৈতিক হিংসা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সামাজিক মেল বন্ধনের অভাব বাংলার পরিবেশে ঘুরে বেরিয়েছিল। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে বাংলাতে বিংশ শতকের প্রথম দিকে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যকালীন সময়ে বাংলাতে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। এই আন্দোলনে শ্রমিকগণ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এখানে শুধুমাত্র শ্রমিকেরাই অংশগ্রহণ করেছিল তা নয় বিভিন্নধরণের শিল্পের শ্রমিকগণ সহ ছাত্র, কৃষক এবং স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষগুলি যোগদান করেছিল। এরা শ্রমিকদের স্বার্থে বিভিন্ন স্থানে জনসভা, মিছিল, মিটিংয়ের মাধ্যমে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, লিয়াকৎ হোসেনের মতো জাতীয় স্তরের প্রথম সারির নেতাগণ ধর্মঘটী শ্রমিকদের স্বার্থে জনসভাতে

বক্তব্য রেখেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় পুঁজিপতি মালিক শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য বাংলার বহু শিল্প শ্রমিকেরা স্বদেশী আন্দোলনের সময় সংগঠিত হয়েছিল। স্বদেশী নেতাগণ কলকাতার ফেডারেশন হলে একটি সভা ডেকেছিলেন। কর্তৃপক্ষগণ এই সভায় যোগদানের অনুমতি না দেওয়ায় হাওড়ায় বার্ন কোম্পানির জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি কারখানায় আনুমানিক ১২,০০০ শ্রমিক কিছুদিন যাবৎ তাদের কাজকর্ম বন্ধ রেখেছিল।[৬] এসময় বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আন্দোলন এবং সমাবেশ হতে দেখা গিয়েছিল। এর ফলস্বরূপ মধ্যবৃত্ত কৃষক সম্প্রদায় থেকে শুরু করে হত দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর উপর দুঃখ দুর্দশা নেমে এসেছিল। তবে বিদেশী সংস্থাগুলি, দেশীয় ব্যবসাদার, মহাজন এবং দালালেরা সাধারণ মধ্যবৃত্ত কৃষক সম্প্রদায় এবং শ্রমিকদের শোষণ করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হয়েছিল।[৭] বিদেশী এজেন্সি কোম্পানি এবং দেশীয় ব্যবসাদারেরা বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শুরু করেছিল। এভাবে তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল এবং অন্যদিকে মহাজন ও দালালেরা শ্রমিক এবং সাধারণ কৃষকদের ঠকিয়ে নিজেদের লাভবান করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতের একজন প্রখ্যাত শিল্পপতি। তিনি নীল কারখানার প্রতিস্থাপন এবং আখের চাষ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে 'কার ট্যাগোর এন্ড কোং' তৈরি করেছিলেন। এছাড়া ১৮৩৭ সালে চিনাকুরি কয়লাখনি ক্রয় করে বেঙ্গল কোল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমনকি ১৮৩৬ সাল নাগাদ তিনি একটি জাহাজও ক্রয় করেছিলেন। দ্বারকানাথের এই শিল্পগুলি ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তিনি ইংরেজদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন 'ইংরেজরা ভারতীয়দের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি সব কিছু কেড়ে নিয়েছে এবং সব কিছুই এখন সরকারের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল'।[৮] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৃহদায়তন শিল্পগুলি গড়ে ওঠা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে বাংলাতে কলকাতা শহর ও বন্দরের উন্নতিসাধন করা হয়েছিল এছাড়াও ভারতের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান যেমন বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দর শহরের পরিকাঠামো মজবুত করার মধ্যদিয়ে আধুনিকীকরণ করা হয়েছিল। এই বন্দরগুলিকে ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণী আত্মপ্রকাশ করার পরিধি খুঁজে পেয়েছিল। কলকাতাতে দেশীয় ব্যবসাদারেরা বিশেষত হিন্দু বাঙালি, মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের ছিল এছাড়াও কাবুলিওয়ালা এবং প্রবাসী উর্দু ভাষী মুসলিমরাও ব্যবসাতে পুঁজি লগ্নী করেছিল।[৯] জমিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত কৃষক এবং বিপর্যস্ত কারিগররা

কারখানা কিংবা শিল্প শ্রমিক হিসাবে যোগদান করলেও, গ্রামীণ সামাজিক পরিকাঠামো, ধর্ম এবং নিজেদের রক্তের আত্মিক সম্পর্ক তাদেরকে বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিল। নতুন শহুরে পরিবেশে কর্মের সঙ্গে তারা পুরানো চিন্তা চেতনাকে সম্পূর্ণ রূপে সরিয়ে ফেলতে পারেনি। কর্মীর চাহিদা অনুযায়ী এইসব শ্রমিকদের দক্ষ এবং অদক্ষতার দিক নিরূপণ করা হলে তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সাধারণত শ্রমিকরা কাজ পেত সর্দার এবং দালাল শ্রেণীর মধ্যদিয়ে, এছাড়াও তারা নিজের আত্মীয় পরিজনের হাত ধরে শ্রমিক হিসাবে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিল।[১০] নাবিক শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বন্দরগুলিতে মধ্যস্বত্বভোগী আড়কাঠি, ঘাট-সারেং প্রকৃতির দালালদের অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং এদের মাধ্যমে জাহাজের কাজে নাবিকেরা নিয়োজিত হয়েছিল। কলকাতা বন্দরে নাবিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঘাট-সারেংদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এসকল ঘাট-সারেং প্রকৃতির দালালেরা নাবিকের কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষ হিসাবে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করত, যারা এই টাকা দিতে পারত তারাই নাবিকের কাজে যোগদান করতে পারত।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ধীরে ধীরে বাংলাতে বহু শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বাংলার উত্তরে চা বাগানকে কেন্দ্র করে যেমন চা শিল্প, সেভাবে দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমানের পশ্চিম প্রান্তে (আসানসোল, অন্ডাল, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া প্রভৃতি) কয়লা খনিকে কেন্দ্র করে খনি শিল্প গড়ে উঠেছিল। বাংলাতে প্রধানত চটশিল্প এবং কয়লাখনি শিল্প দুটির খুব দ্রুততার সঙ্গে প্রসারলাভ হতে দেখা গিয়েছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৮৮০ সালে বাংলায় যেখানে চটকলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯ টি পরবর্তী সময়কালে ১৯০৩ সালে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬ টি। চটশিল্প, রেলওয়ে এবং জাহাজ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিলাভের ক্ষেত্রে কয়লার অতিরিক্ত চাহিদার জন্য কয়লার উত্তোলনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই শিল্পগুলির স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য যেমন ব্যাপকহারে কয়লা সরবরাহ করা হয়েছিল তেমন নতুন নতুন গড়ে ওঠা শিল্পগুলিতেও কয়লার যোগান দেওয়া হয়েছিল।[১১] তবে হুগলী নদীর তীরে কলকাতার ভৌগলিক অবস্থান যেটা নদী মোহনার সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ার ফলে এখানে বহু শিল্প গড়ে উঠতে সহায়তা করেছিল। কলকাতা এবং কলকাতা সংলগ্ন হুগলী নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্পগুলি হল পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি। এই শিল্পগুলির সঙ্গে সঙ্গে হুগলী নদীর তীরে বিভিন্নপ্রকার কলকারখানাও গড়ে উঠতেও দেখা গিয়েছিল।

কলকাতাতে পাটশিল্প গড়ে ওঠার পূর্বে স্কটল্যান্ডের ডান্ডিতে যে পাটশিল্প ছিল তার কাঁচা পাট বাংলা থেকে বাণিজ্যরত জাহাজের মাধ্যমে কলকাতা বন্দর থেকে নিয়ে যাওয়া হত। এছাড়া বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, জার্মানিতে ভারত থেকে কাঁচা পাট রপ্তানি হত। ঊনবিংশ শতকে ২১ শতাংশের অধিক পরিমাণ কাঁচা পাট ভারত থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল যা ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[১২] ১৮৫৫ সালে বাংলার রিষরাতে প্রথম পাটশিল্প গড়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীকালে এই শিল্প কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলার কারখানাগুলিতে পাটের দ্বারা উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যগুলি কলকাতা বন্দর হতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বার্মা এবং ভারতের উপকূলবর্তী বাজারগুলিতে রপ্তানি করা হত।[১৩] যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য কলকাতাতে রেলওয়ে, ট্রামওয়ে শিল্প গড়ে উঠেছিল একইভাবে কাঁচা পণ্যদ্রব্য এবং শিল্পজাত বস্তু সামগ্রী জলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য বাংলার কলকাতা বন্দরকে বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছিল। এই বন্দরকে কেন্দ্র করে জাহাজ শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল। বাংলাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষত দুটি বন্দর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই দুটি বন্দর হল কলকাতা বন্দর এবং চট্টগ্রাম বন্দর, তবে কলকাতা ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী (১৯১১ সাল পর্যন্ত) হওয়ায় কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব চট্টগ্রাম বন্দরের তুলনায় ছিল অনেকটা বেশি এবং এই বন্দরের মধ্যদিয়েই ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলাতে বেশি পরিমাণ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন হত।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের শুরু থেকেই বাংলার কলকাতা বন্দরের বেশ গুরুত্ব ছিল এবং ধীরে ধীরে তার গুরুত্ব ক্রমশই বাড়তে থাকে। এই ঔপনিবেশিক আমলেই কলকাতা বন্দর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল কারণ এই বন্দরের মাধ্যমেই বেশিরভাগ শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি হত। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ভারতে ইউরোপীয় এবং স্বল্প কিছু দেশীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী শিল্প-কারখানা তৈরি করতে থাকে ফলে শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য কলকাতা কিংবা কলকাতার মতো সমতুল্য বন্দরগুলি (বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, রেঙ্গুন ইত্যাদি) নতুনভাবে সেজে উঠতে থাকে। এই কলকাতা বন্দরের পাশাপাশি বাংলার অপর আরেকটি বন্দর চট্টগ্রামের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, তবে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী শহর ও অনুকূল ভৌগলিক অবস্থানের জন্য কলকাতা বন্দরই ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ প্রাধান্যতা পেয়েছিল। বন্দরগুলিতে বাণিজ্য হত বিশেষত দুইভাবে বহির্দেশীয় বাণিজ্য এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অভ্যন্তরীণ

বাণিজ্য চলত ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী ছোট বড়ো বন্দরের সঙ্গে এছাড়াও নদীর তীরবর্তী অংশে গড়ে ওঠা কলকারখানাগুলিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী ছোট বোট (Boat) এবং স্টিমারের (Steamer) মধ্যদিয়ে বন্দরে পৌঁছে দিত। এরপর শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী গুলি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ত। ঔপনিবেশিক বাংলায় পাটশিল্প বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল, ১৮৫৫ সালের পর থেকে কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য পাটশিল্প গড়ে উঠেছিল। এই বন্দরগুলি সচল রাখার জন্য বহু শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ত। কলকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দর দুটিতে শ্রমিকদের প্রধানত দুই ধরনের কাজ করতে হত প্রথমত, একধরনের শ্রমিকদের জাহাজের মালপত্র বন্দরের মধ্যে নামানো এবং পুনরায় খালি জাহাজটিকে বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী দ্বারা ভর্তি করার কাজ করতে হত। দ্বিতীয়ত, জাহাজ দূর দেশে পাড়ি দেবার সময় জাহাজটিকে সংকটমুক্ত এবং সামুদ্রিক প্রতিকূলতাকে জয় করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য আর একধরনের শ্রমিক নিয়োজিত হত এরা নাবিক হিসাবে পরিচিত ছিল।[১৪]

১.৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বাংলার নাবিকদের সংগ্রামী জীবন পদ্ধতি:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব খুব দ্রুত কলকাতার রাজনীতির পুরো আবহাওয়া বদলে দিয়েছিল। মূল্যবৃদ্ধি, মুনাফাখোর দালালদের শোষণ এবং সামাজিক দুর্দশা রাজনৈতিক অসন্তোষের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালেও এই মহানগরী চরম দুরাবস্থা কাটিয়ে উঠতে অনেকটা সময় নিয়েছিল। তরুণ প্রজন্মের চরমপন্থী রাজনীতিবিদরা স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে তাঁদের দাবিদাওয়া পেশ করেছিল যা শাসকেরা উপেক্ষা করতে পারেনি। স্বদেশী আন্দোলন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিল। যুদ্ধের পরপরই ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় বন্ধ থাকা কলকাতার ব্যবসা এবং শিল্পক্ষেত্রগুলির অগ্রগতি হয়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে বিশেষত পাট শিল্পের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কলকাতাতে অনেক ভারতীয় ব্যবসাদার জাতীয় আন্দোলনকে সক্রিয় করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল যা পরবর্তীকালে খিলাফৎ এবং অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে একটি বিশেষ স্থানে উন্নীত হয়েছিল। রাজনৈতিক প্রতিবাদ আন্দোলনগুলির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিবাদীদের মধ্যে একটি নিগুঢ় সম্পর্ক ছিল

যেটা কলকাতা শহরে রাজনীতির বিশেষত্বকে বিকশিত করেছিল যা শহরের শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করতে সহায়তা দান করেছিল।[১৫]

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকে সংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে ভারতে অগণিত ছোট বড়ো ইউনিয়ন গড়ে উঠতে দেখা দিয়েছিল। এই ইউনিয়নগুলিকে অবলম্বন করে শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিতভাবে আত্মপ্রকাশ করার একটি নতুন দিক খুঁজে পেয়েছিল। রজত রায় তাঁর *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939* গ্রন্থে বিংশ শতকের প্রথম দিকে ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাসোসিয়েশন, পোস্টাল ক্লাব এবং ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান ইউনিয়নগুলির গড়ে ওঠার দিকগুলি আলোচনা করেছেন। ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান নামক ইউনিয়নটি নানারকম প্রতিকূলতাকে জয় করে বিভিন্ন নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই ইউনিয়নটি বাংলার নাবিকদের সমস্যা এবং দাবিদাওয়াগুলি শুনেছিল এবং তা সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিল।[১৬] বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে নিয়ে চারের দশক পর্যন্ত সময়ে গোটা বিশ্ব দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিল। এই যুদ্ধের ভয়াবহতার জন্য ইউরোপের ফ্রান্স, ব্রিটেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড, ইতালি, জার্মানির মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি যোগদানের ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভীষণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাদের উপনিবেশগুলির উপর পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক চাপ বাড়িয়েছিল। এইভাবে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কর্মরত শ্রমিক শ্রেণীর উপর এই যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে অত্যধিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটলে শ্রমিকদের বেতন কাঠামোরও অবক্ষয় হতে দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশগুলি থেকে সৈন্য নিয়ে গিয়ে এই মহাযুদ্ধতে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) যোগদান করিয়েছিল। ব্রিটিশেরা ভারতীয় সৈনিকদের জাহাজ মারফৎ সমুদ্রপথে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে মহাযুদ্ধতে অংশগ্রহণ করিয়েছিল। এই সকল সৈন্যরা খাদ্য, বেতন, বস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বৈষম্যতার শিকার হয়েছিল। যুদ্ধে অংশগ্রহণরত ভারতীয় সৈনিকদের প্রাণহানির মতো যেমন ঘটনা ঘটেছিল তেমন অনেকে অঙ্গহানির দ্বারা পঙ্গু হয়ে আজীবন কর্মহীন জীবন অতিবাহিত করেছিল। এদের মনের মধ্যে যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করেছিল। আবার ব্রিটিশ জাহাজগুলিতে ভারতের যেসব নাবিক কাজ করত যুদ্ধের সময় এদের অনেক ঝুঁকি নিয়ে

কাজ করতে হত। শত্রুপক্ষের দেশের জাহাজগুলি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে সমুদ্রে যাতায়াত করতে হত। কখনো কখনো শত্রুপক্ষের ওত পেতে থাকা জাহাজগুলির দ্বারা অতর্কিত আক্রমণের ফলে জাহাজ ডুবির মতো ঘটনাও ঘটত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমুদ্রে শত্রুপক্ষের আক্রমণ দ্বারা জাহাজ ডুবির মত ঘটনা অহরহ দেখা দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বোম্বাই এবং কলকাতা বন্দর থেকে পাঠানো ৫ থেকে ৬ শতাংশ জাহাজে লস্করদের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গিয়েছিল। এ সময় আনুমানিক ৩৪২৭ জন লস্কর সমুদ্রপথে বিদেশে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, আবার ১২০০ জনের মতো লস্কর শত্রুদেশে পণবন্দী ছিল। যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে মিত্রশক্তি বিজয়ী ঘোষিত হলে এসকল লস্করদের বীরত্বপূর্ণ কাজগুলির জন্য তাদের পুরস্কৃত করা হয়েছিল। এসময় বহু ভারতীয় ব্রিটেনে গিয়ে যুদ্ধাস্ত্র কারখানার মতো শিল্পে নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধের প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। ব্রিটেন ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সেসময় অনেক ভারতীয় ব্রিটেনকে আন্তর্জাতিক চুক্তি রক্ষায় সাহায্য করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করেছিল। ভারতীয়রা সৈন্য, সম্পদ এমনকি তাদের জীবন বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিশদের লড়াইকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় উপনিবেশের একটি অংশ হিসাবে বাংলার লস্করেরাও এই লড়াইয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলিকে তাদের জীবন এবং কর্মপন্থা দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[১৭]

১৯১৪ সালে গোটা পৃথিবীব্যাপী যে ভয়াবহ মহাযুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) সংগঠিত হয়েছিল তার ফলস্বরূপ ভারতীয় নাবিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচণ্ড দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থাতেও তারা সাহসিকতার সঙ্গে তাদের নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ কর্মগুলি সম্পাদন করেছিল। জার্মান সাবমেরিনের গোপন আক্রমণে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মরত বহু ভারতীয় নাবিক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। যুদ্ধাবস্থায় এই নাবিকদের পরিজনবর্গদের আতঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছিল। যেসকল নাবিক জাহাজে কর্মসূত্রে বিদেশে গেছে তারা আদৌ জীবিত আছে কিনা সে সম্পর্কে দীর্ঘদিন কোনো খোঁজ খবর না থাকার ফলে পরিজনবর্গ দুশ্চিন্তায় অপেক্ষমাণ থাকত। বহিঃসমুদ্রে যে সকল ভারতীয় নাবিক যুদ্ধের জন্য মারা যেত তাদের প্রাপ্য বেতনের অর্থ কলকাতার শিপিং অফিসের মাধ্যমে তাদের বিধবা স্ত্রী অথবা পরিবারের সদস্যদের হাতে দিয়ে দেওয়া হত। জার্মান সাবমেরিনে চোরাগোপ্তা আক্রমণ ছাড়াও বিশ্বযুদ্ধে নিয়োজিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন

রণতরীগুলির আক্রমণ সহ্য করে ভারতীয় নাবিকরা কঠিন অবস্থার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের নিজ নিজ কর্মসম্পাদন করেছিল এবং বহু নাবিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার কারণে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিজের অ্যাডমিরাল লস্করদের কর্মদক্ষতা এবং বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি যুদ্ধকালীন এবং শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে লস্করদের খুবই কাছে থেকে দেখেছেন। তিনি লস্করদের ভয়াবহ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে দেখেছেন। কলকাতা বন্দর থেকে পাওয়া এমন একজনও লস্কর ছিল না যে টর্পেডো আক্রমণের সম্মুখীন হয়নি। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার পরও কোনো লস্কর পুনরায় সমুদ্রে যেতে অস্বীকার করেনি। ইস্ট ইন্ডিজের অ্যাডমিরাল আরও বলেছেন লস্করগণ সব জায়গায় যেতে পারে এবং সাহসিকতার সঙ্গে সব কাজ করতে পারে। ১৯১৮ সালে লর্ড ইঞ্চকেপ (Lord Inchcape) লন্ডনের হোম অব এশিয়াটিক অনুষ্ঠিত সভায় ভারতীয় লস্করদের সাহসিকতার প্রশংসা করেছিলেন।[১৮]

বাংলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কলকাতা এবং চট্টগ্রাম এই বন্দর দুটিতে যে সকল নাবিক নিয়োজিত হয়েছিল তার বেশির ভাগই ছিল বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষজন। তবে অন্যদিকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক জমিদারের অত্যাচার এবং শোষণের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বেকার নারী-পুরুষগণ অভাবের তাড়নায় হুগলী নদীর তীরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শিল্প-কারখানাগুলিতে শ্রমিকের কাজে যোগ দিয়েছিল। বন্দরগুলিতেও এভাবেই জাহাজী শ্রমিকগণ (নাবিক) নিয়োজিত হয়েছিল তবে নাবিকের কাজে সে সময় পুরুষদেরকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হত কারণ জাহাজের মধ্যে একটানা দীর্ঘ ১ থেকে ২ বছর সময় অতিবাহিত করা এবং সামুদ্রিক প্রতিকূল পরিবেশে জাহাজের মধ্যে কঠোর অনমনীয় পরিশ্রম করা নারীদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সে সময়কার সামাজিক পরিকাঠামো পুরোপুরি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুক্ত না হওয়ায় নারীরা স্বেচ্ছায় পরিবারের অমতে কোনো কাজে যোগদান করতে পারত না তাই জাহাজের কাজে নাবিক হিসাবে পুরুষেরাই প্রধানত নিয়োজিত হত। যদিও নারীরা সাংসারিক অভাবের তাড়নায় বাংলাতে যে অন্যান্য শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল। সিলেট, চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী সহ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের অনেক কৃষক পরিবারের যুবক সম্প্রদায় কলকাতা বন্দরে জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল। গ্রামে বসবাসকারী মানুষ বিশেষ করে জমিজমাহীন কৃষকরা নিজেদের জীবন সচ্ছল করার তাগিদে এবং অলাভজনক কৃষিকাজ থেকে অব্যাহতি

পাওয়ার চেষ্টায় শহরে চলে এসেছিল। গ্রাম থেকে নিত্যদিন শহরে গিয়ে শিল্পশ্রমে নিযুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না বলে তারা শহরে গিয়ে নিজেদের মহল্লা গড়ে তুলেছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *কলিকাতায় চলাফেরা, সেকালে আর একালে* গ্রন্থে কলকাতাতে জাহাজের খালাসিদের আমদানি হতে দেখেছেন। মেছুয়াবাজার, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট থেকে নিয়ে পশ্চিমে চিৎপুর রোড পর্যন্ত অংশে সুরা এবং চায়ের দোকানগুলিতে এদের আড্ডাখানা ছিল। এখানে অনেক সরু গলি রাস্তা ছিল আর এই রাস্তার পাশেই সারিবদ্ধভাবে বাড়িগুলি অবস্থান করত এবং সেখানে এক একটি ঘরে দুই তিন জন মিলে বসবাস করত।[১৯] শুধুমাত্র অলাভজনক কৃষিকাজ বা চাষযোগ্য জমির ওপ্রতুলতা নয় আরও অনেক কারণ ছিল এই শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের মূলে। মূলত শহরে নানাধরনের কাজকর্ম তাদের সামনে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছিল তারই মধ্যে নাবিকেরাও একধরনের শ্রমিক যারা চলন্ত জাহাজের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করত। শহরের উন্নতমানের জীবনযাত্রা এই সমস্ত গ্রাম্য শ্রমিকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রবল চাপ পূর্ববঙ্গের অত্যাচারী জমিদারদের দ্বারা প্রতিফলিত হতে দেখা গিয়েছিল যা সমাজ অর্থনীতির উপর গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল। পূর্ববঙ্গের কৃষিভিত্তিক মুসলিম পরিবারের মানুষেরা এই শোষণ এবং বিভিন্নপ্রকার করের বোঝা থেকে মুক্তিলাভের জন্য গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে এসে কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে জাহাজে শ্রমিকের কাজে যোগদান করেছিল। জাহাজ কর্মে নিযুক্ত এই সকল শ্রমিকদের নিয়োজিত করার বিষয়টি ঘাট-সারেংরাই নিয়ন্ত্রণ করত। শ্রম চাহিদার অধিক সংস্থানে শ্রমের যোগান দিতে ঘাট-সারেংরা এই নিযুক্ত নাবিকদের পরিচিত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে ভাড়া করে এনে সাধারণ বেতনে স্বল্প সময় নির্ধারিত কাজে নিয়োজিত করত। এরা মূলত নদীকেন্দ্রিক ও উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যবহৃত স্টিমশিপ জাহাজে কর্মসম্পাদন করত। তবে এসকল জাহাজের কাজে অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত নাবিকরা যতদিন কাজ থাকত ততদিন কাজ করত কাজ ফুরালেই তারা আগের কৃষিকাজে ফিরে যেত। এই সকল নাবিকদের কর্মজীবন স্থলটি ছিল অনেকটাই এলোমেলো যারফলে এদের কর্মজীবনে অনিশ্চয়তার ছাপ পড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছিল। ১৯২০ সালের পর কলকাতায় ISU –এর দ্বারা নাবিকদের নিয়োগে ঘাট-সারেংদের প্রভাব কমিয়ে আগের থেকে তুলনামূলক অনেকটা সহজ ও স্বচ্ছ করে তোলা হয়েছিল যারফলে পূর্ববঙ্গের মফস্বল অঞ্চল থেকে আসা নাবিকদের স্বজন পোষণ জনিত বিভাজনের ক্ষেত্রটি শিথিল করা গিয়েছিল।[২০]

ঔপনিবেশিক বাংলায় কখনো কখনো অনেক নাবিকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনো জাহাজ বিদেশের কোনো বন্দরে প্রবেশ করলে অনেক নাবিকেরা জাহাজের কাজের চুক্তি লঙ্ঘন করে জাহাজ থেকে পালিয়ে যেত এবং সেখানে অন্য কোনো এক জীবিকা গ্রহণ করে স্বদেশের পরিবার পরিজনদের ভুলে গিয়ে নতুনভাবে জীবনধারণ করত। আবার অনেক সময় দেখা গেছে তারা বিদেশে গিয়ে সেখানে নাগরিকত্ব নিয়েছে কিংবা তারা বিদেশে দীর্ঘ সময় কাজকর্ম করে বহু অর্থ উপার্জন করার পর স্বদেশের পরিবার পরিজনের কথা ভুলতে না পেরে পুনরায় নিজ দেশে ফেরে এসেছে। কলকাতা বন্দরের মতো ভারতের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর হল বোম্বাই। এটি ভারতের পশ্চিম অংশে কোঙ্কন উপকূলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসাবে বিবেচিত। ঔপনিবেশিক ভারতে কলকাতা এবং বোম্বাই বন্দর দুটি ছিল ভারতের অন্যতম বাণিজ্য বন্দর। এই বোম্বাই বন্দরের মধ্যে 'John' Mohamed Jan ওরফে Mohamed Ali John ব্রিটিশ মার্চেন্ট জাহাজে কয়লা ঠেলার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। সে ১৯১৮ সালে ব্রিটেন এবং পরবর্তীকালে আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মসূত্রে গিয়েছিল। একসময় আমেরিকার ব্রুকলেইন বন্দরে জাহাজ প্রবেশ করলে সে জাহাজ থেকে নিউ ইয়র্কে পালিয়ে গিয়ে Detroit -এর গাড়ির কারখানায় কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সেখানে নাগরিকত্ব নিয়েছিল আবার সে ১৯২৪ সালে ভারতে ফিরে এসে বোম্বাই বন্দরে নাবিকের কাজে যোগদান করেছিল।[২১] বাংলার নাবিক শ্রমিকেরাও একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল আবার বিদেশের ভূমিতে নিজেদের ছোট colony গড়ে তুলেছিল। বাংলাদেশের সিলেটের নাবিকেরা ব্রিটেনের একটি অংশে সিলেট পাড়া গড়ে তুলেছিল যেখানে সিলেটি অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্যতা ছিল চোখে পড়ার মতো।[২২]

১.৪. কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গঠন, বন্দর এবং বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বন্দর ও নাবিক শ্রমিকদের যোগদান:

বাংলাতে হুগলী নদীর তীরে কলকাতা এবং কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহকে কেন্দ্র করে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার নেপথ্যে কলকাতা বন্দরের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এই হুগলী নদীর দুই তীরে যে অসংখ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল তা কলকাতা বন্দরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে ছোট বোট, স্টিমার নৌকার মাধ্যমে হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে

কমবেশি ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিক রমরমার জন্য কলকাতা বন্দরের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৭০ সালে কলকাতাতে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গঠন হয়েছিল। এই পোর্ট ট্রাস্ট গঠনের ফলে কলকাতা বন্দরের উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে জেটিগুলিকে নতুন করে সংস্কার করে আধুনিকীকরণ করা হয়েছিল। এই পোর্ট ট্রাস্টের নজরদারি করার জন্য একজন পোর্ট কমিশনারকে নিয়োজিত করা হয়েছিল।[২৩]

১৮৭০ সালে পঞ্চম আইন অনুসারে কমিশনারের অধীনে বন্দরের যাবতীয় কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। এ সময় সমুদ্রগামী জাহাজগুলি থাকার জন্য কেবলমাত্র ৪ টি জেটি চালু ছিল এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য ১ টি ঘাট ছিল। বন্দর পরিকাঠামোর সুবিধার্থে কমিশনাররা স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক বরাবর কিছু জমিও দখলে রেখেছিল। নব নিযুক্ত কমিশনাররা বিভিন্নপ্রকার নতুন নিয়মে কাজগুলি করতে অভ্যস্ত না থাকায় তাদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল তাই তারা এই ব্যবস্থাপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু তারা দূরদর্শী ও সাহসের অধিকারী হওয়ার জন্য হাতে থাকা কাজগুলি উৎসাহ নিয়ে সম্পন্ন করতে পেরেছিল। তবে কমিশনাররা কাজগুলি হাতে নেওয়ার পর দুই ধরণের সমস্যার মধ্যে পতিত হয়েছিল। প্রথমত, পুরাতন কাজগুলির সঙ্গে নতুন অফিসিয়াল কাজের নিয়ম এবং পদ্ধতি মিলে মিশে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরণের নতুন কাজ এবং নির্মাণ কার্যগুলি কমিশনারদের অবিলম্বে গ্রহণ করতে হয়েছিল।[২৪] বন্দর কমিশনারদের প্রধান কার্যালয় ভবনের নির্মাণকার্য ঠিকা শ্রমিকদের দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছিল। ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে এই ভবনের নির্মাণটি সম্পন্ন হয়েছিল। বন্দর কমিশনারের পাশাপাশি ভবনটি নির্মাণ করেন বন্দরের কর্মকর্তাগণ। এর অর্থ হল বন্দরের জাহাজ চলাচলের সঙ্গে যুক্ত বিভাগগুলি এবং বন্দর পরিকাঠামোয় ব্যবস্থাপনার কাজগুলি একই ছত্রতলে সম্পন্ন হত। এটি বাণিজ্য এবং বন্দরের সাথে সংযুক্ত সকলের জন্য সুবিধাজনক ছিল।[২৫]

বরুণ দে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৩৫ তম বার্ষিক অধিবেশনে কলকাতা বন্দরের গড়ে ওঠা এবং কলকাতা শহরের মানুষের সঙ্গে কীভাবে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। অতীতে কলকাতা বন্দর হুগলী নদীর পূর্ব তীরে ডক ভূমিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। আনুমানিক ৩০০ বছর পূর্বে উত্তর মধ্য কলকাতার যে অংশটি দিঘি কলিকাতা এবং বাজার

কলিকাতা নামে পরিচিত ছিল যা মূলত লাল দিঘিকে বেষ্টিত করে গড়ে উঠেছিল, এই জায়গাটি ঔপনিবেশিক আমলে ডালহৌসী এবং বর্তমানে বি.বা.দি. বাগ নামে পরিচিত। ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের সূত্র ধরে ব্রিটিশরা তাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান এবং জলপথে নিজেদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কলকাতা বন্দরের উন্নতিসাধন ঘটিয়েছিল। কর্নেল ওয়াটসন খিদিরপুর ডক গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু তিনি অসফল হয়েছিলেন পরবর্তীকালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল কিয়েড এর নেতৃত্বে খিদিরপুর ডকের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। প্রথমদিকে কলকাতা বন্দরটি অবস্থান করেছিল হুগলী নদীর পূর্ব তীরে স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক (বর্তমানে যেটি স্ট্র্যান্ড রোড নামে পরিচিত) নামক স্থানে, তারপর এটিকে হুগলী নদীর প্রসারিত বাঁক বরাবর ওয়াটগঞ্জের দিকে স্থানান্তরিত করা হয়। হুগলী নদীর নাব্যতার জন্য বিদেশ থেকে আসা জাহাজগুলিকে বন্দরে প্রবেশ করাতে এবং বিদেশে পাড়ি দেওয়ার সময় নানারকম সমস্যায় পড়তে হত। এই জন্য বন্দরের ডক ও জেটিগুলিকে উপযুক্ত পরিকাঠামোর মাধ্যমে সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলস্বরূপ কলকাতা বন্দরের ক্রমান্বয়ে সংস্করণ ও উন্নতিসাধন করা হয় যা ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যকে উচ্চতর শিখরে নিয়ে গিয়েছিল।[২৬]

হুগলী নদীকে ভিত্তি করে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে (হাওড়া, হুগলী এবং দুই চব্বিশ পরগনা) যে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেছিল সেক্ষেত্রে কলকাতা বন্দর একটা বাণিজ্যিক যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছিল। শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার হস্তশিল্প গুলি নষ্ট হতে থাকে। এরফলে হস্তশিল্পীরা নিজেদের জীবিকা হারিয়ে নতুন জীবিকার সন্ধানে হুগলী নদীকেন্দ্রিক যে শিল্পগুলি গড়ে উঠেছিল সেখানে একে একে শ্রমিক হিসাবে যোগদান করেছিল। শিল্প কারখানাতে শুধুমাত্র এই শিল্পহারা শিল্পীরাই যোগদান করেনি সেখানে গ্রাম বাংলার নারী পুরুষ নির্বিশেষে বহু কৃষক, বাউন্ডুলে বেকার যুবকেরাও শ্রমিকের কাজে যোগদান করেছিল। আবার বাংলাতে রেলওয়ে এবং ট্রামওয়ে শিল্পতেও বহু শ্রমিক কাজ করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছিল। কলকাতা নগরের উত্থানের ক্ষেত্রে শিল্প এবং কলকারখানাগুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করেছিল সেক্ষেত্রে কলকাতা বন্দরের অবদানও কম ছিল না। শিল্প কারখানার পাশাপাশি এই বন্দরের স্বকীয়তা বজায় রাখতে বন্দরে শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছিল। বন্দরের পরিকাঠামোকে সুদৃঢ় করার জন্য বহু ঠিকা শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। গ্রাম বাংলার মানুষ

শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য শহরে এসে প্রতারক লোকের খপ্পরে পড়ে তাদের জীবনে চরম দুর্গতি ডেকে এনেছিল। ইউরোপীয় কিছু মালিক শ্রেণী ভারতীয় দালাল প্রকৃতির প্রতারক লোককে গ্রামাঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত করেছিল। এই প্রতারক লোকেদের 'আড়কাঠি' বলা হত।[২৭] আড়কাঠিরা জাহাজে নাবিকের কাজ কিংবা বিদেশে কাজ পাইয়ে দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামের বেকার, ভূমিহীন, অর্ধভুক্ত মানুষগুলিকে জাহাজ মারফৎ বিদেশে পাচার করে দিত। প্রথমত এদের দিয়ে বিভিন্ন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিত এরপর এদের কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এছাড়াও ভারতের ফরাসী বন্দরগুলিতে এনে কিছুদিন বন্দরগুলিতে সশস্ত্র প্রহরায় রাখার পর ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দিত। প্রধানত এই শ্রমিকদের মরিশাস, ব্রিটিশ গায়েনা, ত্রিনিদাদ, জ্যামাইকা, দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্যান্য ছোট দ্বীপ সহ ফরাসী উপনিবেশ সমূহতে প্রেরণ করা হত।[২৮] নারী, পুরুষ সহ শিশুরাও এই শ্রমিক শ্রেণীর আওতাভুক্ত ছিল। এদের জাহাজে করে যখন ভারতের বাইরে নিয়ে যাওয়া হত তখন জাহাজে এত বেশি সংখ্যক এই শ্রমিকদের উঠানো হত যে জাহাজে সংখ্যাধিক্য লোকজনের জন্য অসুস্থ হয়ে অনেকে মারা যেত আবার অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাপনাও ছিল না। কখনো কখনো নিরুপায় হয়ে এই শ্রমিকেরা জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করত। আবার এদের শ্রমিক হিসাবে কাজের অজ্ঞতার সুযোগে অনেক সময় দাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হত। সেখানে এদের দৈনন্দিন কাজের সময়সীমা ছিল ১২-১৩ ঘণ্টা। কলকাতা শহরের নাগরিকরা এই শ্রমিক সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে তীব্রভাবে নিন্দা জানিয়েছিল। এই কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের প্রতারিত করে আড়কাঠি শ্রেনীর লোকেদের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি নিয়ে গ্রাম বাংলার মানুষজন ভীতসন্ত্রস্ত ছিল।[২৯]

সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় তাঁর *An Early Communist, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913 – 1929* নামক বইয়ে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতাতে মুসলিম শ্রমিকদের প্রবেশ লক্ষ্য করেছেন। যেখানে তাদের পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে স্বাক্ষরতার হার কেমন ছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি মুসলিম শ্রমিকদের নানারকম পেশার সাথে যুক্ত হতে দেখেছেন। এরমধ্যেই মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ নাবিক এবং বন্দর শ্রমিকের কাজে যোগদান করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকে বহু উর্দুভাষী মুসলমানরা কাজের

সন্ধানে শিল্প এবং বাণিজ্য নগরী কলকাতাতে এসে বসবাস শুরু করেছিল। মুসলিমদের দারিদ্রতার জন্য শিক্ষা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে এদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল খুবই কম। এদের শহরের বেশিরভাগই নিরক্ষর হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুসারে মুসলমানদের সর্বনিম্ন স্বাক্ষরতার হার অব্যাহত ছিল। ১৯০১ সালে এই হার ছিল ১৬.৫০ শতাংশ এবং পরবর্তী দুই দশক এই চিত্র অপরিবর্তিত ছিল। যদিও কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক পুঁজি অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল, তবে ১৮৭৬ সালে পৌরসভা এ বিষয়ে দেশীয় জমিদারী পেশাজীবী এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর জন্য একটি সীমিত অধিকার প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা কার্যকরী করেছিল। ঔপনিবেশিক নির্বাচন প্রক্রিয়াতে বিশেষত উচ্চবর্গীয় সম্পদশালীরা অংশগ্রহণ করতে পারত, এখানে নিম্নবৃত্তের মানুষেরা এই নির্বাচনে যোগদান না করতে পারায় এদের পরিসংখ্যান অধরা রয়ে গিয়েছিল। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে এই কলকাতা শহরে পৌরসভার ওয়ার্ডগুলিতে মুসলিমদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। কলুটলা, গার্ডেনরীচের মতো শহরতলিতে মুসলিমদের একটা বড়ো অংশ বসবাস করত। তবে আর একটি বিষয় বন্দর এলাকায় মুসলিম শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা গিয়েছিল। এই সকল মুসলিম শ্রমিকরা দর্জি (ওস্তাগর), বই বাঁধাই কারী (ধূপতারি), গৃহভৃত্য (খানসামা), রাজমিস্ত্রি, গরুর কিংবা ঘোড়ার গাড়ি চালক, আস্তাবল তদারককারী, পুলিশ (থানাদার), ছাপাখানায় কাজের কর্মচারী এবং নাবিক হিসাবে বিভিন্ন ধরণের কর্মে লিপ্ত থাকত। এছাড়া কলকাতাতে ভিক্ষুকদের প্রায় অর্ধেকই ছিল মুসলিম। ১৯১১ এবং ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের শ্রমিক শ্রেণীর পাশাপাশি মুসলিম শ্রমিকদের দুরাবস্থার সামান্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল।[৩০]

তাৎক্ষনিক এবং দীর্ঘকালীন, স্থানীয় ও বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন সমস্যাতে সর্বদা কলকাতার শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে মুসলিমদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেত। শ্রমিকদের উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যদিয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া পেশ করে কার্যসিদ্ধি করা। শহরের কিছু পুরাতন ট্রেড ইউনিয়ন কলকাতা বন্দরে তৈরি হয়েছিল এবং বাকি ট্রেড ইউনিয়নগুলি মুসলিম নেতৃত্ববর্গের দ্বারা স্থানীয় জনগণকে একত্রিত করেছিল। ১৮৯৫ সালে গঠিত ইন্ডিয়ান সীমেন্স ক্লাব ছিল নাবিক শ্রমিক-শ্রেণীর সংগঠন তৈরির প্রথম দিকের একটি প্রচেষ্টা।[৩১]

১.৫. বাংলার নাবিকদের উত্থান এবং 'লস্কর' নামে পরিচিতি লাভ:

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় কলকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দর দুটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই বন্দর দুটিতে নিয়োজিত বন্দর শ্রমিক, জাহাজে কর্মরত বাংলার নাবিক শ্রমিক এবং শিল্প কারখানার শ্রমিকদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে অনেকটা তফাৎ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। শিল্প শ্রমিকদের তুলনায় নাবিকদের কর্মজীবন ছিল অনেকটা ভয়ানক এবং তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণতার মধ্যদিয়ে জাহাজে সময় অতিবাহিত করতে হত। এই ঔপনিবেশিক সময়ে কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে জাহাজে কর্মের জন্য বহু নাবিক নিয়োজিত হয়েছিল। বন্দরে জাহাজ ছাড়ার সময় থেকে নিয়ে গন্তব্য বন্দরে জাহাজ পৌঁছানোর সময় পর্যন্ত জাহাজে নাবিকদের বিভিন্নপ্রকার কর্মসম্পাদন করতে হত। নাবিক রূপে যে সকল শ্রমিক জাহাজের কাজে নিযুক্ত থাকত তাদের অনেক সময় 'লস্কর' হিসাবে চিহ্নিত হতে দেখা গিয়েছিল। হবসন-জবসনের বর্ণনা অনুযায়ী লস্কর (Lascar) শব্দটি প্রথমত ফার্সি শব্দ লস্কর (lashkar) এবং এই একই শব্দ আল'আস্কার (al'askar) থেকে আগত, যার অর্থ হল সৈনিক (Soldiers or army men)। পর্তুগীজরা এই লস্কর শব্দটিকে লস্করীণ (Lasquarin) এবং লস্করী (Lascari) শব্দে উচ্চারণ করত। অষ্টাদশ শতকে আবিসিনিয়া, ওমানি এবং মালাবার উপকূলে পর্তুগীজ, ডাচ এবং ব্রিটিশদের জাহাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বন্দুকধারী কর্মরত সৈনিকদের লস্কর বলা হত। এই একই শতকে দেশীয় সৈনিকরা জাহাজের কাজে যুক্ত থাকলে তাদেরকেও 'লস্কর' বলা হত।[৩২] এরা প্রধানত জাহাজকে শত্রুপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পাহারাদার রূপে কাজ করত। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিক থেকে যে সকল নাবিকেরা ভারতীয় এবং ব্রিটিশ জাহাজের কাজে যুক্ত থাকত তারা 'লস্কর' নামে পরিচিত ছিল। এই 'লস্কর' শব্দটিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থান বিশেষে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে ঔপনিবেশিক ভারতে কুলিদেরও লস্কর বলতে দেখা গিয়েছিল কারণ এরা শারীরিক সক্ষমতার সহিত কাজগুলি সম্পাদন করত। এছাড়াও পাহাড়ে খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে যেসকল সুদক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মীবৃন্দ কাজকর্ম করত তাদেরও লস্কর বলা হত। তবে প্রধানত ১৯২০ এর দশকে স্টিমশিপ জাহাজে কর্মরত নাবিকদের 'লস্কর' হিসাবে চিহ্নিত

করা হয়েছিল। আধুনিক ভারতে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় জাহাজগুলিতে লস্করেরা বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মের মধ্যদিয়ে নিজেদের জীবিকা এবং জীবনযাত্রা নির্ধারিত করেছিল। এরা জাহাজের মধ্যে কেবিন ক্রু, ডেক ক্রু মেম্বার এবং ইঞ্জিন রুম মেম্বার হিসাবে কাজ করত এছাড়াও রাঁধুনি, খাবার পরিবেশনকারী, নাপিত, অফিস কর্মী, ভাঁড়ারঘর এবং অফিস ঘর পরিদর্শক ও পাহারাদারের কাজ করত। লস্করদের জাহাজের মধ্যে বিভিন্নধরণের কাজ করতে হত, জাহাজী শ্রমিকদের মধ্যে যারা রান্নার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল তাদের 'ভাণ্ডারী' (*bhandari*) বলা হত। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য যে ভারতীয় নাবিকরা তাদের নিজেদের পছন্দমত নিজস্ব রান্না করার জন্য লোক রাখতে পারত। আবার জাহাজে কর্মরত যে সমস্ত নাবিকরা রান্না করা খাবার অন্যান্য নাবিক এবং যাত্রীগণের মধ্যে সরবরাহ করত তাদের 'টিন্ডেলস' (*tindals*) বলা হত। যে সকল নাবিকগণ জাহাজে চালকের ভূমিকা পালন করত তারা 'সুখানীজ' (*Seacunnies* or *Sukhanis*) নামে পরিচিত ছিল। এছাড়াও 'আগওয়ালাস' (*aagwalas*), 'পানিওয়ালাস' (*paniwalas*), 'কাসাবস' (*cassabs*) নামে সাধারণ নাবিকগণ (Crews) জাহাজের কেবিনের মধ্যে কাজ করত, এর সাথে আরও কিছু নাবিকগণ যারা কেবিন বয়, সেলুন বয়, রাধুঁনি, অফিস বয়, ভাড়ার ঘর রক্ষক প্রভৃতি জাহাজের বিভিন্ন অংশে কাজ করত তাদেরও 'লস্কর' হিসাবে বিবেচিত করা হত।[৩৩]

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেমন ভারত, বার্মা, সিংহল, লাওস, কম্বোডিয়া, জাভা, ফিলিপিন্স প্রভৃতি দেশগুলিতে জাহাজে করে বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি হত। এই ব্যবসা বাণিজ্যরত জাহাজগুলিতেও লস্করদের অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। লস্কর শব্দটির দ্বারা শুধুমাত্র যে জাহাজের নাবিকদের চিহ্নিত করা হয়েছিল তা নয়, বিংশ শতকে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত দক্ষ কর্মীদের ক্ষেত্রে সময় বিশেষে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ কাজে দক্ষ যেমন রেলওয়ে, সরকারী কোনো বিভাগের কাজে কিংবা সেনাবাহিনীতে দক্ষতার সহিত কাজ করলে সেই সমস্ত কর্মীদের 'লস্কর' বলে অভিহিত করা হত।

কলকাতা বন্দরে যেসব লস্কর নিয়োজিত হয়েছিল তার অধিকাংশটাই ঘাট-সারেং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। জাহাজে নিযুক্ত লস্করদের বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার পূর্বে অগ্রীম ১ মাসের বেতন কেটে নিয়ে ঘাট-সারেংকে জমা দিতে হত যেটা তারা নিজেদের বিলাসব্যসনে খরচ করত। জাহাজে

লস্করদের সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাজ করতে হত, সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দিনে ৯ ঘণ্টা, শনিবার ৬ ঘণ্টা এবং রবিবার ৩ ঘণ্টা কাজের সময়সীমা ছিল। জাহাজের নাবিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘাট-সারেংদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় পরবর্তীকালে ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন দ্বারা কলকাতাতে সারেংদের ঘুষ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি ভাবে তুলে দেওয়া হয়।[৩৪]

১৮৭৯ সালে কলকাতা পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে ১১ টি দেশের নাবিক জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল, যারা আরব, মালয়, পূর্ব আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর, ম্যানিলা, পেঙ্গান, জাভা, চিন প্রভৃতি দেশ থেকে এসেছিল। এই ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার লস্করেরা কলকাতা, হাওড়া, দুই চব্বিশ পরগনা, হুগলী, চট্টগ্রাম, সিলেট, সন্দ্বীপ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাগুলি থেকে কলকাতা বন্দরে এসে জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল।[৩৫]

ঔপনিবেশিক আমলে লস্করদের নানাভাবে বৈষম্যতার শিকার হতে হয়েছিল। এই সময় জাহাজগুলিতে দুই ধরণের নাবিকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল প্রথমত, ইউরোপীয় নাবিক এবং দ্বিতীয়ত, দেশীয় নাবিক যারা লস্কর নামে পরিচিত ছিল। সংখ্যাগত দিক দিয়ে জাহাজগুলিতে ইউরোপীয় নাবিকেরা লস্করদের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক ছিল। আসলে স্বল্প বেতনে এই অধিক কর্মীর যোগান ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছিল। ইউরোপীয় নাবিকদের দেহের রঙ সাদা হওয়ায় এরা কৃষ্ণবর্ণের লস্করদের সাথে মেলামেশা করত না। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করার জন্য এরা লস্করদের কম বেতনে শ্রমসাধ্য অতিরিক্ত পরিমাণ কাজ করিয়ে নিত। জাহাজে কর্মসূত্রে যাত্রাকালীন সময়ে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের দিক দিয়ে লস্করদের সাথে ইউরোপীয় নাবিকদের ভেদাভেদ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, বার্মা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আরবীয় উপদ্বীপের লস্করদের সাথে ইউরোপীয় নাবিকদের কর্ম এবং বর্ণগত বৈষম্যতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে বাংলার নাবিকেরাও বাদ ছিল না একইভাবে এদের উপরও এই বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[৩৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে লস্করদের অভিবাসন ঘটতে দেখা গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার নাবিকরা "Oriental Quarter" তৈরিতে অবদান রেখেছিল এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পূর্বতন ভারতীয় নাবিকদের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় যাদের মধ্যে অনেকেই

জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ বন্দর শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের প্রবাসী হওয়ার ফলে সেখানে বসবাসকারী দেশীয় মানুষদের সঙ্গে বন্দরের মধ্যদিয়ে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সিলেট জেলার অধিবাসীদের একটি ছোট অংশ পূর্ব লন্ডনে প্রবাসী হিসাবে বসবাস শুরু করেছিল। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে এরা একটি বৃহৎ অভিবাসী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। আবার কাশ্মীরের মিরপুর এলাকার (বর্তমানে পাকিস্থানে) দমকলকর্মীরা যারা তাদের অনেক প্রতিবেশীর হাত ধরে উত্তর ইংল্যান্ড এবং মিডল্যান্ডে কর্মসূত্রে অভিবাসন নিয়েছিল। এভাবে বহু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির লস্করেরা ব্রিটেনে গিয়ে প্রবাসী হয়ে বসবাস শুরু করেছিল।[৩৭]

এরা জাহাজে কর্মসূত্রের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিলেটে বসবাসকারী নাবিকেরা পরবর্তীকালে লন্ডনে প্রবাসী হিসাবে জীবনধারণ করেছিল। তারা বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, পান্থশালা, ফার্স্টফুডের মতো দোকান করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেছিল। তদ্রূপ ১৯১০ সাল নাগাদ নিউ ইয়র্ক বন্দরে প্রবেশের মধ্যদিয়ে বহু ভারতীয় নাবিক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী হয়ে বসবাস শুরু করেছিল। এখানে তারা ফ্যাক্টারী, মিল, শিল্প-কারখানা, গাড়ি মেরামতকারী কারখানা প্রভৃতি কাজে যোগদানের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা পরিবর্তন করেছিল।[৩৮]

১.৬. উপসংহার:

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত শ্রমিক রূপে আত্মপ্রকাশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে পরিগণিত করা হয়। বাংলাতে হুগলী নদীর তীরে কলকাতাকে কেন্দ্র করে অগণিত শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার পেছনে কলকাতা বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই শিল্প কলকারখানাতে প্রান্তিক গ্রাম বাংলা থেকে বেকার যুবকেরা শিল্প শ্রমিক হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিল। একইভাবে বাংলার নাবিকদের উত্থান এবং বিশ্বব্যাপী পরিচিতির পেছনে কলকাতা বন্দর অনুঘটকের কাজ করেছিল, যদিও বাংলার চট্টগ্রাম নামক অপর আর একটি বন্দরের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না, তথাপি ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সময় কলকাতা ভারতের রাজধানী হওয়ায় এবং উন্নত রেল ও সড়ক যোগাযোগের জন্য কলকাতা বন্দরের বিশেষ প্রাধান্যতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৮৭০ সালে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বন্দরের পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন করা

হলে বন্দরে এবং জাহাজে কাজের জন্য শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই কলকাতা বন্দরকে ভিত্তি করে বাংলার অসংখ্য কৃষক এবং শিল্পকর্ম হারা শিল্পীরা একে একে বন্দর শ্রমিক এবং জাহাজের কাজে নাবিক হিসাবে যোগদান করেছিল। বাংলাতে যে নাবিক শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তারা মূলত দীর্ঘ সময়কাল আনুমানিক ১ কিংবা ২ বৎসর যাবৎ পরিবারবর্গদের থেকে বিচ্যুত হয়ে জাহাজের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে নিরলস প্রচেষ্টা এবং অবিরত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিল। এখানে কাজের জন্য প্রথমত এই শ্রমিকদের দালাল এবং ঘাট সারেংদের শরণাপন্ন হতে হত। ঘাট সারেংরা ছিল এই নাবিক শ্রমিকদের নিয়োগের একমাত্র অবলম্বন। এরা নাবিকদের নিয়োগের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ ঘুষ হিসাবে নিজেদের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য আত্মসাৎ করত যা নাবিকদের ক্ষুব্ধ করেছিল।

এই ব্রিটিশ শাসিত ভারতে কলকাতা বন্দর থেকে সমুদ্রগামী জাহাজগুলিতে দুই ধরণের নাবিকদের অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল, (১) ইউরোপীয় নাবিক এবং (২) ভারতীয় নাবিক। ইউরোপীয় নাবিকেরা সংখ্যাগত দিক দিয়ে ভারতীয় নাবিকদের তুলনায় অনেক কম ছিল। এরা মূলত সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে চালিত হয়ে নাবিক হিসাবে কাজ করেছিল। আবার অন্যদিকে জাহাজগুলিতে ভারতীয় নাবিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই লস্কর নাবিকেরা ছিল প্রচন্ড সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু এবং দুর্ধর্ষ প্রকৃতির তাই এরা সামুদ্রিক নানা প্রতিকূলতাকে মানিয়ে নিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজগুলিতে কর্মসম্পাদন করতে পারত। ঔপনিবেশিক শাসনে এই সকল লস্করদের ইউরোপীয় নাবিকদের তুলনায় অনেক স্বল্প বেতনে অধিক কার্য সম্পাদনে বাধ্য থাকতে হত। এরা শুধু বেতনই নয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, এমনকি আচার ব্যবহারেও ইউরোপীয় নাবিকদের দ্বারা বৈষম্যতার শিকার হয়েছিল। ভারতে অবস্থানরত বাংলার লস্করেরাও এই বৈষম্যতার শিকার হতে অব্যাহতি পায়নি। এই বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির প্রতি এরা অসন্তুষ্ট ছিল। ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হলে লস্করদের জাহাজে কাজকর্ম আগের তুলনায় অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় পৌঁছায়। এই আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় জাহাজের মালিকগণ লস্করদের দক্ষতা এবং সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করা দেখে মুগ্ধ হয়ে ব্রিটেনে বণিক সভায় ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। যদিও এই জাহাজে কর্মরত নাবিকেরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের দ্বারা শাসন ও বৈষম্যমূলক আচরণের হাত থেকে মুক্ত হতে পারেনি এবং এরই সঙ্গে বন্দরে

অবস্থানরত দালাল ও ঘাট-সারেংদের মধ্যদিয়ে নাবিকদের শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। এই সমস্ত ঘটনাগুলি নাবিকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটিয়েছিল যার ফলশ্রুতি হিসাবে এরা নিজেদের সংগঠিত করার দিকে ধাবিত হয়েছিল।

এই নাবিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে নাবিকরা ১৮৯৫ সাল নাগাদ 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ক্লাব' গঠনের মধ্যদিয়ে প্রাথমিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল। বাংলাতে প্রথম ১৯০৮ সালে সংগঠিত নাবিকদের নিয়ে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান' নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এই সংগঠনটি গঠনের ক্ষেত্রে আর. ব্রাউনফিল্ড, এস. মোঘলজান, মহম্মদ দাউদ, কাশেম আলি, সৈয়দ মিন্নাত আলি প্রমুখ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অবদান ছিল অনস্বীকার্য।[৩৯] এই ইউনিয়নটি নাবিকদের সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নাবিকদের পাশে থেকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছিল। কিন্তু এই ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত নাবিকগণ বহির্বিশ্বে সমুদ্রযাত্রার জন্য সর্বক্ষণ সংগঠনের কাজে লিপ্ত না থাকায় দীর্ঘদিন সংগঠনটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। যুদ্ধ পরবর্তীকালে এই সংগঠনের সদস্যদের প্রচেষ্টায় ইউনিয়নটি পুনর্জীবিত হয় এবং কালক্রমে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' (ISU) নামে পরিচিতি লাভ করে নাবিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, pp. App. – XIII, LXXXI, LXXXII.

২। Rajat Roy, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939*, Calcutta, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979, p. 52.

৩। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, publication date not known. Part-1, p. 5.

৪। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০–২০০০,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ৮৫।

৫। *তদেব*, পৃ. ৮৬।

৬। বিপান চন্দ্র, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৮৫-১৯৪৭,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৪, পৃ. ১৬৫।

৭। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৩, পৃ. ২৬।

৮। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০–২০০০*, কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ২৪।

৯। Rajat Roy, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939*, Calcutta, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979, p. 9.

১০। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫–১৯৪৭*, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৩, পৃ. ৫২।

১১। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০–২০০০*, কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ৮৫।

১২। Dipesh Chakrabarty, *Rethinking Working-Class History, Bengal 1890 to 1940*, New Jersey, Princeton University Press, 1989, p. 17.

১৩। *Ibid.,* pp. 17-18.

১৪। Amiya Kumar Bagchi, Capital & Labour Redefined, India and the Third World, New Delhi, Tulika Books, 2002, pp. 156-157. এখানে অমিয় কুমার বাগচী শিল্প নগরী কলকাতা ও তার বাণিজ্যিক অগ্রগতির বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন যেখানে জলপথে আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় বাণিজ্যে বিভিন্নপ্রকার কাঁচামাল ও শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী গুলির সরবরাহ হতে দেখা গেছে। আবার দীপেশ চক্রবর্তী পাটকে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যা উপকূলীয় বাণিজ্যে পাটের তৈরি শিল্পজাত দ্রব্যগুলির চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। Dipesh Chakrabarty, *Rethinking Working-Class History, Bengal 1890 to 1940*, New Jersey, Princeton University Press, 1989, pp. 18-20. জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশটাই ইউরোপীয় কোম্পানি এজেন্সিগুলির নিয়ন্ত্রাধীন ছিল। অনিরুদ্ধ বোস এই কোম্পানিগুলির দ্বারা ওয়াটার ফ্রন্ট ওয়ার্কারদের সংযোগের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। Aniruddha Bose, *Class Conflict and Modernization in India, The Raj and the Calcutta Waterfront (1860-1910)*, New York, Routledge, 2018, pp. 44-47,

১৫। Rajat Roy, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939*, Calcutta, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979, p. 78.

১৬। *Ibid.,* p. 84.

১৭। Rozina Visram, *Asians in Britain: 400 Years of History*, London, Pluto Press, 2002, p. 170.

১৮। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924*, Calcutta, publication date not known. Part-1, pp. 4-5.

১৯। ক্ষীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কলিকাতায় চলাফেরা, সেকালে আর একালে*, কল্পন, কোলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২০।

২০। G. Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870-1945*, New Delhi, Oxford University Press, 2012, pp. 96-98.

২১। *Ibid.,* pp. 1-2.

২২। Rana P. Behal, and Marcel Van der Linden (edited), *India's Labouring Poor, Historical Studies, c.1600-c.2000,* Ravi Ahuja, *Mobility and Containment: The Voyages of South Asian Seamen, c.1900-1960,* New Delhi, Cambridge University Press, 2007, pp. 113-114. G. Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870-1945*, New Delhi, Oxford University Press, 2012, p. 178.

২৩। Nilmani Mukherjee, *The Port of Calcutta, A Short History,* Calcutta, The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968, p. 53.

২৪। *Ibid.,* p. 53.

২৫। *Ibid.,* p. 54.

২৬। Barun De, *'The History of Kolkata Port and The Hooghly River and its Future', Kolkata Port Trust Lecture*, Kolkata, 2005.

বরুণ দে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৩৫ তম বার্ষিক অধিবেশনে কলকাতা পোর্টের ইতিহাস নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এখানে বক্তৃতা রাখার সময় হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে কলকাতা শহর এবং কলকাতা বন্দর গড়ে ওঠার প্রাক্ পর্ব থেকে নিয়ে ঔপনিবেশিক এবং সঙ্গে স্বাধীনোত্তর সময়কাল পর্যন্ত আলোচনা করছেন। কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলার সাথে বন্দর পরিকাঠামো কেমন ছিল তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে কলকাতা শহরের গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলিও ব্যক্ত করেছেন। উক্ত ভাষণটি http://kolkataporttrust.gov.in/kopt_lecture2005.pdf এই ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

২৭। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০–২০০০*, কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ৫১।

২৮। *তদেব*, পৃ. ২২।

২৯। *তদেব*, পৃ. ২৪।

৩০। Suchetana Chattopadhyay, *An Early Communist, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913 – 1929*, New Delhi, Tulika Books, 2011, pp. 54-55.

৩১। *Ibid.,* p. 56.

৩২। G. Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870 – 1945*, New Delhi, Oxford University Press, 2012, p. 28.

৩৩। *Ibid.,* pp. 29-30.

৩৪। *Ibid.,* p. 114.

৩৫। *Ibid.,* p. 73.

৩৬। Laura Tabili, *"We Ask for British Justice", Workers and racial difference in late imperial Britain,* New York, Cornell University Press, 1994, p. 30.

৩৭। Rana P. Behal, and Marcel Van der Linden (edited), *India's Labouring Poor, Historical Studies, c.1600-c.2000,* Ravi Ahuja*, Mobility and Containment: The Voyages of South Asian Seamen, c.1900-1960,* New Delhi, Cambridge University Press, 2007, pp. 113-114.

৩৮। Vivek Bald, *Bengali Harlem, and the Lost Histories of South Asian America,* U.S.A., Harvard University Press, 2013, p. 98.

৩৯। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, publication date not known. Part-1, p. 1.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক স্বার্থে সীমেন্স ইউনিয়নের গঠন প্রক্রিয়া ও তার কার্যাবলী

১.১. ভূমিকা:

প্রথম অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার নাবিকরা সংগঠিত শ্রমিক হিসাবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা আলোচিত হয়েছে কিন্তু এই সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি একমাত্র সীমেন্স ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে সম্ভবপর হয়েছিল। তবে ইউনিয়ন গঠনের বিষয়টি কেবলমাত্র নাবিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল না ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিশক্তি এবং দেশীয় মুনাফাখোর দালালদের শোষণের বিরুদ্ধে রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, চটকল, খনি, চা-বাগিচা, বন্দর, জাহাজ এবং বস্ত্র ইত্যাদি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ একত্রিত হয়ে ইউনিয়ন গঠন করেছিল। ইউনিয়নগুলি গঠনতন্ত্রে নিজস্ব নীতি নিয়ে সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তির মধ্যদিয়ে কাজকর্ম করেছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠা শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটানো পর্যন্ত আন্দোলন ও সমাবেশ জারি রেখেছিল এবং সঙ্গে পুঁজিশক্তিকেও অবদমিত করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে বাংলার রেলওয়ে শ্রমিকরাও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (AITUC) বাৎসরিক সভাতে সমাবেত হওয়ার মাধ্যমে তাদের দাবিদাওয়া পেশ করেছিল, বিংশ শতকের চারের দশকে CPI নেতৃবৃন্দ যথা হিরেন মুখার্জী, শান্তা মুখার্জী, বঙ্কিম মুখার্জী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি এবং কার্যকরণের মধ্যদিয়ে সম্মেলনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১] একইভাবে বাংলায় উল্লেখিত ট্রামওয়ে, চটকল, বন্দর, জাহাজ, চা-বাগিচা, বস্ত্রশিল্প শ্রমিক এবং এরই সঙ্গে ঠিকা শ্রমিক ও কলকাতায় হস্তচালিত রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত কর্মী শ্রমিকেরা সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন গঠন করে মালিক শ্রেণী কিংবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। বাংলা কিংবা সমগ্র ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পূর্বে ইউরোপে (আনুমানিক ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় দশকের মধ্যবর্তীকালীন

সময়ে) ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠেছিল।[২] মার্কস ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে প্রধানত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নিরীক্ষণ করেছেন। শ্রমিকদের মধ্যে যে শক্তি অন্তর্নিহিত ছিল তা সংগঠিত হওয়ার মধ্যদিয়ে বহিঃপ্রকাশ পেয়েছিল। বিচ্ছিন্ন শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় রত থাকত কিন্তু তারাও নিজেদের স্বার্থের দিকটি নিয়ে সজাগ হয়ে একত্রিত হওয়ার রসদ খুঁজে পেয়েছিল এবং পুঁজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষমতা অর্জন করেছিল। ট্রেড ইউনিয়নের আশু লক্ষ্য হল পুঁজির বিরুদ্ধে নিত্যদিন আবিরত সংগ্রামের মধ্যে থেকে পুঁজির আক্রমণকে যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ করা। প্রাথমিক পর্বে মজুরি বৃদ্ধি, কাজের সময়সীমা কমিয়ে আনা ছিল শ্রমিকদের প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে তারা ইউনিয়নকে অবলম্বন করে তাদের আন্দোলনকে জোরালো করতে সক্ষম হয়েছিল। পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণতা বজায় রাখার জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছিল এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি। ক্রমান্বয়ে ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ এবং দাসত্বের অবলুপ্তি ঘটানোর মতো অধিকতর প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনের জন্য ইউনিয়নগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ইউনিয়নগুলি উচ্চতর আসনে উন্নীত হয়ে উঠেছিল।[৩] বাংলা সহ সমগ্র ভারতে অবস্থানরত কৃষি শ্রমিক, কারখানায় নিয়োজিত শিল্প শ্রমিক, খনি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে শ্রমিক এমনকি জাহাজে কর্মরত শ্রমিকগণ কেবলমাত্র তাদের "মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ এবং শ্রমিকস্বার্থের পরিপন্থী বিষয়গুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা জাতীয়তাবাদী মনভাবাপন্নও ছিল"। আবার পশ্চিমী দেশগুলিতে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে যে সকল শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার বেশিরভাগই ছিল মজুরি বৃদ্ধি কিংবা শ্রমিকের শ্রমের সময়সীমা কমানোর জন্য কারণ এই দেশগুলি ছিল শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ, কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা শোষিত ঔপনিবেশিক দেশ ছিল না তাই তাদের জাতীয় চেতনা ছিল কল্পনাপ্রসূত। এখানে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিক এবং ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমিকদের শোষণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার মধ্যে অনেকটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যদিও উভয় শ্রমিকদের সম্মুখে পুঁজিবাদীদের শোষণ বিদ্যমান ছিল। কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন ও শোষণের বাড়তি মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল। রাশিয়ায় যে শ্রমিক আন্দোলন ঘটেছিল ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে তার অনেকটা রাজনৈতিক আঁচ পাওয়া গিয়েছিল।[৪]

ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক শ্রেণী ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন গঠনের মধ্যদিয়ে প্রতিবাদকে গভীরভাবে শানিত করেছিল। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ভারতে শিল্প কারখানা এবং উন্নত যানবাহন যোগাযোগ ক্রমবিস্তার লাভের মাধ্যমে শ্রমিকদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রাথমিক পর্বে শ্রমিকদের শিল্পে যোগদানের ব্যাপারটি যতটা সহজতর ছিল, শ্রমিক হিসাবে পরবর্তী দিনগুলিতে তাদের জীবনধারণ করা হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। পরবর্তীকালে শিল্প পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন হলেও সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিরা শিল্পগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মজীবনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার উন্নত পরিষেবা না দিয়ে অতিরিক্ত শোষণ হার বৃদ্ধি করে তাদের লভ্যাংশ বাড়িয়েছিল। এছাড়াও শিল্প ও কারখানাগুলিতে অহরহ শ্রমিক ছাঁটাই, স্বল্প বেতন কাঠামো, কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি, মধ্যসত্বভোগী দালাল শ্রেণীর উদ্ভব যারা শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণের জন্য বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল এসকল ঘটনাগুলির জন্য শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন যাবৎ মালিক ও পুঁজিপতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং, পিকেটিং, হরতাল ও ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছিল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে পদ্ধতিগত এবং প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে বৃহত্তর স্তরে উন্নীত করার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত করে তোলা হয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের সংকটময় অবস্থা দূরীকরণ, বঞ্চিত প্রাপ্য আদায় এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত দাবিদাওয়া পূরণ করার দাবিতে শ্রমিকগণ আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছিল। তবে রাজনৈতিক নেতাগণও আন্দোলনকে সামগ্রিক অংশে বিস্তার ঘটানোর জন্য শ্রমিক, প্রান্তিক কৃষক এবং ক্ষেতমজুর স্তরের মানুষদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। ভারতে যতগুলি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (AITUC) আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিকদের সংগ্রাম সংযোজিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতাকে সন্নিকটস্থ করেছিল। যদিও ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে বি. পি. ওয়াদিয়ার নেতৃত্বে অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে প্রথম ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। তবে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) বিভিন্ন শাখা শ্রমিকদের একছত্রে আনতে সক্ষম হয়েছিল। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন পাঞ্জাবের বিখ্যাত

চরমপন্থী নেতা লালা লাজপৎ রায় এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হন দেওয়ান চমনলাল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এসকল নেতাগণ শ্রমিক সংগঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। AITUC –এর প্রথম অধিবেশনে লালা লাজপৎ রায় সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেছিলেন – 'জাতীয় স্তরে নিজেদের সংগঠিত করার ব্যাপারে ভারতীয় শ্রমিকদের এতটুকু দেরি করা উচিত নয়। তাদের সংগঠিত এবং শিক্ষিত করে তোলাই এদেশের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমাদের শ্রমিকদের সংগঠিত, শ্রেণী-সচেতন করে তুলতেই হবে'। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতির জন্য বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য, পরামর্শ ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য এটা শ্রমিকদের আগামী কিছুদিনের জন্য প্রয়োজন হবে। তিনি আশাবাদী ছিলেন 'শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে থেকেই নিজেদের নেতা খুঁজে পাবেন'। AITUC –এর শ্রমিকদের জন্য যে প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয় সেখানে শুধুমাত্র শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারেই নয়, 'ভারতীয় শ্রমিকগণকে জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয় আপনাদের দেশের নেতারা স্বরাজ দাবি করছেন, আপনারাও নিজেদের নগণ্য ভাববেন না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই। সুতরাং, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য নিজেদের আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে আপনারা পারেন না। আপনারা স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য অংশ। একে উপেক্ষা করলে আপনারা নিজেদের মুক্তি বিপন্ন করবেন'।[৫] AITUC –এর গঠনের পরবর্তীকালে ঠিক ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে অবনতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল এসময় আন্দোলনের প্রভাব কমেছিল এবং AITUC –এর অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যাও কমেছিল। তবে ১৯২৭ সালে শ্রমিকদের আন্দোলন, সমাবেশ ও ধর্মঘটে নতুন করে উদ্দীপনা নিয়ে সামিল হতে দেখা গিয়েছিল। ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সর্বপ্রথম কিছু আইনি নিরাপত্তা পেয়েছিল। এই আইনি নীতিগুলি যথেষ্ট পরিমাণ শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী ছিল, এরই মধ্যে কিছু ইউনিয়নকে অ-নথিবদ্ধ দেখিয়ে বেআইনি ঘোষিত করে তহবিল সংগ্রহ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এমনকি ইউনিয়নগুলি জাতীয়তাবাদী স্বার্থে তাদের তহবিল ব্যবহার করতে পারে এই আশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের তহবিল সংগ্রহে বিভিন্ন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল এবং ইউনিয়নে বহিরাগত সদস্যের সংখ্যা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল।[৬] ১৯২০ সালে শ্রমিক আন্দোলনে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী, পরে

কমিউনিস্ট), মহম্মদ আলী, মহম্মদ সফিক নামক কিছু মুহাজির (খিলাফতপন্থী, যারা ১৯২০ সালে 'হিজরতে' যোগদান করেছিলেন) সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের তাশখন্দে গিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এরপর ভারতের বোম্বাইয়ে এস এ ডাঙ্গে, কলকাতায় মুজফ্ফর আহ্মদ, মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলুর নেতৃত্বে লাহোরে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যেসব কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর সদ্য আবির্ভাব হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়ে (১৯২২ এর শেষে) নলিনী গুপ্ত (প্রাক্তম সন্ত্রাসবাদী) এবং শওকত উসমানিরা (মুহাজির), মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কমিউনিস্ট চিন্তাচেতনাকে বিকশিত করেছিল। বাম জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে কলকাতার 'আত্মশক্তি' ও 'ধুমকেতু', গুন্টুরের 'নবযুগ' যেখানে লেনিন ও রাশিয়া সম্পর্কে নানান লেখালেখি বের হত এবং ১৯২২ সালে বোম্বাইয়েতে ডাঙ্গের সাপ্তাহিক 'সোশালিস্ট' পত্রিকা জনসমক্ষে কমিউনিস্ট চিন্তাচেতনাকে প্রচারিত করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কমিউনিস্ট চিন্তাচেতনা শ্রমিকদের মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। বাংলায় ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ 'লেবার স্বরাজ পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিছুকাল পরেই মুজফ্ফর আহ্মদ এর নতুন নামকরণ করেছিলেন 'শ্রমিক ও কৃষক পার্টি'। নজরুল ইসলাম, কুতুবুদ্দীন আহমেদ এবং স্বরাজি হেমন্ত সরকার (চিত্তরঞ্জন দাশের সচিব ছিলেন) প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ কবি ও মহানুভব গুণীজনেরা সর্বতভাবে মুজফ্ফর আহ্মদকে 'শ্রমিক ও কৃষক পার্টি' স্থাপন করতে উৎসাহিত করেছিলেন। 'লাঙল' এবং 'গণবাণী' বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকা দুটি বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। নজরুলের 'কুলি-মজুর' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কুলিমজুর শ্রমিকদের সম্পর্কের বিষয়গুলি আলোকপাত করা হয়েছে যেখানে বাষ্পীয় ইঞ্জিন মোটর, রেল এবং জাহাজের কথা উল্লেখিত আছে। বাষ্পীয় যানগুলি শ্রমিকদের দ্বারাই নির্মিত এবং তাদের দ্বারাই এগুলি চালিত হয় এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার নির্মাণশৈলী শ্রমিকদের পরিশ্রমেই গড়া, এই বিষয়গুলি সমাজে বিদ্বজনেদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব আকর্ষণ করেছিল। এই বিষয়গুলি সমাজে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একান্ত যোগসূত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, চটকল, পাট, বস্ত্র শিল্পকারখানা, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, বন্দর শিল্প, কৃষক প্রভৃতি শাখা শ্রমিকদের আন্দোলনে কমিউনিস্ট ঘরানা প্রবেশ করেছিল। খড়গপুরের রেলওয়ে শ্রমিক বিক্ষোভকে লিলুয়া এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্রগুলিতে ছড়িয়ে ফেলার প্রচেষ্টা চালানোর পরিকল্পনা

নেওয়া হলে সি. এফ. অ্যান্ডরুজ কমিউনিস্টদের এই কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, যারফলে ডাঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করে বলেছিলেন, 'তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের হিউম হতে চান – ধর্মঘটকে বিপথে চালাতে ও বিভ্রান্ত করতে (চান)। কিন্তু তা হবে না – শ্রমিকরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হবেন'। ট্রেড ইউনিয়নগুলি কমিউনিস্ট ভাবধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে গিয়েছিল।[৭]

এই বিভিন্নপ্রকার শাখা শ্রমিকদের ইউনিয়নের মধ্যে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) বাংলাতে একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কীভাবে নাবিকদের স্বার্থের বিষয়টি সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখা যায় তার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯০৮ সালে এস. মোঘল জানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান নামক নাবিক সংগঠনটি যুদ্ধকালীন সময়ে নানাপ্রকার জটিলতা কাটিয়ে ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian Seamen's Union) রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সীমেন্স ইউনিয়নটি ১৯২০ সালে AITUC –এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দাবিদাওয়াকে অনেকটা জোরালো করেছিল। ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, দেশীয় দালাল এবং পুঁজিশক্তির শোষণ ও শাসনকে প্রতিহত করার জন্য অন্য শাখা শ্রমিকদের ইউনিয়নের ন্যায় আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। কলকাতাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের নিয়ে যে সকল ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল তারই মধ্যে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন ছিল অন্যতম।[৮]

১.২. ঐতিহাসিক চৈতন্যের দ্বারা শ্রমিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার সীমেন্স ইউনিয়নের দিক্ নির্দেশনা:

প্রসিদ্ধ দুইজন ঐতিহাসিক ই. পি. থমসন এবং এরিক হবসবম[৯] শ্রমিক ইতিহাসকে নতুন করে পরিবেশন এবং চৈতন্যের দ্বারা উপস্থাপন করেছেন। থম্পসনের মূল গবেষণা *The Making of the English Working Class*[১০] গ্রন্থটি শ্রমিক ইতিহাসবিদদের জন্য একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে যা সাধারণত সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক ইতিহাস নিয়ে অধ্যয়নের গুরুত্ব সনাক্ত করার ক্ষেত্রে অনেকটা প্রভাবশালী ছিল। ভারতেও একদল ঐতিহাসিক শ্রমিকদের ইতিহাসকে উপযুক্ত তথ্য সম্ভার দ্বারা উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে আলোকিত করেছেন। সনৎ কুমার

বোস[১১] এর মতো প্রবীণ ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতগণ বাংলার শ্রমিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুকোমল সেন[১২], দীপেশ চক্রবর্তী[১৩], নির্বাণ বসু[১৪], রণজিৎ দাশগুপ্ত[১৫], অমিয় কুমার বাগচী[১৬], শুভ বসু[১৭] বাংলার শ্রমিক ইতিহাসের গবেষণা কাজে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এছাড়াও বাংলার নারী শ্রমিকদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা কার্যের দ্বারা শমিতা সেন[১৮] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ঔপনিবেশিক ভারতে নাবিকদের নিয়ে গবেষণা কাজের ক্ষেত্রটি লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় তাঁদের সীমিত সংখ্যক কাজের দিকগুলি যেমন নিয়োগ পদ্ধতি, সামুদ্রিক আইন দ্বারা ভারতীয় নাবিকদের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ, বহির্দেশীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বাংলার শ্রমিক ইতিহাসের গবেষণা কার্যের তালিকা দেখলে দেখা যায় বিংশ শতকে বাংলার নাবিক শ্রমিকদের গবেষণামূলক কাজ নিয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়নি। তবে অনেক ঐতিহাসিক তাঁদের সূক্ষ্ম অধ্যয়নের মাধ্যমে ভারতীয় নাবিকদের জীবনযাত্রাকে আলোকপাত করেছেন এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক ইতিহাসে এই নাবিকদের গতিবিধিকে অবলোকন করেছেন। বাংলার নাবিক সংগঠন গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্বে কলকাতার অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়নের পাশাপাশি সীমেন্স ইউনিয়ন (Seamen's Union) গঠনের বিশেষত্বের কথা রজত রায়[১৯] এবং সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়[২০] গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করেছেন। শুভ বসু লক্ষ্য করেছেন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মতো টানাপোড়েনের সময় কলকাতায় বন্দর অঞ্চলে মুসলিমরা ধর্মীয় ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল।[২১] রজত রায় দেখিয়েছেন বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণী (মারোয়াড়ী) ইউনিয়ন গঠনে কর্মী সম্প্রদায়ভুক্ত জনমানসকে উৎসাহিত করেছিল, যার মধ্যে সীমেন্স ইউনিয়নের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।[২২] সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় অবলোকন করেছেন কলকাতায় বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে স্থানীয় মুসলিমরা শহরের পুরাতন সীমেন্স ইউনিয়নগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলেছিল। এই সীমেন্স ইউনিয়নগুলিতে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাও অন্তর্নিহিত ছিল কারণ ইউনিয়নের সমাবেশ মসজিদের মধ্যেও আলোচিত হতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর আলোচনায় সীমেন্স ইউনিয়ন নতুন করে গঠনে অবদানকারী গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ব্যক্তিদের নাম উল্লেখিত আছে।[২৩] ফারহিন খানাম *Labour*

and union formation in late colonial Calcutta: A case study of the Indian Seamen's Union বিষয় নিয়ে M. Phil. গবেষণা কার্যটির মধ্যদিয়ে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিংশ শতকে নাবিক সংগঠন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া এবং কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক শ্রমিকদের ইতিহাসকে অনুধাবনের পূর্বে ঔপনিবেশিক ভারতে নাবিকদের নিয়ে গবেষণা কাজগুলির প্রতি অবলোকন করতে হবে। "*Indian Shipping: A History of the Sea-Borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times"* গ্রন্থটিতে ১৯১২ সালে কলকাতার একজন তরুণ ইতিহাসবিদ রাধাকুমুদ মুখার্জী (Radha kumud Mookerji) দেখিয়েছেন প্রাচীনকাল থেকে ভারত বহির্দেশীয় সমুদ্র বাণিজ্যিক এবং জাহাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছিল। সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য, সমুদ্রপথে যাত্রা করার বিষয়গুলি গ্রন্থে জায়গা পেলেও জাহাজে নাবিকদের কর্মগত দক্ষতা এবং এখানে এদের কর্মজীবন কীভাবে অতিবাহিত হয়েছিল তা অধরাই রয়ে গেছে। এক দশক আগে একটি ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থা সামুদ্রিক কমিটি ভারতের উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জন্য সামুদ্রিক জাহাজে কর্মসংস্থানের ঐতিহ্যগত গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিল। এর যুক্তিও ছিল যথোপযুক্ত, ব্রিটিশ জাহাজে বিদেশী ক্রুরা ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতার জন্য গঠিত হয়েছিল। তবে ভারতীয় নাবিকরা ব্রিটিশদের অনুগত প্রজা হিসাবে সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদের রক্ষা করেছিল। তাদের কাজকর্মে দেশীয় নাবিকগণ ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার কারণে দেশীয় বাণিজ্য জাহাজে তাদের ঐতিহ্যগত পেশাগুলি আর অনুসরণ করতে পারেনি।[২৪] অ্যারন জাফর (Aaron Jaffer) দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক সময়কালে ব্রিটিশ জাহাজগুলিতে ক্যাপ্টন এবং ক্রুদের মধ্যে বিভিন্ন কারণবশত দ্বন্দ্ব হওয়া ছিল সাধারণ ঘটনা। জাহাজে লস্কররা থাকার ব্যবস্থা, খাবারদাবারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারতো না এবং এরই সাথে ক্যাপ্টেনের শর্ত এবং নিয়মগুলি পালনের জন্য তাদের অবিরত প্রস্তুত থাকতে হত। পূর্বে জাহাজের কোনো ঘটনার কথা নাবিকদের জাহাজে কাজের সময়কালে কর্মীদের মধ্যে আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাহাজী নাবিক শ্রমিক এবং অফিসারদের সাথে মধ্যসমুদ্রে বাদানুবাদে এই প্রকার শ্রমিকদের গুপ্ত হত্যা করে ফেলা হত। এই ঘটনাগুলির জন্য নাবিকরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং আন্দোলনের মধ্যদিয়ে তীব্র বিরোধিতা করেছিল।[২৫]

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতের বন্দরগুলিতে নাবিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, জাহাজে নাবিকদের বেতন, কাজের সময়সীমা প্রভৃতি অসামঞ্জস্য প্রক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আবার অনেক সময় ভারতীয় নাবিকরা কাজের নিয়ম ভঙ্গ করে জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে দেশান্তরিত হয়ে অন্যদেশে নাগরিকত্ব নিয়েছিল। গোপালন বালাচন্দ্রন (Gopalan Balachandran) এই সকল ঘটনাগুলি সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন। জাহাজের কর্মীরা সমস্যাজনিত করণে সময় বিশেষে নাবিকদের একত্রিত করে সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল করেছিল।[২৬] রোজিনা ভিস্রাম (Rozina Visram) এশিয়ার লস্করদের ব্রিটেনে অভিবাসনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার গ্রন্থে ১৬০০ – ১৯৪৭ সময়কালে অভিবাসী এই নাবিকদের জাহাজে কর্মপদ্ধতি এবং তাদের অভিবাসী হওয়ার জীবনপ্রক্রিয়া বর্ণিত আছে।[২৭] বিবেক বাল্‌দ্‌ (Vivek Bald) বাংলার লস্করদের নিউ ইয়র্ক বন্দরে Ship jumping করে জাহাজ থেকে চুক্তি ভঙ্গ করে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এই সকল নাবিকেরা নিজেদের জীবনধারণের জন্য বিভিন্নপ্রকার জীবিকা গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তীকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সেখানে বসতিস্থাপন করেছিল।[২৮] লোরা তাবিলি (Laura Tabili) তাঁর '*We ask for British Justice': Workers and Racial Differences in Late Imperial Britain* গ্রন্থে কৃষ্ণকায় দেশীয় নাবিক অর্থাৎ অ-ইউরোপীয় জাহাজ কর্মীদের পাশাপাশি লস্করেরা সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা যেভাবে জাতিগত এবং বর্ণগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল সেকথা উল্লেখ করেছেন। এই বৈষম্যের জন্য দেশীয় এবং ইউরোপীয় নাবিকদের বেতন, খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তিনি লস্করদের মধ্যে লিঙ্গগত সমস্যা নিয়ে অন্য সকল পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক করেছেন। শিপিং মালিক এবং কর্মকর্তারা জাহাজে লস্কর হিসাবে স্টুয়ার্ড এবং বাবুর্চির কাজে যোগদানের জন্য পুরুষ লস্করদের তুলনায় মহিলা লস্করদের বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল।[২৯] রভি আহুজা (Ravi Ahuja) ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের শেষদিকে উপমহাদেশীয় লস্করদের শ্রমের বাজার ক্ষেত্রর দিকটি পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর স্টিমশিপ শ্রমিক নিয়োগের কাঠামো নিয়ে গবেষণামূলক কাজটি অন্য সকল গবেষক এবং পণ্ডিতগণের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে লস্করগণ আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক শ্রম বাজারে দেশীয় কিছু নাবিকদের অধীনস্ত থেকে কাঠামোগত ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। লস্করেরা আংশিকভাবে এবং অস্থায়ীভাবে কর্মজগতের ক্ষেত্রে

অবকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য তারা পুনর্গঠিত হয়েছিল।[৩০]

১.৩. বাংলাতে অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের পাশাপাশি বৃহত্তর ইউনিয়ন রূপে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের আবির্ভাব:

১৯২০ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে শ্রমের উত্থান ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছিল, যদিও সেগুলির বেশিরভাগের আইনি শংসাপত্র ছিল না, সেকারণে কিছুকালের মধ্যে শংসাপত্রহীন ইউনিয়নগুলিকে নিষিদ্ধ করায় সেগুলির বিলুপ্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে (ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বন্দর নগরী হওয়ায়, এটা ভারতেও বলা যেতে পারে) আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মজবুত বুনিয়াদ এই সময়কালেই হয়েছিল। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আফিসের কেরানি শ্রেণীর কর্মীরা এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় মার্চেন্ট অফিসের কর্মীবৃন্দরা একত্রিত হয়ে এমপ্লয়েজ অ্যাসোসিয়েশন (Employees Association) এবং মিনিস্ট্রিয়াল অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (Ministerial Officers' Association) নামে দুটি ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। মূলত এই সংগঠন দুটি বাবু শ্রেণীর (Whitecollar employees), কর্মচারী দ্বারা গঠিত হয়েছিল। প্রেস এমপ্লয়েজ অ্যাসোসিয়েশন (Press Employees Association) ছিল কিছু সরকারী ও কিছু বৃহৎ বেসরকারী ছাপাখানায় নিযুক্ত কারিগরের ন্যায় শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠন। এরই পাশাপাশি নিম্নস্তরীয় কারুশিল্প এবং কারিগরি শ্রমিকদের সংগঠনও গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল সেগুলি হল সাক্তি সমিতি (Barbers' Association), লোহার সমিতি (Blacksmiths Association), রাজমিস্ত্রি সমিতি (Masons' Association) প্রভৃতি। জাতীয় উড়িয়া লেবার অ্যাসোসিয়েশনের মতো আরও কিছু ভাষাগত কৃষ্টি এবং জাতিগত বর্ণের সংগঠন বা ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। কলকাতায় ব্রিটিশ মালিকানাধীন বৃহৎ শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি (Calcutta Tramways Company) এবং হাওড়াতে লিলুয়া ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ (East India Railway Workshops) গড়ে তোলা হয়েছিল, সেখানে নিযুক্ত শ্রমিকেরা ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (Calcutta Tramways Employees' Union) এবং হাওড়া লেবার ইউনিয়ন তৈরি

করেছিল। কলকাতায় স্থানীয় পাটশিল্প কারখানাগুলিতে যে ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইউনিয়নগুলি হল হাওড়ার ঘুসুরিতে, সেন্ট্রাল জুট মিল ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (Central Jute Mill Workers' Association), বরাহনগরে লেবার অ্যাসোসিয়েশন (Labour Association), এবং কাঁকিনাড়াতে লেবার অ্যাসোসিয়েশন (Labour Association)। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কলকাতাতে গড়ে ওঠা সর্ববৃহৎ ইউনিয়নটি ছিল ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian Seamens' Union)। মুকুন্দলাল সরকারের উদ্যোগে বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (BTUF) গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে S. N. Haldar এবং H. W. B. Moreno সহায়তায় ১৯২২ সালে ইউনিয়নটি AITUC –এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এরফলে বিভিন্ন প্রকার শ্রমিক ইউনিয়নকে একছত্রে এনে শ্রমিকদের আশু চাহিদাকে পূরণ করার জন্য শ্রমিক আন্দোলনকে জোরালো করা হয়েছিল।[৩১]

ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই বাংলা বিশেষ মর্যাদা পেতে সক্ষম হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত। যদিও বাংলা ১৯০৫ সালে বিভাজিত হয়েছিল এবং ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে বাংলার কলকাতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কার্যকলাপ, বিপ্লবীদের তৎপরতা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যার ফলে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী স্থানান্তরটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশরা এই বিষয়গুলি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এবং বাংলার গৌরবকে খর্ব করার জন্য বিভিন্নপ্রকার নীতি গ্রহণ করেছিল। এরফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতি ও বর্ণগত ভেদাভেদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি বাংলাতে প্রকটভাবে দেখা দিতে শুরু করেছিল। এসত্বেও বাংলার মানুষের চিন্তাশীলতা, সুসিদ্ধান্তমূলক ভাবনাকে ভারতীয় স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, কবি ও সমাজতত্ত্ববিদেরা অভিবাদন জানিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলের বাংলা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বক্তব্যটি হল – 'What Bengal thinks today India thinks tomorrow', বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলায় যে স্বদেশী আন্দোলন দেখা গিয়েছিল তার প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পড়েছিল। ১৯০৫ সালে কলকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গভঙ্গ রোধ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রকার ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জনের আবেদন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কোমারভ এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ

করে মন্তব্য করেছিলেন, 'বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সদ্যোজাত ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবির পিছনে জনগণকে সমবেত করেছিল। জাতীয় আহ্বানের রূপ নিয়ে বস্তুতপক্ষে ভারতীয় বুর্জোয়া বিকাশের দাবিকেই জনগণ সমর্থন দিয়েছিল'। সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন, শোষণ এবং মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর সামাজিক অবক্ষয় ঘোচাতে বাংলার প্রথম সারির নেতা থেকে নিয়ে নিম্নস্তরের সাধারণ জনগণ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিশক্তির বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচার, বিভিন্ন শিল্প কারখানার মালিক এবং দেশীয় দালালদের শোষণের বিষয়গুলি বিভিন্ন সভা সমাবেশ, মিছিল, মিটিংয়ে তাঁদের বক্তৃতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে নিয়ে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যকালীন সময়ে বাংলাতে পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চা-বাগিচা শিল্প, চটকল, রেলওয়ে, ট্রামওয়ের মতো শিল্পগুলি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে উন্নতিসাধিত হয়েছিল ফলত তার পাশাপাশি এখানে শ্রমিক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলার এই সকল শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্যের জন্য এরা সংগঠিত হয়ে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বিশেষ সুযোগ লাভ করেছিল।[৩২]

বাংলার প্রধান দুটি শিল্প যেমন চটশিল্প এবং কয়লাখনি শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতকের আটের দশকে বাংলাতে মাত্র ১৯ টি চটকল ছিল সেখানে মাত্র ২০ বছরের ব্যবধানে (১৯০৩ সালে) চটকলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৬। স্টিম ইঞ্জিন চালিত কারখানার সঙ্গে চটশিল্প, রেলওয়ে এবং জাহাজ পরিবহনের উন্নতি ঘটায় কয়লা শিল্পেরও আশানুরূপ উন্নতি ঘটেছিল। যেখানে ১৮৮৩ সালে ৯,৩০,০০০ টন কয়লা উৎপাদন হয়েছিল বিংশ শতকের ঠিক প্রথমেই কয়লার উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৬৫,০০,০০০ টনের মতো। ১৮৮০ সালে বাংলাতে রেলপথ যেখানে ১৪০৫ মাইল বিস্তৃত ছিল ১৯০৪ সালে এই পথ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৭৮ মাইল। এই শিল্পগুলির উন্নতির জন্য কলকাতা শহর ভারতের বৃহত্তম শহরের তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং ১৯১১ সালের সেন্সাসে কলকাতার জনসংখ্যা দশ লক্ষ অতিক্রান্ত হয়েছিল।[৩৩] প্রথম অধ্যায়ে কলকাতার শিল্পনগরী হিসাবে গড়ে ওঠার কথা এবং কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে হুগলী নদীর দুই তীরে শিল্পগুলি গড়ে উঠতে কলকাতা বন্দর কতখানি ভূমিকা রেখেছিল তা বর্ণিত করা হয়েছে। জ্বালানি হিসাবে স্টিম ইঞ্জিন চালিত পণ্যবাহী জাহাজগুলি সমুদ্রপথে আনাগোনার জন্য প্রচুর পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন পড়ত। এইজন্য অন্য

সকল শিল্পের পাশাপাশি খনি শিল্পেরও উন্নতিসাধন হতে দেখা গিয়েছিল, যেখানেও শ্রমিকের যোগান অব্যাহত ছিল। কলকাতা শিল্প শহর এবং বাণিজ্যিক নগরী হওয়ার দরুন বাংলার কাঁচা পাটের বিদেশি বাজারগুলিতে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকের পূর্বে মূলত স্কটল্যান্ডের ডান্ডি বন্দরের মাধ্যমে পাটশিল্পের একচেটিয়া বাণিজ্য চলত। ১৮৮০ –এর দশকের পরে ইউরোপে বানিজ্যিক শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কলকাতা পাটশিল্পে উন্নতিলাভ করায় স্কটল্যান্ডের ডান্ডির বন্দর শিল্প নগর প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে ইতালি এবং ফ্রান্সে পাটজাত শিল্পদ্রব্য ব্রিটেন থেকে রপ্তানির কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই, তবে জার্মানিতে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮৭৮ সালে রপ্তানির মাত্র ১.৩ শতাংশ। ১৮৮০ এবং ১৮৯০ –এর দশকে ডান্ডি শিল্প নির্মাতারা তাদের গড়ে তোলা মহাদেশীয় বাজারগুলি থেকে ক্রমশ নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম sea-board বরাবর তাদের বিস্তৃত রপ্তানি কেন্দ্রগুলি কলকাতা শিল্পের কাছে হারিয়েছিল। কলকাতার বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার তীব্রতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ডান্ডিকে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে এতটা করুণ অবস্থায় ফেলেছিল যে তারা কার্পেটের সূক্ষ্ম পণ্যগুলিতে বিশেষীকরণের জন্য মনোনিবেশ করেছিল এবং এর পাশাপাশি চটের মতো লাভজনক পণ্যের বাজার ছেড়ে দিয়েছিল। এরফলে স্কটল্যান্ডের ডান্ডিতে বেকারত্ব তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ডান্ডির শিল্প বাণিজ্যে অবনমন এবং কলকাতায় শিল্প বাণিজ্যের বিকাশের জন্য শ্রমিকদের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে কর্মদ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল।[৩৪] কলকাতার শিল্পকারখানাগুলিতে কর্মক্ষেত্র তৈরির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এটা বাস্তবসম্মত। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা তাদের নিজেদের সুবিধার্থে সমগ্র ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। তাঁরা চেম্বার অফ কমার্স (Chamber of Commerce) গঠন করেছিল যেখানে খুব কম ভারতীয়দেরই নিযুক্ত করা হত। পাটের ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রাধীন ছিল এবং ব্যবসায়ীরা সমিতিতে সংগঠিত ছিল যাদের সাধারণ বাণিজ্য বেঙ্গল চেম্বারস অফ কমার্স (Bengal Chamber of Commerce) -এর দ্বারা দেখাশোনা করা হত। চেম্বারস অফ কমার্স এবং ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনগুলি অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা দূর করার জন্য বিভিন্নপ্রকার উপায় গ্রহণ করেছিল, ইউরোপীয় বণিক এবং ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সমঝোতা এবং পারস্পরিকভাবে

সহবস্থানে একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন (IJMA) সাধারণত পাট ব্যবসা এবং পাট শিল্প উভয়ের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা সমষ্টিগতভাবে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখার জন্য নিজেদের প্রতিমুহূর্ত প্রস্তুত রাখত। ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলের শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা নতুন প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম ছিল এবং বিভিন্ন বাণিজ্য পথগুলি নিজেদের করায়ত্তে রেখেছিল যার জন্য সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলে প্রধানত ইউরোপীয়দের কোনো প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না। কেবলমাত্র উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দেশীয় ব্যবসায়ীরা দেখাশোনা করত, বোম্বেতে কিছু জাহাজ ভারতীয় বা অন্যান্য এশীয়দের মালিকানাধীন ছিল। আফিম, চা, পাট এবং পরে কয়লার সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা সহ বেশিরভাগ বাহ্যিক বাণিজ্য ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। পশ্চিম ভারতে তুলা, সুতা এবং আফিমের বাণিজ্য অবশ্য ভারতের হাতেই বহাল ছিল।[৩৫] কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন বেষ্টিত বাংলায় শ্রমিকদের উপর সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য, দেশীয় এবং বিদেশী পুঁজি দ্বারা শোষণ বাংলার শ্রমিকদের সংগঠিত করতে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। জুট মিল ও স্টিমার পরিবহন ব্যবসায় কর্মরত কেরানি ও কুলিদের ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষণের ফলে কী করুণ পরিণতি হয়েছিল তা ত্রিপুরার ইসমাইল ইমানুদ্দিন ঢাকার নারায়ণগঞ্জ পাট কেন্দ্রে তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে তাদেরকে ধর্মঘট করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৩৬] খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার বিভিন্নপ্রকার কলকারখানা, সুতাকল ও পাটকলের মুসলিম শ্রমিকদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। খিলাফত নেতাগনদেরও অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হতে দেখা গিয়েছিল। কুতুবুদ্দিন আহমেদ, আকরম খান, মনিরুজ্জমান প্রমুখ মুসলিম নেতাগণ সেসময় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০-২২ সময়কালে কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানকারী নেতাদের যে তালিকা সরকারী গোয়েন্দা অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে সেখানে তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৬৯ জন ছিলেন মুসলিম। এরা খানসামা, সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের, স্টিমারের সারেংদের, হাওড়া ও চাঁপদানি মিল এলাকার শ্রমিকদের এছাড়াও হস্তচালিত ঠেলাগাড়িওয়ালাদেরও সংগঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঐ একই সময়ে বাঙালি খিলাফত নেতাদের দ্বারা অন্যতম সংগঠিত ট্রেড

ইউনিয়নগুলি হল 'আঞ্জুমান-ই-খানসামা', 'দি ইনল্যান্ড স্টিমশিপ এন্ড ফ্ল্যাট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন', বেঙ্গল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি। পূর্ব বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) মধ্যে স্টিমার কোম্পানির শ্রমিকরাও দি ইনল্যান্ড স্টিমশিপ এন্ড ফ্ল্যাট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে ২০ হাজারের মতো সদস্য নিয়ে ধর্মঘটের ডাক দেয়। স্টিমার ধর্মঘট সংগঠিত করার কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন গাড়ওয়ালি স্টিমারের সারেং আব্দুল মজিদ। তিনি গোয়ালন্দ, বরিশাল, খুলনা এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত এই ধর্মঘটের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।[৩৭]

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর হুগলী নদী মোহনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা বন্দর এবং নগর হিসাবে কলকাতার পরিচিতি গড়ে ওঠার সাথে সাথে কলকাতাতে বাণিজ্য এবং শিল্পের অকল্পনীয় বিকাশ ঘটেছিল। কলকাতা বন্দর, শিল্প এবং নগর সভ্যতার বিকাশ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। হুগলী নদী তীরবর্তী কলকাতা বন্দর এবং শিল্পনগরী শহর হিসাবে উত্থানের পেছনে ব্রিটিশদের অনেকখানি অবদান ছিল। কলকাতার বন্দর এবং শিল্প শহর গঠনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের অবদানের পাশাপাশি তাদের স্বার্থের বিষয়টিও জড়িত ছিল, কারণ ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশকে ঠিকয়ে রাখার জন্য এবং সংগৃহীত রসদ জাহাজ মারফৎ জলপথে সরবরাহ করার জন্য এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয় ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পাট, নীল প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন হওয়ার ফলে ব্রিটিশেরা এগুলি সহজে বাণিজ্যিকীকরণের জন্য কলকাতা বন্দর গঠন করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করেছিল। পরবর্তীকালে কলকাতা বন্দরকে আধুনিকীকরণের জন্য ১৮৭০ সালে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠা সামুদ্রিক বাণিজ্যকে অনেকটা তরান্বিত করেছিল। কলকাতা বন্দর, ডক, জেটিগুলিকে সংস্করণ করার ফলে জাহাজ চলাচল পূর্বের তুলনায় উন্মুক্ত এবং অনেকটা সহজতর হয়েছিল।[৩৮] কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের উন্নতিসাধনের জন্য কলকাতা পোর্ট কমিশনাররা ১৫ কোটি টাকা ব্রিটেনের কোনো এক কোম্পানির কাছে ঋণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ব্রিটিশেরা চেয়েছিল যে এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি হোক যাতে করে ব্রিটিশেরা ভারী সুদের হার উপভোগ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যেমন 'একজন দুগ্ধ গাভীর অধিকারী হলে সে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী দুধ খেতে পারে'।[৩৯] ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সুবাদে নানা প্রকার কূটকৌশলতা অবলম্বন করে শোষণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল। ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন সময়ে কলকাতা বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য পরিকল্পিত

নীতি গ্রহণ এই বন্দরের উত্থান এবং বাংলার ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। পূর্ব ভারতে এই কলকাতা বন্দরটি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল মূলত দক্ষিণের কৃষিজ ক্ষেতে গম, ভুট্টা, তামাক, চিনি, তুলা উৎপাদনের মধ্যদিয়ে। এই কৃষিজ দ্রব্যগুলি উৎপাদনের জন্য আফ্রিকা থেকে দাস শ্রমিকদের আমদানি করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান দাস শ্রমিকদের অভিবাসন কৃষিতে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিল, এভাবে সমগ্র আমেরিকা জুড়ে উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তর তৈরি হয়েছিল। ঊনিশ শতকের শেষদিকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সহ মরিশাস এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমেরিকার মতো সাদৃশ্যপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল, এর শ্রম আমদানি হয়েছিল পূর্ব ভারতের কলকাতা বন্দর থেকে এবং এদের বেশিরভাগই ছিল বিহার ও উত্তরপ্রদেশর বাসিন্দা। এটি ছিল পরিকল্পিত কৃষি শ্রম, যাকে কলকাতা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মরিশাসে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে চিনির কারখানা এবং বক্সাইট খনিতে কাজ করত। বাইরে শ্রম যোগান দেওয়ার জন্য অভিবাসী শ্রমিকদের সরবরাহ করার একমাত্র কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব ভারতের কলকাতা বন্দর।[৪০] বাংলাতে কলকাতা বন্দরকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের অনুপ্রবেশের সঙ্গে কলকাতা বন্দর শ্রমিক এবং নাবিক শ্রমিকদের একইভাবে আগমন হতে দেখা গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতায় বিভিন্নপ্রকার শ্রমিক যেমন কারিগরি, শিল্প, ঠিকা, মুটে, রেল, ট্রাম, রিক্সা চালক, বন্দর শ্রমিক এবং জাহাজের নাবিকরা সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। তবে কলকাতায় ইউনিয়নগুলি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল যেখানে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চবর্গীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিবর্গ এবং জাতীয়স্তরের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতারা আগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়াও দেশীয় পুঁজিপতিদের (মাড়োয়ারি) সঙ্গে ইউরোপীয় পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের প্রায়শই বিরোধ দেখা দিত, এইজন্য মাড়োয়ারির মতো দেশীয় ব্যবসাদারেরা কলকাতায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকদের সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়েছিল, এরা প্রয়োজনে ইউনিয়নগুলিকে আর্থিক সহায়তা করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রকৃতপক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যুদ্ধ পূর্বের তুলনায় অনেকটাই জোরালো হয়েছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য ঔপনিবেশিক বাংলার শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আন্দোলন থেকে নিজেদের বিরত

রেখেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি শুরু হলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলিও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি করেছিল।[৪১] কলকাতার ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রায় সবই ১৯১৯-১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাসোসিয়েশন (Indian Telegraph Association), পোস্টাল ক্লাব (Postal Club), এবং ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian Seamen's Union) নামে কেবলমাত্র তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাসোসিয়েশন ইউনিয়নটি ১৯০৭ সালে এবং পোস্টাল ক্লাব ও ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন নামক বাকী ইউনিয়ন দুটি ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪২]

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাতে নাবিক শ্রমিকদের সংগঠিত আকারে আত্মপ্রকাশের মূলে সীমেন্স ইউনিয়নগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঊনবিংশ শতকের অন্তিম লগ্নে এবং বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে ভারতে নাবিকদের সহায়তা এবং স্বার্থের উদ্দেশ্যে বহু ছোট বড়ো ইউনিয়ন গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল যেখানে বাংলাও ব্যতীত ছিল না। নাবিকরা এই ইউনিয়নগুলির ছত্রতলে থেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত দাবি দাওয়াগুলি সহজে ব্যক্ত করতে পেরেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির শাসন ও শোষণ এবং এরই সঙ্গে দেশীয় স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতি, মধ্যসত্বভোগী ঘাট-সারেংদের মতো দালাল শ্রেণীর আবির্ভাব নাবিকদের অসন্তোষের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার কলকাতা বন্দর সহ সমগ্র ভারতবর্ষের বন্দরগুলিতে যেসকল জাহাজ বৈদেশিক বাণিজ্যিক সূত্রে সুমদ্রপথে যাতায়াত করত সেখানে ইউরোপীয় এবং দেশীয় নাবিকদের অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ইউরোপীয় নাবিকরা সাদা চামড়ার হওয়ায় দেশীয় কৃষ্ণ বর্ণের নাবিকদের সাথে মিলেমিশে একত্রিত হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজকর্ম করত না। আচার ব্যবহারে দেশীয় নাবিকরা ইউরোপীয় নাবিকদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। জাহাজে থাকাকালীন সময়ে নাবিকদের বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্য এবং চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নাবিকরা দেশীয় নাবিকদের তুলনায় অনেক উন্নত পরিষেবা পেত। জাহাজের মধ্যে একই কর্মে দেশীয় নাবিকরা ইউরোপীয় নাবিকদের সমতুল্য বেতনের প্রত্যাশা করতে পারত না। এই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির নিপীড়নের সঙ্গে দেশীয় সুবিধাভোগী দালাল এবং ঘাট-সারেংরাও নাবিকদের একাধারে শোষণ চালিয়ে গিয়েছিল। সামুদ্রিক শ্রমবাজারে দালাল এবং অন্যান্য

মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে ঘাট-সারেংদের একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই ঘাট-সারেংদের কলকাতার সীমেন্স ইউনিয়নগুলির দ্বারা চাপ দেওয়া হলে বন্দরের নাবিকরা স্বতন্ত্র কর্মী হিসাবে যে কোনও সারেংয়ের সাথে একত্রিত হতে এবং ক্রু হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ক্রুদের একে অপরের সঙ্গে এবং সারেংদের সাথে আবেগপূর্ণ সম্পর্ক গঠনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা ছিল না। কলকাতার ক্রুরা গ্যাং লিডার বা Fireman –এর নেতৃত্বে যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল সেখান থেকে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখেনি। এই সংগঠনে কলকাতার প্রাক্ বিখ্যাত ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন কমিটির সুপারিশগুলি উৎসাহী বিষয় হয়ে উঠেছিল একটি দ্বিপক্ষীয় কর্মসংস্থান ব্যুরোর জন্য। সম্ভবত ব্রিটিশ জাহাজ মালিক এবং ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের মধ্যে বাদানুবাদের কারণে, ISU একটি রাষ্ট্র পরিচালিত কর্মসংস্থান অফিসের ধারণার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়েছিল, পরিবর্তে জাহাজের মালিক এবং নাবিকদের নিয়ে গঠিত দ্বিপাক্ষিক উপদেষ্টা কমিটির প্রতিনিধিগণ ILO আন্তর্জাতিক অধিবেশনে অভিমত পেশ করেছিল।[৪৩] নাবিকদের জাহাজের কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দালাল এবং ঘাট-সারেংদের কাছে শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। এরা নাবিকদের জাহাজের কাজে নিয়োগের পরিবর্তে মোটা অঙ্কের অর্থ ঘুষ হিসাবে আত্মসাৎ করত। এই সকল ঘটনাগুলি নাবিকদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। নাবিকদের পক্ষে এই সকল ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং ঘাট-সারেংদের বিরুদ্ধে এককভাবে প্রতিবাদ করা সম্ভবপর ছিল না। এই সকল নাবিকেরা সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে ইউনিয়ন গঠনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে ঔপনিবেশিক ভারতে ভাঙন গড়নের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সীমেন্স ইউনিয়ন গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। তবে বাংলাতে বিংশ শতকের প্রথমদিকে নাবিকরা সম্মিলিত হয়ে সফলভাবে সীমেন্স ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, এই সীমেন্স ইউনিয়নটি নাবিকদের স্বার্থে সহযোগিতামূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ নাবিকেরা জাহাজে কর্মসূত্রে বিদেশের বহু বন্দরে প্রবেশের সুযোগে ভিনদেশী নাবিকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিল। এরফলে উপনিবেশ শাসিত বিভিন্ন বিদেশী নাবিকদের সঙ্গে দেশীয় নাবিকদের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদেশী সীমেন্স ইউনিয়নের পদক্ষেপগুলি দেশীয় নাবিকদের নজরে এসেছিল। পরবর্তীকালে দেশীয় নাবিকগণ বাংলার সীমেন্স

ইউনিয়নের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতের সীমেন্স ইউনিয়ন এবং বিদেশী সীমেন্স ইউনিয়নগুলির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল।[৪৪] বাংলাতে গড়ে ওঠা সীমেন্স ইউনিয়নের সদস্যদের বিদেশে শ্রমিক সংগঠনের আলোচনা সভাতে যোগদান করতে দেখা গিয়েছিল। ১৯২০ সালের জুন মাসে ইতালির জেনেভাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের (ILO) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে বাংলার সীমেন্স ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সদস্যবৃন্দ প্রতিনিধিত্ব করেছিল।[৪৫]

১.৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান নামক ইউনিয়নটির বাংলার লস্করদের স্বার্থে ভূমিকা গ্রহণ:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান (Indian Seamen's Anjuman) নামক নাবিক সংগঠনটি বাংলার নাবিকদের স্বার্থে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এই ইউনিয়ন বা সংগঠনটি যুদ্ধ বিপর্যস্ত জাহাজগুলিতে হতাহত নাবিকদের এবং তাদের পরিবারবর্গদের কল্যাণার্থে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগ্রহণ করেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় জাহাজে নাবিক হিসাবে যারা যোগদান করেছিল তারা মূলত বাংলার বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছিল। এই সকল নাবিকদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের। জাহাজে কাজের সঙ্গে যুক্ত নাবিকেরা অনেকেই 'লস্কর' নামে পরিচিত ছিল। প্রথম অধ্যায়ে 'লস্কর' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে জাহাজে কর্মরত বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের নাবিকরা 'লস্কর' হিসাবে পরিচিত ছিল। এই লস্করেরা নাবিক হিসাবে ছিল অপরিসীম সাহসী এবং দুর্ধর্ষ প্রকৃতির, এরা জাহাজের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে অসীম সাহসিকতা নিয়ে বীরত্বের সহিত জাহাজের কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষিত রাজস্ব পণ্যসম্ভার সামগ্রী বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিদেশে রপ্তানি এবং ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণকে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যন্ত্রাংশ এবং পণ্যসম্ভার গুলি জাহাজ মারফৎ সংকটমুক্তভাবে ভারতে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে লস্করদের ভূমিকা ছিল। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করায় ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছিল। এই অধিক পরিমাণ সৈন্যগুলি প্রধানত সহজলভ্য জলপথের মাধ্যমে জাহাজে করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির দ্বারা যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সৈন্য ভর্তি জাহাজগুলিকে সমুদ্রপথে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সংকটমুক্তভাবে ইউরোপের মাটিতে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে

লস্করদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঘটনা ভারতীয় নাবিকদের জন্য একটি পরিবর্তনমূলক সময় ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের স্মৃতিগুলি তরতাজা ছিল ততক্ষণ ভারতীয় ক্রুদের তুচ্ছ কাপুরুষ কুলি হিসাবে নিন্দা করা সহজসাধ্য ছিল না কারণ সেটা ঘটলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হত। যুদ্ধের সময় অনেক ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক নাবিক ব্রিটেনে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিল এবং উপকূলের অবস্থার সাথে পরিচিত হয়েছিল। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী উন্নয়ন রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং চেতনাকে উৎসাহিত করেছিল। ভারতীয় নাবিকদের যুদ্ধ-পরবর্তী ইউনিয়নের নির্ভরশীলতা জরুরি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (ILO) ভারতে শ্রম বিষয়ক অগ্রাধিকার বাড়ানোর জন্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তখন ত্রিপক্ষীয় কাঠামো শ্রমিকদের স্বার্থের একমাত্র অবলম্বন হওয়ায় ঔপনিবেশিক সরকার তার স্থায়িত্ব রক্ষা করার বিষয়ে বাধ্য ছিল। এর অপ্রত্যাশিত সূচনা সত্বেও ILO –এর বিশেষ সামুদ্রিক অধিবেশনগুলি অবশেষে ভারতীয় নাবিকদের ইউনিয়নগুলির জন্য ঔপনিবেশিক প্রভু-ভৃত্য কল্পনা এবং ঔপনিবেশিক আইনে পিতৃতন্ত্রের সংরক্ষিত ধ্যানধারণার জন্ম দিয়েছিল। ভারতীয় ইউনিয়নগুলির প্রথমদিকের দাবিগুলির মধ্যে একটি ছিল মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে নিয়োগ এবং এটি যে অপব্যবহার ও দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে তা দূর করা। ১৯২০ সালে জেনেভাতে ILO –এর প্রথম সামুদ্রিক অধিবেশনে নাবিকদের অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়গুলি গৃহীত হয়েছিল। নাবিক এবং জাহাজের মালিকদের কমিটি দ্বারা হস্তক্ষেপে পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট অফিসের মাধ্যমে জাহাজের কাজে নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও ব্যক্ত করা হয়েছিল। এটির মূল্য যাই হোক না কেন সম্মেলনটির মাধ্যমে ভারতীয় ইউনিয়নগুলির প্রাইভেট শ্রম মধ্যস্থতাকারীদের প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা হতে দেখা গিয়েছিল। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বাণিজ্যিক উদ্যোগে চালিত আর্থিক লাভের জন্য পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট আফিসের সহায়তা নেওয়া হয়েছিল।[৪৬] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অতুলনীয় পরিষেবা সত্ত্বেও ১৯১৪ সালের তুলনায় ১৯১৯ সালে ভারতীয় নাবিকদের অবস্থা খারাপ ছিল। তাদের মৌলিক অবস্থার কোনোরূপ উন্নতি করা হয়নি, যেমন - নিরক্ষরতা, পরোক্ষ নিয়োগ, ঘাট-সারেং প্রকৃতির দালালদের উপর নির্ভরতা একই রকম থেকে গিয়েছিল এবং তাদের মজুরিও বৃদ্ধি পায়নি, কিন্তু ব্রিটিশ নাবিকদের যুদ্ধকালীন মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছিল যেটার পরিমাণ ছিল প্রতি মাসে ৫ পাউন্ড

থেকে ১৪ পাউন্ড পর্যন্ত এবং জাহাজের মালিকেরাও অতিরিক্ত লাভের মুনাফা বাড়িয়েছিল, এটি ভারতীয় জীবনযাত্রার ১০০ শতাংশেরও বেশি ছিল। রয়েল নেভিতে অনেক ব্রিটিশ নাবিকের মধ্যে বহু ভারতীয় মার্চেন্ট মেরিনে নিয়োগ করা হলে দেশীয় ও বিদেশী নাবিকদের মধ্যে শত্রুতা জনিত কারণে অকল্পনীয় মাত্রায় দেশীয় নাবিকরা কর্মচ্যুত হয়েছিল। আনুমানিকভাবে কলকাতাতেই ৫৩,০০০ পদের জন্য ১,৪০,০০০ জন নাবিক উপলব্ধ ছিল, কিন্তু তা সত্বেও সমগ্র ভারতে সমস্ত নাবিকদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ শুন্যতা দেখা দিয়েছিল যেটা অনায়াসেই নাবিকদের নিয়োগের দ্বারা পূরণ করা যেতে পারত। এইভাবে দেশীয় নাবিকদের মধ্যে চরম দারিদ্রতা ছেয়ে এসেছিল এবং এর ফলস্বরূপ ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা তাদের মনে গভীরভাবে আবিষ্ট হয়েছিল। এই একই সময়ে নাবিকদের নিয়োগের হার নিম্নমুখী থাকায় নাবিকদের জাহাজের কাজে নিয়োগকর্তা রূপে ঘাট-সারেংরাও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। যুদ্ধের সময় নাবিকরা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও তারা আত্মবিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গৌরব অর্জন করেছিল। অন্যান্য নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাদের জীবনযাপন ও কাজের অবস্থার স্মৃতিগুলি মনের মধ্যে ভেসে ওঠার ফলে ভারতীয় নাবিকদের অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে নাবিকদের সমাবেশ, ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ তাদের ক্ষোভের বিষয়টি বিকশিত করেছিল। এই আন্দোলনগুলির প্রেক্ষাপটে ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়ন (১৯১৮), এশিয়াটিক সীমেন্স ইউনিয়ন, পর্তুগিজ (গোয়া) সীফারার্স ইউনিয়ন (১৯১৯) এবং কলকাতাতে ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমানটি (১৯০৮ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত) যুদ্ধ পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) রূপে নতুন ভাবে প্রতিস্থাপিত হয়ে নাবিকদের আশু চাহিদা পূরণ করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল।[৪৭]

বাংলায় সীমেন্স ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পূর্বে লস্করদের প্রাপ্য দাবিদাওয়াগুলি সঠিকভাবে পরিপূরণ করা হয়নি, জাহাজের কাজে মারা যাওয়া লস্করের বকেয়া বেতন কলকাতার শিপিং অফিসে আনতে গিয়ে মৃত লস্কর পরিবারের প্রিয়জনদের নানাভাবে অপমানিত করে অফিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই নির্মমতার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) লস্করদের দাবিদাওয়া, প্রাপ্য বেতন এবং পারিশ্রমিকের ন্যায্য মূল্য দেবার জন্য সোচ্চার হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর এই সীমেন্স ইউনিয়নটি অনেকটা প্রভাবশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন

হয়েছিল। কলকাতায় ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের (ISU) দপ্তরে মারা যাওয়া লস্করের পরিবার পরিজন কিংবা মৃত লস্করের বিধবা পত্নী এসে বকেয়া বেতনের অংশ নিয়ে যেত। এইভাবে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নটি বাংলার লস্করদের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) গড়ে ওঠেছিল যা সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজি শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে সর্বভারতীয় রূপে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এই ইউনিয়নে (AITUC) রেলওয়ে শ্রমিক, ট্রামওয়ে শ্রমিক, চটকল শ্রমিক, খনি শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিক, চা-বাগিচা শ্রমিক, বন্দর শ্রমিক এবং সর্বোপরি জাহাজে কর্মরত নাবিক শ্রমিক সংগঠনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সর্বভারতীয় নিরিখে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের এক ছত্রে আনতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের সদস্যগণ চাঁদা তুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে AITUC –তে স্বতস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিল।[৪৮] দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দিক দিয়ে দক্ষতা লাভ, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত, কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, শ্রেণী সংগ্রাম দ্রুততার সঙ্গে সম্প্রসারণ হওয়া ঘটনাবলি সমূহ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ভারতের এই প্রথম কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লিপ্ত থেকে সময় বিশেষে পরিবর্তন ও ভাঙন-গড়নের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ভাঙন-গড়নের কাজ অব্যাহত ছিল।[৪৯] বাংলায় ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নটিও (ISU) ভাঙন-গড়ন, সহযোগী ইউনিয়নের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং ব্যবচ্ছেদ ও সময় বিশেষে নাম পরিবর্তন করে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল যা ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময়কাল পর্যন্ত বিরাজমান ছিল।

১.৫. সীমেন্স ইউনিয়ন গঠনের প্রাথমিক পর্ব

ঔপনিবেশিক ভারতে প্রথম সীমেন্স ইউনিয়নটি ভারতের পশ্চিম উপকূলে (মালাবার উপকূল) গড়ে ওঠার প্রাথমিক প্রক্রিয়া চলেছিল। ইউনিয়ন গঠনের পূর্বে ভারতীয় গোয়ানীজ নাবিকরা কুডস্ (Coods) অথবা *কুরস্ (Kurs)*, -এর মাধ্যমে বোম্বেতে সংগঠিত হয়েছিল এবং আঞ্জুমানের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যৌথভাবে ইউনিয়ন তৈরি ও পরিচালনার কাজ করেছিল। ভারতে সামুদ্রিক ইউনিয়নবাদের উত্থানে থিয়োডর মাজারিলোর (Theodore Mazarello) বিবরণ থেকে জানা যায়

নাবিকেরা ভারতের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিল এবং এরই সঙ্গে অফিসারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত অপমানের জ্বালা যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ ভারতে সর্বপ্রথম গোয়ানিজ নাবিকদের নিয়ে ১৮৯৬ সালে 'গোয়া-পর্তুগিজ, সীমেন্স ক্লাব' (Goa-Portuguese, Seamen's Club) গঠিত হয়েছিল। এটিকে নাবিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম সীমেন্স ইউনিয়ন হিসাবে ধরা হয়। এর সদস্যরা Peninsular and Oriental Navigation Company (P&O) -র সেলুন ক্রু হিসাবে জাহাজে কাজ করত। এরপর বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে বাংলাতে নাবিকদের নিয়ে আরও একটি সীমেন্স ইউনিয়ন গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। যেটা ১৯০৮ সালে কলকাতাতে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান' (Indian Seamen's Anjuman) নামে সর্বপ্রথম একটি স্বীকৃত নাবিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সক্রিয় নাবিকদের নেতৃত্বে এই সংগঠনটি শীঘ্রই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল কারণ এর পদাধিকারীরা সমুদ্রযাত্রার সময় প্রায়শই অনুপস্থিত থাকত। এই কারণে কিছুকাল যাবৎ এই নাবিক সংগঠনটির অবস্থা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল।[৫০]

মাজারিলোর তথ্যে উল্লেখিত যে মহম্মদ ইব্রাহিম সেরাং বোম্বের জাহাজের ডেক এবং ইঞ্জিন রুমের ক্রুদের সংগঠিত করার প্রথম সফলভাবে প্রচেষ্টা করেছিলেন, ১৯১৪ সালে তিনি এই ক্রু নাবিকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার ডাক দিয়েছিলেন যা নাবিকদের একটি ইউনিয়ন গঠনের দিকে পরিচালিত করেছিল। *কাইজার-ই-হিন্দ (Kaiser-e-Hind)* এর মতো P&O mail steamers প্রকৃতির জাহাজগুলিতে ক্রু নাবিকদের দ্বারা উচ্চ বেতনের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল যেটিও ইউনিয়ন গঠনের ইঙ্গিত বহন করেছিল। এই ধর্মঘট সফল হয়েছে বলে মনে করা হয়েছিল, মাজারিলোর মতানুসারে জানা যায় ধর্মঘটের দ্বারা নাবিকদের বেতন দুই থেকে তিনগুন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু এক সময় ইব্রাহিম সেরাং একটি Anchor Line জাহাজে সমুদ্র কাজে ফিরে গেলে শিপিং দালালরা Clan Line এর মতো নিয়োগকর্তাদের বন্দরে ফিরে আসার আজুহাতে বোম্বে ক্রু নাবিকদের ৩০ শতাংশ মজুরি হ্রাস করার জন্য বাধ্য করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নাবিকদের কাজে পরিশ্রম বৃদ্ধি হওয়ায় ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১৯ সালে বোম্বের ও গোয়ার নাবিকেরা গোয়া সীমেন্স ক্লাবকে (Goa Seamen's Club) গোয়ান ইউনিয়ন (Goan Union) হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯১৯ সালে BISN এর একজন প্রাক্তন জাহাজের কেরানি A.M. Mazarello এবং একজন জাহাজে যাত্রী দেখাশোনাকারী I.B. Torcato এই দুইজনের নেতৃত্বে 'এশিয়াটিক সীমেন্স ইউনিয়ন' (ASU) জন্মলাভ করেছিল। Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O) -এর ক্রু নাবিকরা সীমেন্স ক্লাবে সংগঠিত আকারে বিদ্যমান ছিল এবং এরই সঙ্গে ASU এর প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্যান্য গোয়ান যাত্রীবাহী জাহাজের সেলুন ক্রুদের ইউনিয়নের আওতাভুক্ত করা। দাভোলের St. Francis Xavier Church-এ ASU এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এতে সভাপতিত্ব করেন দমনের আর্চবিশপ যিনি ইউনিয়নের পতাকাকে আশীর্বাদ করেন। চার্চের আশীর্বাদ চাওয়ার পদক্ষেপের ফলে সম্ভবত গোয়ান সেলুন ক্রুদের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হতে দেখা গিয়েছিল, এরই মধ্যে নতুন ইউনিয়নগুলির প্রধান প্রবর্তক (জন গোডিনহো, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত টেলিগ্রাফ কেরানি ছিলেন) ASU-কে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সমুদ্রগামী কর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছিল। এই সমুদ্রগামী ক্রু নাবিকরা সিলন, কানারা, কঙ্কন উপকূল, গোয়া, দমন, সুরাট এমনকি ভারতের বাইরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিল।[৫১]

১৯২০ সালে গোয়া পর্তুগিজ সীমেন্স ক্লাবটি পর্তুগিজ সীফারার্স ইউনিয়নে রূপান্তরিত হয়েছিল, যখন ১৯১৪ সালে ইব্রাহিম সেরাংয়ের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নটি 'Indian Seamen's Benevolent Union' হিসাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। ১৯১৪ সালেই তিনটি ইউনিয়নই ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের (ISU) সঙ্গে মিলিত হয়েছিল যা ১৯২৬ সালে ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন হিসাবে একটি ক্ষুদ্র বিভাজনের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছিল।[৫২]

সীমেন্স অ্যাসোসিয়েশনগুলি ছিল বাংলায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রাথমিকভাবে সংগঠন তৈরির উত্তরসূরী হিসাবে নির্দেশিত। একজন সরকারী আমানতকারী জলের মধ্যে থাকা ভাসমান জাহাজে অধিষ্ঠান করা নাবিকদের সাথে পশ্চিমী ট্রেড ইউনিয়নের সরাসরি যোগস্থাপন ঘটিয়েছিল। এখানে লক্ষণীয় যুদ্ধ পরবর্তীকালে তৎপরতার সহিত এর গতি ক্রমশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। তাদের যুদ্ধকালীন দুর্দশা, মৃত নাবিক কর্মীদের বকেয়া প্রাপ্য মজুরী এবং অন্যান্য পাওনা নেওয়ার ক্ষেত্রে অবমাননা হতে দেখা গিয়েছিল, এর ফলস্বরূপ ১৯১৮ সালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়ন

গঠনের দিকে ধাবিত হয়েছিল, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন R. Braunfield নামক একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আইনজীবী। মানফুর খান একজন বোর্ডিং হাউসের মালিক ছিলেন এবং তিনি সারেং এর কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নাবিকদের একত্রিত করণের মাধ্যমে দালালদের বয়কট করে একটি সীমেন্স ইউনিয়ন প্রতিস্থাপন করা, তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন গঠনের মধ্যদিয়ে। কিন্তু এই সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়নি উপকূলীয় সমুদ্রযাত্রার কারণে মানফুর খানের ঘন ঘন অনুপস্থিতির জন্য ইউনিয়নটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়ন এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন দুটি একত্রিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' (ISU) গঠিত হয়েছিল।[৫৩]

১.৫.১. ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian Seamen's Union):

কলকাতায় নাবিক স্বার্থে যে সীমেন্স ইউনিয়নটি গড়ে উঠেছিল তা ১৯০৮ সালের প্রথম দিকে নবাব সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরীর (C.I.E.) সহযোগিতায় এস. মোঘল জানের (S. Moghal Jan, Esq., Foreign Secretary, The Indian Seamen's Union) নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান' নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রথমে এই ইউনিয়নটি জনকল্যাণার্থে ব্যবহৃত হত কালক্রমে এটি সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মরত নাবিকদের স্বার্থে কাজ করতে শুরু করেছিল। এই ইউনিয়নটির প্রধান অফিস কার্যালয় ছিল খিদিরপুর, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডে। ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সদস্য বৃন্দরা হলেন কাশিম আলি, সৈয়দ ওসমান আলি, সৈয়দ মিন্নাত আলি, মুক্তাদির আলি, আব্দুর রহমান, কোরবান আলি, সেখ বাবু, সামাদ খান প্রমুখ। এই 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান' নামক ইউনিয়নটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নাবিকদের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেওয়া এবং তাদের কল্যাণকর বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। এই ইউনিয়নের সদস্যগণের জাহাজে কর্মসূত্রে বহিঃসমুদ্রে পড়ি দেওয়ার কারণে ইউনিয়ন কার্যালয়ে ঘনঘন অনুপস্থিতির জন্য ইউনিয়নটি কিছুকাল যাবৎ সুপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। যুদ্ধকালীন সময়ে নাবিকরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ, বঞ্চনা এবং বৈষম্যের শিকার হলে তারা পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে সুপ্ত সীমেন্স আঞ্জুমান ইউনিয়নটিকে ১৯১৮ সালে পুনর্জাগরিত করে তোলে।[৫৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় নাবিকদের সংকটময় জীবন এবং মহাসমুদ্রে সাবমেরিনের চোরাগোপ্তার মাধ্যমে জাহাজ ধ্বংসের মতো ঘটনা তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল এরফলে জীবনহানিকর ঘটনাও ঘটতে দেখা গিয়েছিল। বাংলার নাবিকরা বিশেষত লস্করেরা যুদ্ধকালীন সময়ে সাহসিকতা নিয়ে মহাসমুদ্রে জাহাজের কর্মে অবিচল থেকেছে। অনেক সময় জাহাজে কর্মসম্পাদনের সময় শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে তাদের প্রাণ বিসর্জনও দিতে হয়েছে। মৃত লস্করদের প্রাপ্য বেতন তার বিধবা পত্নী বা পরিবার পরিজনের হাতে ফিরিয়ে দিতে এবং তাদের উপযুক্ত বেতন কাঠামো ব্যবস্থাপনার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও পুঁজিপতি জাহাজের মালিকপক্ষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯১৮ সালে এই ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান ইউনিয়নটি 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়ন' নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদী শক্তির বৈষম্যমূলক আচরণ ও শোষণ ভারতীয় নাবিকদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই এই ইউনিয়নটির পুনর্জাগরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। নাবিকদের করুণ অবস্থার প্রতি সমব্যথীত হয়ে মিঃ আর. ব্রাউনফিল্ড (Bar-at-law), মিঃ কে. আহমেদ (Bar-at-law), মিঃ মহম্মদ দাউদ (M.A., B.L.), মিঃ এস. মোঘল জান, ডঃ এ. এইচ. জাহির আলা, মিঃ সামুদ খান, মিঃ সৈয়দ মিন্নাত আলি, মিঃ আব্দুল রব, মৌলানা সৈয়দ আব্দুল হাদি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাদের উদ্ধারে এগিয়ে এসেছিল। নাবিকদের দুটি সভা একের পর এক অনুষ্ঠিত হলে ১৯১৮ সালের ৪ ঠা মার্চ ভারতীয় সামুদ্রিক জাহাজে কর্মীদের উপকারী ইউনিয়ন রূপে এই 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলন্ট ইউনিয়ন' গড়ে উঠেছিল। এই ইউনিয়নের মজবুতীর জন্য একটি একজিকিউটিভ কাউন্সিল গড়ে তোলা হয়েছিল যেখানে আর. ব্রাউনফিল্ড (R. Braunfield) সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং মিঃ কে আহমেদ (Bar-at-law), মিঃ আশরফ আলি, (Bar-at-law), ও এ. কে. ফাজলুল হক (M.A., B.L.) প্রমুখেরা সহ-সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন এর পাশাপাশি এই কাউন্সিলের সেক্রেটারি ছিলেন মহম্মদ দাউদ (M.A., B.L.)।[৫৫]

ইউনিয়নের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নাবিকদের জাহাজের কর্মে নিয়োজিত করতে সাহায্য করা। এর পাশাপাশি ইউনিয়ন আরও যে বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছিল সেগুলি হল - নাবিকদের স্বার্থ রক্ষা করা, তাদের সন্তানদের সামুদ্রিক শিক্ষা (Nautical Education) প্রদান করা, দালাল ও ঘাট-সারেংয়ের মধ্যদিয়ে অবৈধভাবে জাহাজের কাজে নিয়োগ পদ্ধতিটি বন্ধ করা এবং জাহাজের শিপিং এজেন্ট ও মাস্টারদের সম্পূর্ণ দক্ষ ক্রু দিয়ে সাহায্য করা। ভারতীয় নাবিকরা অত্যন্ত দক্ষ হওয়ায় তাদের কাজের ক্ষেত্র সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং তারা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৫৬] ভারতীয় নাবিকদের যে প্রয়োজনীয় দাবিদাওয়াগুলি একান্ত অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেগুলি হল -

(১) ইউরোপীয় নাবিকদের বাড়ির সারিতে একই প্রকার ভারতীয় নাবিকদেরও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এরই সঙ্গে ভারতীয় নাবিকদের একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(২) একটি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৩) কলকাতায় প্রস্তাবিত নটিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটিতে এই ইউনিয়নের প্রতিনিধি রাখতে হবে।

(৪) দালাল এবং ঘাট-সারেংদের দ্বারা নাবিকদের নিয়োজিত হওয়ার ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্তি ঘটাতে হবে, এই ব্যবস্থা যা ব্যাপকভাবে অপব্যবহার হয়েছে।

(৫) ভারতীয় নাবিকদের পর্যাপ্ত মজুরি সুনিশ্চিতকরণ করতে হবে।

(৬) ভারতীয় নাবিকদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত পেনশন, বোনাস এবং ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) ভারতীয় নাবিকদের পদোন্নতি, মজুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য দূর করতে হবে।

সীমেন্স ইউনিয়নটি নাবিকদের এই দাবিগুলি সমাবেশে আলোচনা করে যথা সম্ভব বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯২০ সালের পর শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। এরই মধ্যে নাবিকদের স্বার্থে গঠিত 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট

ইউনিয়ন' তার নাম পরিবর্তন করে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯২০ সাল নাগদ ট্রেড ইউনিয়নের যুগপৎ নীতিগুলির উপর তার মোকাবিলা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়ন' –এর নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' (ISU) রাখা হয়েছিল।[৫৭]

১.৫.২. আঞ্জুমান-ই-জাহাজাইন (Anjuman-i-Jahajian):

নাবিকদের হৃত সাধনের উদ্দেশ্যে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' নামক একটি ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল আবার অন্যদিকে অসৎ কিছু সদস্যবৃন্দের অশুভ কর্মকাণ্ডের দ্বারা 'আঞ্জুমান-ই-জাহাজাইন' নামক একটি সীমেন্স ইউনিয়ন গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। এই আঞ্জুমান-ই-জাহাজাইন ইউনিয়নটি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। এই ইউনিয়নটি শেখ সামির (কোকেন এবং আফিম চোরাকারবারি, জাহাজের দালাল এবং কিছু ট্যাক্সি ক্যাবের মালিক) নামে এক ব্যক্তি ১৯২০ সালে গড়ে তুলেছিল। এই ইউনিয়নটির অফিস কার্যালয় ছিল কলকাতার ৩৭ নং কর্পোরেশন স্ট্রীটে। সভাপতি হিসাবে এই ইউনিয়নের কার্যসম্পাদন করতেন শেখ সামির এবং সেক্রেটারি ছিলেন ডঃ এ. এইচ. জাহির আলা যাকে পূর্বে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নে সক্রিয় সদস্য রূপে দেখা গিয়েছিল। মহম্মদ ইয়াসিন (বর্ধমানের একজন খিলাফৎ আন্দোলনকারী), মহম্মদ ইসাক চৌধুরী (জাহাজের দালাল), আব্দুর রহমান (জাহাজের দালাল), আব্দুল মাজিদ (জাহাজের দালাল) এই ইউনিয়নের প্রোমোটার হিসাবে নিযুক্ত ছিল। ইউনিয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) কে দুর্বল করার জন্য বেশি দাদনের লোভ দেখিয়ে কিছু সদস্যকে নিয়ে আঞ্জুমান-ই-জাহাজাইন (Anjuman-i-Jahajian) নামক ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তি ঘটানো। তবে এই ইউনিয়নটি বেশিদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কিছুদিন পর ইউনিয়নটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল।[৫৮]

১.৫.৩. ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian National Seamen's Union):

ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়নটি ১৯২০ সালের ৪ঠা জুলাই আর. ব্রাউন্ডফিল্ডের সভাপতিত্বে কলকাতার 4A, রাধাবাজার লেনে গড়ে উঠেছিল। এই ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন মিঃ এস. মাহাবুব আলি যিনি কলকাতার Kelso House –এর ব্যবসায়ী ছিলেন। বাংলার গুরুত্বপূর্ণ

ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ইউনিয়নটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল। বাবু শচীন্দ্রনাথ মুখার্জী (সাব-এডিটর, Bengalee পত্রিকা, নরমপন্থী চেতনাশীল), পীযুষ কান্তি ঘোষ (Amrita Bazar Patrika –এর কর্মী ছিলেন, চরমপন্থী আন্দোলনকারী), ডঃ এ. সোহরাবর্দী (Barrister-at-Law, নরমপন্থী, Chairman District Board মেদনীপুর), খান বাহাদুর আব্দুস সালিম (অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, Calcutta Police Court) এসকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এই ইউনিয়নে যোগদান করেন। এই ইউনিয়নে জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে যোগদান করেছিলেন মৌলভী হাবিবুল হক (M.A., Vakil, High Court, কলকাতা) যিনি একজন চরমপন্থী আন্দোলনকারী ছিলেন। সহকারী সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন সামাদ খান (শিপিং কন্ট্রাক্টর), সৈয়দ মিন্নাত আলি (খিদিরপুরের ডাক্তার) এবং মানফুর খান (খিদিরপুরের ফায়ারম্যান সেরাং)। ভারতীয় নাবিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়নটি ১৯২০ সালে ১১ই জুলাই ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের সাথে একত্রিত হয়েছিল যা তৎকালীন সময়ে খিদিরপুরের ফায়ারম্যান সেরাং মানফুর খানের দ্বারা সম্ভবপর হয়েছিল। সদস্যরা চাঁদা ও অনুদান দিয়ে ইউনিয়নটির নবরূপ দান করে ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন নামকরণ করেছিল। পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়নটি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের সঙ্গে মিশে গিয়ে সার্বিকভাবে নাবিক স্বার্থে কাজ করেছিল।[৫৯]

১.৫.৪. ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের স্বতঃফূর্তভাবে নিঃস্বার্থ যোগদান:

পূর্ববর্তী ইউনিয়নগুলিতে সক্রিয় সেরাং এবং স্টুয়ার্ড ছাড়াও ISU –তে অন্যান্য পদের ৩০০ থেকে ৪০০ জন পুরুষ সক্রিয় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূত হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলির মতো মেরিটাইম ইউনিয়নগুলিকে (Maritime Union) একটি সরকারী প্রতিবেদনে ‘বাইরের পৃষ্ঠপোষক’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। সক্রিয় নাবিকদের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে কিছু বহিরাগত বুদ্ধিজীবীরা এসকল শ্রমিকদের অসদাচরণ, অসমতা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের দাবিদাওয়া ও আন্দোলনকে ইউনিয়নের মাধ্যমে জোরদার করতে এগিয়ে এসেছিল। এই সকল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে “Bengalee” পত্রিকার সহ-সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকার আর্থিক ব্যবস্থাপক, বাংলার সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত

ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ জ্ঞানী বিদ্যজনেরা ছিলেন। মহম্মদ দাউদ একজন পেশাদার আইনজীবী যিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর এই জীবিকা ছেড়ে ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে যোগদান করেছিলেন। মহম্মদ দাউদ সভাপতিত্বকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসকে ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলেন।[৬০] বাংলার ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) -এর সঙ্গে ইন্টারন্যাশানাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (ITF) সম্পর্কযুক্ত হয়েছিল। ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) লস্করদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে দালাল এবং মধ্যস্থতাকারীরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ইউনিয়নের প্রতিপত্তি কমিয়ে ইউনিয়নকে দুর্বল করার চেষ্টায় রত ছিল।

১.৬. ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian Seamen's Union) এবং এর সাংগাঠনিক কার্যাবলী:

ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন নামক ইউনিয়নটি ১৯০৮ সালে কলকাতার খিদিরপুর ৭ নং ইকবালপুর লেনে প্রথমিকভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই ইউনিয়নটি ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুযায়ী ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে আগস্ট তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছিল। এই ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাটি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) নামে পরিচিত। জাতি, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে জাহাজে, বন্দরে, জলপরিবহন ব্যবস্থায় কর্মরত ১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে যেকোনো শ্রমিক নির্দিষ্ট প্রবেশ ফি জমা দিয়ে এই ইউনিয়নের সদস্য হতে পারত। ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গগণও এই ইউনিয়নের সাম্মানিক সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারত।[৬১]

ইউনিয়ন গঠনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল—

(১) সদস্য শ্রমিকদের সাম্মানিক, সঠিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা এবং উন্নতিসাধান করা।

(২) সদস্যগণের মধ্যে একতা, ভাতৃত্ববোধ ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা।

(৩) শ্রমিকগণের কাজের সময় নির্ধারণ ও যথোপযুক্ত বেতনের জন্য প্রচেষ্টা করা।

(৪) শ্রমিক মালিক সম্পর্কের সুনিয়ন্ত্রণ করা এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটলে আপোষে মিমাংসা করা।

(৫) দুর্ঘটনা জনিত কারণে ওয়ার্কমেনস্ কমপেনসেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

(৬) সদস্য শ্রমিকের চাকুরীহীন অবস্থা, অসুস্থতা ও মৃত্যুকালীন অবস্থায় পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা।

(৭) লক-আউট ও ধর্মঘটের সময় সদস্য শ্রমিকদের সহায়তা প্রদান করা।

(৮) ইউনিয়নে কাজকর্ম করার জন্য যে সকল সদস্যগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন তাদেরকে সাহায্য প্রদান করা।

(৯) চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে সদস্য শ্রমিকগণ আইনি সমস্যায় পড়লে তদেরকে আইনি সাহায্য প্রদান করা।

(১০) ইউনিয়নের কাজ পরিচালনার জন্য ইউনিয়নের নিজস্ব তহবিল গঠন করা।

এই ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নাবিক শ্রমিকদের কাছে ধার্য করা বার্ষিক চাঁদার হার ছিল নিম্নরূপ:-

- মাসিক ২৪ টাকা বেতন ভুক্ত সদস্য ৮ আনা।
- মাসিক ৫০ টাকা বেতন ভুক্ত সদস্য ১ টাকা।
- মাসিক ৫০ টাকার ঊর্ধ্বে বেতন ভুক্ত সদস্য ২ টাকা।

তবে সাম্মানিক সদস্যগণ তাদের ইচ্ছা মত যেকোনো পরিমাণ চাঁদা প্রদান করতে পারত। একজিকিউটিভ কাউন্সিল ইউনিয়নের প্রবেশ ফি নির্ধারণ করত এবং এই প্রবেশ ফি ১০ টাকার অধিক ছিল না। পর পর দুই বৎসর চাঁদা প্রদান না করলে সেই শ্রমিকের সদস্য পদ খারিজ হয়ে যেত। বকেয়া চাঁদা প্রদান করে শ্রমিকেরা পুনরায় সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারত। সদস্য শ্রমিকের নাম এবং সমস্ত বিবরণ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রার বইয়েতে লেখা থাকত এবং এটি অফিস চলাকালীন সমস্ত সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত থাকত।[৬২]

প্রতি বছরই ইউনিয়নে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হত। ১৮ বছর ঊর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিরা উক্ত সাধারণ সভায় নির্দিষ্ট সংখ্যক একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হত। এরা ইউনিয়ন আফিসের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করত। একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে একজন সভাপতি, পাঁচজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন সাংগঠনিক সম্পাদক, ছয়জন ডিপার্টমেন্টাল সম্পাদক, নয়জন ডিপার্টমেন্টাল সহ-সম্পাদক, একজন পাবলিসিটি অফিসার এবং

একজন তহবিল রক্ষক হিসাবে মনোনীত অথবা নির্বাচিত হত। এছাড়াও আরও ৩৫ জন একজিকিউটিভ সদস্য থাকত যারা ইউনিয়নে বিভিন্ন কাজকর্ম দেখাশোনা করত। বিভিন্ন শাখা, ডিপার্টমেন্ট ও সেকসেন হতে সমানুপাতিকভাবে আরও ৩৫ জন একজিকিউটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত অথবা মনোনীত হয়ে ইউনিয়নের কাজকর্ম দেখভাল করত। এককথায় বলা যায় সীমেন্স ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়দায়িত্ব ছিল একজিকিউটিভ কাউন্সিলের উপর। একজিকিউটিভ কাউন্সিলে বিশেষ করণীয় দিকগুলি হল – ইউনিয়নের হিতকারী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপূরণ করা, আয় ও ব্যয়ের সঠিক নিয়ন্ত্রণ করা, ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনবোধে উপবিধি (Bye Laws) সংশোধন করা এবং সভাপতি ও সম্পাদক সহ সাতজন সদস্যের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা। একজিকিউটিভ কাউন্সিল বার্ষিক সাধারণ সভা ও অন্যান্য সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত।[৬৩]

ইউনিয়নের সমস্ত অর্থ একজিকিউটিভ কাউন্সিলের নির্দেশিত ব্যাঙ্কগুলিতে ইউনিয়নের নামে তহবিল রক্ষক ও সাধারণ সম্পাদকের দ্বারা জমা করা হত। টাকা তোলার সময় সভাপতির অনুপস্থিতিতে দুজন সহ-সভাপতি চেকে স্বাক্ষর করতে পারত। তহবিলের হিসাব সদস্যদের নিরীক্ষণ করানোর জন্য প্রতি সোমবার অফিস উন্মুক্ত রাখা হত। বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন রেগুলেশন ১৯২৭ অনুযায়ী প্রতি বছর একজন অভিজ্ঞ অডিটর দ্বারা হিসাব পরীক্ষা করানো হত। এক-পঞ্চমাংশ সদস্য সহ একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিং প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হত। পর পর তিনটি মিটিংয়ে কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যেত।[৬৪]

এই ইউনিয়নের বাৎসরিক সাধারণ সভা প্রতি বছর মে মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হত। উক্ত সভায় বিগত বছরে ইউনিয়নের কার্যের রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের জন্য পেশ করা হত। এছাড়াও পরবর্তী বছরের জন্য ইউনিয়নের অফিসার নির্বাচিত করা হত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এই সভায় আলোচিত হত। ইউনিয়নের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজন বোধে একজিকিউটিভ কাউন্সিল বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করতে পারত। সভাপতি ইউনিয়নের সমস্ত সভায় সভাপতিত্ব করত এবং ইউনিয়ন পরিচালনার কাজকর্ম দেখাশোনা করত। প্রয়োজনবোধে

সাধারণ সম্পাদক একজিকিউটিভ কাউন্সিলের জরুরী সভা আহ্বান করার নির্দেশ দিতে পারত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত না হলে সাধারণ সম্পাদক মিটিং ডাকতে পারত।[৬৫]

এই ইউনিয়নে সহ-সভাপতি, সভাপতি মহাশয়কে সাহায্য করবে এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার কার্য পরিচালনা করবে এটি স্থির হয়েছিল। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তাঁর যাবতীয় কাজকর্মের জন্য একজিকিউটিভ কাউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। তিনি সমস্ত সভার কার্যবিবরণী লিখিত রাখবেন এবং সমস্ত সভা আহ্বান করবেন। ইউনিয়নের অফিস পরিচালনা করবেন ও ইউনিয়নের সমস্ত কাজে তদারকি করবেন। এছাড়াও ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন। সদস্যদের অভাব অভিযোগ, দাবিদাওয়া ও সমস্যার দিকে নজর রাখবেন এবং তা সমাধানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া ইউনিয়নের খরচের জন্য নগদ ২০০ টাকা কাছে রাখতে পারবেন।[৬৬]

এই ইউনিয়নে ঠিক হয়েছিল সাংগঠনিক সম্পাদক (অরগানাজিং সেক্রেটারি) সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় ও ইউনিয়নের বিভিন্ন শাখায় গিয়ে সংগঠনকে জোরদার করার প্রচেষ্টা করবেন। ডিপার্টমেন্টাল ও সহ-সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশমত ইউনিয়নের কাজকর্ম করবেন। তহবিল রক্ষক ইউনিয়নের সমস্ত কার্যের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। তিনি নিখুঁতভাবে সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন ও ইউনিয়নের কাজের জন্য নগদ ২০০ টাকা কাছে রাখতে পারবেন। সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে একজিকিউটিভ কাউন্সিল ইউনিয়নের নিয়ম পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধন করতে পারতেন। বিশেষ সাধারণ সভায় (এক্সট্রা অর্ডিন্যারী জেনারেল মিটিং) তিন-চতুর্থাংশ ভোটের দ্বারা ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করতে পারতেন। বিশেষ সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে এই ইউনিয়ন দেশ বা বিদেশের ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন অথবা অন্যকোনো শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন। সাধারণ সভায় তিন-চতুর্থাংশ ভোট ব্যতীত এই ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটানো যেত না এবং এই সাধারণ সভায় মোট সাধারণ সদস্যের সাত-অষ্টমাংশের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল। এই ইউনিয়নে যেসব স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লিখিত আছে তাঁরা হলেন - (১) মাহবুবুল হক, (২) এস. মোঘল জান, (৩) মহম্মদ হোসেন, (৪) আফতাব আলি, (৫) এ. কে. এম. আব্দুর রহিম, (৬)

এইচ. এ. চৌধুরী এবং (৭) জে. এ. কোলাস্কো।[৬৭] ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের সাংগাঠনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য জনসমাবেশ, নিয়মিত মিটিং এবং প্রচার কার্যগুলি একান্ত জরুরী বিষয় ছিল। জনসমাবেশ ঘটানো ও এই ইউনিয়নকে প্রভাবশালী করার জন্য বাংলাতে অন্যসকল সীমেন্স ইউনিয়নগুলিকে একত্রিত হয়ে সমাবেশ করতে দেখা গিয়েছিল।

ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian Seamen's Union), বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন (Bengal Mariners' Union), এবং ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার্স ইউনিয়ন (Indian Quartermasters' Union) এই সকল ইউনিয়নগুলির মিলিত সম্মেলনের চতুর্থতম তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন পরিচালনার দায়িত্বে সহ-সভাপতি হিসাবে মিঃ ফজলুল রহমান (B.L.) অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই অধিবেশনে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েম্যান এবং ওয়াটারসাইড ওয়ার্কার্সের অন্তর্ভুক্ত কর্মশালার কর্মীদের দীর্ঘস্থায়ী অভিযোগগুলি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে তা দ্রুত নিবারণ করার সম্ভাব্য উপায় বের করেছিলেন। সভায় ভারতীয় সংবিধিবদ্ধ কমিশনের রিপোর্ট, বিশেষ করে আইনসভায় শ্রমের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্বের শোচনীয় প্রত্যাখ্যান এবং শুধুমাত্র অর্পিত স্বার্থের শ্রেণীতে ভোটাধিকারের সীমাবদ্ধতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছিল। এছাড়াও আসন্ন গোল টেবিল বৈঠকে (Round Table Confarence) আলোচনা করা হয়েছিল পূর্ব প্রেরিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং এর ফলস্বরূপ ভারতীয় নাবিকদের সাধারণ সংস্থার মধ্যে বেকারদের তালিকায় উদ্বেগজনক বৃদ্ধি। সভায় শেষ পর্যন্ত এই সামুদ্রিক কর্মীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং কর্মীদের সংগঠনগুলিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে স্থির করা হয় যেগুলি এই সম্মেলনের আগে বিবেচনার জন্য রাখা হয়। এগুলি হল – (১) ভারতীয় নাবিক, অভ্যন্তরীণ জলপথের কর্মী, ওয়াটারসাইড শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তি এবং বিভিন্ন কর্মশালার কর্মীরা এর সাথে যুক্ত ছিল। (২) স্ট্যাটিউটরি কমিশনের সুপারিশ এবং চতুর্থ রোমিং আরটি কনফারেন্স, (৩) বিধানসভা এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ভারতীয় নাবিকদের প্রতিনিধিত্ব এবং (৪) অন্যান্য বিষয়। এছাড়া সম্মেলন গঠনের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সম্মেলনের সভাপতি এবং সেক্রেটারিকে বাদ দিয়ে প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ১০ জন প্রতিনিধিকে যৌথভাবে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। মিঃ আফতাব আলি 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' এর সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি ও

সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনটি কলকাতার খিদিরপুরে ৩ নং ডেন্ট মিশন রোডে ১৯৩০ সালের সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।[৬৮]

১.৭. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের গুরুত্বলাভ:

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর ব্রিটেনের বিভিন্ন নজরদারি সংস্থাগুলি ভারতীয় নাবিক এবং তাদের দ্বারা গঠিত ইউনিয়নগুলির উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি বহাল রেখেছিল। তবে এই ইউনিয়নগুলি সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি মুক্ত ছিল, এগুলির কার্যকলাপ নাবিকগণের স্বার্থে এবং মালিক পক্ষের নিকট হতে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব সীমান্তের সিলেটি নাবিকরা ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ওয়েলফেয়ার লীগ (Indian Seamen's Welfare League) গড়ে তুলেছিল, কারণ তারা ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে চায়নি। তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে পুলিশের মনোযোগ এড়িয়ে গিয়ে একপেশে জাহাজের মালিকদের কাছ থেকে স্বীকৃতি নিতে চেয়েছিল। এই লীগের সভাপতি হিসাবে মনিয়া মিঞা ওরফে সৈয়দ আব্দুল মজিদ কুরেশী এবং সেক্রেটারি হিসাবে আয়ুব আলি মাস্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে, এই নতুন সংগঠনটি ইন্ডিয়ান লীগের অনুসারী ভারতীয় নাবিকদের অনুপ্রবেশকে রোধ করার জন্য পূর্ব লন্ডনে একটি শাখা অফিস স্থাপন করেছিল। ইন্ডিয়ান লীগ ছিল একটি প্রবাসী দক্ষিণ এশীয় রাজনৈতিক সংগঠন যা ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মৌখিক ভাবে প্রমাণ সাপেক্ষ 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ওয়েলফেয়ার লীগ' যুক্তরাজ্যের প্রথম 'সিলেটি পিপলস প্ল্যাটফর্ম ছিল'। ক্রিশ্চিয়ান স্ট্রিটে লীগের কার্যালয় ছিল এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নাবিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থ দেখাশোনা করা। এর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ভারতীয় নাবিকদের আত্মীয়দের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা ও তাদের সমস্যাসংকুল দুর্ভোগ পরিস্থিতির দিকটির প্রতি যত্নবান হওয়া। ১৯৪৩ সালে আয়ুব আলি মাস্টারের কাছ থেকে Clan Line এর কাছে দেওয়া নিম্নলিখিত চিঠিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'লস্কর' এবং তাদের নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল। এতে বলা হয়েছে, লন্ডনে নাবিকদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং বিনোদনের জন্য সম্প্রতি 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ওয়েলফেয়ার লীগ' নামে একটি ক্লাবের আয়োজন করা হয়েছে। এই ক্লাবের

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল ভারতীয় নাবিক এবং তাদের বন্ধুদের জন্য সম্পূর্ণরূপে সামাজিক সুবিধা প্রদান করা।[৬৯]

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্রিটিশ ভারত থেকে আভিবাসীদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য মাঝে মধ্যে সংগঠনগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। মিডল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের উত্তরে ভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে উদ্ভুত মুসলিম এবং শিখ উভয় সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবীদের দ্বারা আধিপত্য কায়েম রেখেছিল। আফতাব আলি তিনটি মহাদেশ জুড়ে সিলেটি ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকতন্ত্রবাদ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ লাভের পর তিনি কলকাতা ভিত্তিক 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' (ISU) –কে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯২০ –এর দশকে নিজে একজন নাবিক হিসাবে কাজ করার পর লস্করদের অপর্যাপ্ত কাজের পরিস্থিতির মূল্যবান অভিজ্ঞতার দিকটি আফতাব আলি দক্ষিণ এশীয় নাবিদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কাজের পরিবেশ তৈরির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আবার ১৯২০ –এর দশকেই তিনি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) –এর সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় নাবিকদের সংঘবদ্ধ করতে আরও কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে ১৯৩০ সালে নিখিল ভারত সীমেন্স ফেডারেশনের (AISF) মূল তালিকাতে বিভিন্ন ইউনিয়নকে একত্রিত করেছিলেন। যেখানে তিনি সভাপতি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে আফতাব আলি বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘকাল তিনি আবিভক্ত বাংলার দুজন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আফতাব আলি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) –এর সহ-সভাপতি হন কিন্তু তিনি ১৯৪১ সালে এই ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।[৭০]

লন্ডন, গ্লাসগো, লিভারপুল, কার্ডিফ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ বন্দরে অর্থনৈতিক দাবির সমর্থনে ধর্মঘট শুরু করায় ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে আফতাব আলির কার্যকলাপ ব্রিটেনের পরিসীমার মধ্যেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ওই বছরের নভেম্বরে, লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া লীগের এক সম্মেলনে লস্কর ক্রুদের প্রতি অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল এবং প্রতিবাদ স্বরূপ Mr. C. C. Poole (MP, সংসদীয় লেবার পার্টির ইন্ডিয়া কমিটির

সেক্রেটারি ছিলেন), স্বরাষ্ট্র সচিব এবং নৌপরিবহন মন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেছিল। ধর্মঘটীরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কিছু ছাড় পেয়ে আফতাব আলির নেতৃত্বে নিখিল ভারত সীমেন্স ফেডারেশন -এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে ওই একই বছরের ডিসেম্বরে ধর্মঘটের নিষ্পত্তি করেছিল। ব্রিটেনের বামপন্থী ধারায় পরিচিত ব্যক্তিগণ ভারতীয় নাবিকদের জঙ্গি কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট আফতাব আলিকে গ্লাসগো ট্রেডস কাউন্সিলের সভায় যোগদানের জন্য কৃষ্ণ মেনন আমন্ত্রণ জানান। গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির B. F. Bradley তাকে ম্যাঞ্চেস্টারে যাওয়ার জন্য যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেখানে তিনি জাহাজের মালিক, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যনির্বাহীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যারা সেখানে অধিবেশনে ছিলেন। নাবিকদের বিষয় নিয়ে আলোচনার পর সুরাত আলি এবং তাহসিল মিঞার সহায়তায় আফতাব আলি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের একটি শাখা স্থাপন করেন।[৭১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, আফতাব আলি ঔপনিবেশিক নাবিকদের সংগঠিত করতে থাকেন কারণ তিনি যুদ্ধের প্রচেষ্টায় তাদের সম্ভাব্য অবদান বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৪০ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে নাবিকদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ব্রিটিশ সরকার কিছু নিয়ম শিথিল করেছিলেন। যেমন লস্করদের আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়, যতক্ষণ না জাহাজের মালিক এবং ভারত সরকার কোনো আপত্তি না জানায়। উইনস্টন চার্চিলের মতে সেই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছিলেন যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম সীমান্ত এবং মতাদর্শের বাইরে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা ছিল। তাই এটি তার সমস্ত সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেছিল। তদানুসারে আফতাব আলি নিখিল ভারত সীমেন্স ফেডারেশন (AISF) -এর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ভারতীয় নাবিকদের উদ্দেশে বলেছিলেন - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষ নিহত এবং আহত হয়েছে। শত্রুর সাবমেরিন থেকে বিপদ মোকাবিলায় তারা খাদ্য ও যুদ্ধসামগ্রী পরিবহন করছে। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এই লড়াইকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল ভারতীয় নাবিকরা। জাহাজ কর্তৃপক্ষ এবং জাহাজ মালিকেরা নাবিকদের সাহসিকতা নিয়ে জাহাজে কাজকর্মের আগ্রহ এবং

উৎসাহ দেখে অভিভূত হয়েছিল। ভারতীয় নাবিকদের দক্ষ কর্মী হিসাবে পরিচয় দেওয়ার ফলে তাদের উপযোগী কর্মদক্ষতা অশুভ ও ফ্যাসিবাদ শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় সর্বস্বীকৃত করেছিল।[৭২]

১৯৪২ সালে, ভারতে ব্রিটিশ সরকার আফতাব আলিকে রয়েল ইন্ডিয়ান রিজার্ভের অনারারি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার নিযুক্ত করেছিলেন। ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধের জন্য তাঁর নিঃশর্ত সমর্থন এবং বিরোধে তার মধ্যস্থতা দক্ষতার পরিচয় বহন করেছিল। লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে, সিলেটিরা ইন্ডিয়া লীগে ব্যাপকভাবে জড়িত ছিল, যার সেক্রেটারি ছিলেন ভেঙ্গালিল কৃষ্ণান কৃষ্ণ মেনন, যিনি দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের অধিবাসী ছিলেন, তিনি ব্রিটেনে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়াশোনা করেছেন। লেবার পার্টির সদস্য হিসাবে এবং অ্যালেন লেনের সাথে পেঙ্গুইন বুকসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সেন্ট প্যানক্রাস ব্যুরোতে কাউন্সিলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তার সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ করা হয়। বিশেষ করে নাবিকদের কেন্দ্র করে বিদেশী ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটেনে প্রথম তাঁর রাজনৈতিক আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। ১৯৩৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন (ব্যবসায়) লন্ডনে থাকাকালীন আফতাব আলি, সুরাত আলি এবং কৃষ্ণ মেননের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। আফতাব আলি সুরাত আলির দ্বারা আয়োজিত ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে তাকে একজন বাঙালি মুসলিম নাবিক বলে অভিযোগ করা হয়। তিনি ১৯৩৫ সাল থেকে ঔপনিবেশিক নাবিক সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন। সুরাত আলির কমিউনিস্ট সংযোগ সম্পর্কে সন্দেহজনক কারণে আফতাব আলি সংক্ষেপে কৃষ্ণ মেননকে সমর্থন করেন। তাসত্ত্বেও আলি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং কৃষ্ণ মেনন শীঘ্রই সিলেটি নাবিকদের মধ্যে সমর্থন হারিয়ে ফেলেন। ফলস্বরূপ আফতাব আলি সুরাত আলির কাছে নিজের সমর্থন পরিবর্তন করেন। ক্যারোলিন অ্যাডামস পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সিলেটি নাবিকদের বৃহত্তর রাজনৈতিক সক্রিয়তার শিকড় ঘরেই রয়েছে, কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রিটিশ ভারতে থাকাকালীন ঔপনিবেশিক বিরোধী এবং ইসলামিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪০ – এর দশকে ব্রিটেনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (INC) এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ (AIML) একইভাবে সক্রিয় ছিল। সৈয়দ আব্দুল মাজিদ কুরেশী এবং আয়ুব আলি মাস্টার, যারা সিলেটি নাবিকদের মধ্যে সামাজিক কাজের প্রচার করেছিলেন তারা ঔপনিবেশিক ও ইসলামী আন্দোলন

সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাদের থেকে দূরে ছিলেন না। ক্রমবর্ধমানভাবে, তারা শুধু ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধেই নয়, কংগ্রেসের উদীয়মান হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধেও সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। একটি বড় উদাহরণ ছিলেন আয়ুব আলি মাস্টার নিজে, তিনি ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যতে মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাতা লিয়াকৎ আলি খান এবং মহম্মদ আলি জিন্নার সাথে মিশে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সৈয়দ আব্দুল মাজিদ কুরেশী প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি কীভাবে সময়ের সাথে সাথে কংগ্রেস থেকে মুসলিম লীগে তাঁর আনুগত্য স্থানান্তরিত করেছিলেন। সৈয়দ আব্দুল কুরেশী উল্লেখ করেছেন যে সিলেটি নাবিকেরা একই সাথে ইন্ডিয়া লীগ, ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস এবং মুসলিম সোশ্যাল ক্লাবের সদস্য হয়ে উঠেছিল।[৭৩]

১.৮. উপসংহার:

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার প্রধান অবলম্বন হিসাবে বহু ইউনিয়নের আবির্ভাব হয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথম দশকে কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাসোসিয়েশন', 'পোস্টাল ক্লাব' এবং 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' নামে তিনটি ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটেছিল। কেবলমাত্র এই তিনটি ইউনিয়নই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে স্বীকৃত ইউনিয়ন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বাংলার ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নটি S. Moghal Jan –এর নেতৃত্বে ১৯০৮ সালে প্রথম 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান' (Indian Seamen's Anjuman) রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তবে এই আঞ্জুমান নামক সীমেন্স ইউনিয়নটি গঠনের কিছুকালের মধ্যেই সক্রিয় নাবিক সদস্যের অনুপস্থিতির ফলে এই সংগঠনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ইউনিয়নটি ভারতীয় নাবিকদের স্বার্থে কল্যাণমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের পর ভেঙে পড়া আঞ্জুমান সীমেন্স ইউনিয়নটি নাবিকদের দ্বারা পুনর্গঠিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়ন' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর বাংলায় বিভিন্ন শিল্পের শাখা শ্রমিকেরা সংগঠিত হয়েছিল ফলস্বরূপ অসংখ্য ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটেছিল। ১৯২০ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আবার ১৯২০ সালে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নতুন রূপে বিকাশ ঘটতে দেখা গিয়েছিল, এর ফলশ্রুতিতে এই বছরের ডিসেম্বরে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলন্ট ইউনিয়ন' –এর নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন' (ISU)

নামাঙ্কিত হয়েছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর এই সীমেন্স ইউনিয়নটি কলকাতার স্থানীয় বৃহত্তর ইউনিয়ন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯২০ সালে সেখ সামিরের (একজন কোকেন, আফিম চোরাকারবারি, জাহাজের দালাল এবং কিছু ট্যাক্সি ক্যাবের মালিক) নেতৃত্বে 'আঞ্জুমান-ই-জাহাজাইন' সীমেন্স ইউনিয়নটি গড়ে উঠেছিল। এই ইউনিয়নটির গড়ে ওঠার উদ্দেশ্য ছিল ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের (ISU) কার্যকারিতাকে ব্যাহত করা। তবে এই ইউনিয়নটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কিছু দিনের মধ্যে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।[৭৪] কলকাতাতে সীমেন্স ইউনিয়নগুলি মূলত বন্দর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ধর্মীয় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল।

ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নটি নাবিকদের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে বহু নাবিক ও তার পরিবার তাদের প্রাপ্য বেতন, বোনাস এবং যুদ্ধে মারা যাওয়া নাবিকের সঞ্চিত বেতনের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সীমেন্স ইউনিয়ন নাবিকদের প্রাপ্য দাবিদাওয়াগুলি তারা যাতে সহজে ফিরে পায় এর উপায় অনুসন্ধান চালিয়েছিল। ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) –এর বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ ১৯২০ সালে জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিবেশনে (ILO) প্রতিনিধিত্ব করেছিল।[৭৫] ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যবৃন্দগণ হলেন S. Moghal Jan, Mr. R. Braunfield, Mahammad Daud, Mr. K. Ahmed, Mr. Syed Minnat Ali, Dr. A.H. Zahir Ala, Mr. Samad Khan, Aftab Ally প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন পরিচালনার জন্য এবং এর কার্যকারিতা সঠিকভাবে বহাল রাখার জন্য ইউনিয়নের নিয়মানুবর্তিতা, সমাবেশ, সদস্যের উপস্থিতি ও ইউনিয়নের তহবিলের জন্য সদস্য পিছু চাঁদা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ISU –এর সাথে স্থানীয় ইউনিয়নের যোগস্থাপনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরের ইউনিয়নের সঙ্গেও সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছিল। এই ইউনিয়নটি ভাঙন-গড়ন এবং উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময়কাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবিচল ছিল।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১। IB 248/26(1) (1926)

Copy of letter review thought.

Bow Bazar

22 May 45, Calcutta.

Dear Comrade, C.A.150

on 23.05.45

আমাদের রেলওয়ে বাৎসরিক সম্মেলন ভালই হয়েছে। বিভিন্ন শাখা হইতে প্রায় ৮৭ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনেও প্রায় ৬ হাজার শ্রমিক উপস্থিত ছিল। সভাপতি Com. Bankim Mukharji ই ছিলেন। Congress এবং League যারা আসবার কথা ছিল সকলেই এসেছিলেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য Com. Santa Mukharji ও বম্বে থেকে এসেছিলেন আমাদের সম্মেলনে গিয়ে AITUC পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সব প্রস্তাবই সর্বসম্মতি ক্রমে পাশ হয়েছে। সমস্ত প্রস্তাবই বই আকারে ছাপা হয়ে আসছে। কিছু পরিবর্তন ও আছে এবারে। রেলওয়ে শ্রমিকদের বলবেন কমরেডদেরও দিবেন। কলিকাতা আসার কথা ছিল না। আসতে হয়েছে বিরাট একটা Party Rally আজকে হবে এবং সোভিয়েত বিজয় উৎসব হচ্ছে। গান, নাচ ইত্যাদি হয়ে গেল Com. Bhowani Sen, Com. Hiren Mukharji যুব বক্তৃতা দিয়েছেন – প্রায় Hall ভর্তি। কালকে চলে যাচ্ছি। ৩০ তারিখের মধ্যে ঢাকাতে আসবো।

Com. Amaresh Ghosh, red greetings,

15, Court House Streeet, Comradely yours

Communist Party Office, Dacca Dharani Goswami

২। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ – ২০০০,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ২।

৩। *তদেব,* পৃ. ৬।

৪। বিপান চন্দ্র, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭ – ১৯৪৭,* কলকাতা, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোং, ২০১৪, পৃ. ১৬৫।

৫। *তদেব,* পৃ. ১৬৫-১৬৬।

৬। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭,* কলকাতা, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোং, ২০১৩, পৃ. ২০৯।

৭। *তদেব,* পৃ. ২১১-২১৩।

৮। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-I, pp. 1-7.

৯। E.J. Hobsbawm, *Labouring Men, Studies in the History of Labour,* New York, Anchor Books Doubleday & Company, 1967.

১০। E.P. Thompson, *The Making of the English Working Class*, London, Penguin, 1980.

১১। Sanat Kumar Basu, *Capital and Labour in the Tea Industry,* Bombay, All-India Trade Union Congress, 1954.

১২। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ – ২০০০,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।

১৩। Dipesh Chakrabarty, *Rethinking Working-Class History, Bengal 1890 – 1940,* New Jersey, Princeton, 1989.

১৪। Nirban Basu, *The working Class Movement, A study of Jute Mills of Bengal, 1937 – 47,* Calcutta, K P Bagchi & Company, 1994.

১৫। Ranajit Das Gupta, *Labour and Working Class in Eastern India Studies in Colonial history,* Calcutta, K P Bagchi & Company, 1994.

১৬। Amiya Kumar Bagchi, *Capital and Labour Redefined, India and the Third World,* Delhi, Tulika Books, 2002.

১৭। Subho Basu, *Does Class Matter?, Colonial Capital and Workers' Resistance in Bengal (1890 – 1937),* Delhi, Oxford University Press, 2004.

১৮। Samita Sen, *Women and Labour in late Colonial India: The Bengal Jute Industry,* Melbourne, Cambridge University Press, 1999.

১৯। Rajat Ray, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875 – 1939,* Delhi, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979.

২০। Suchetana Chattopadhyay, *An Early Communist, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913 – 1929,* New Delhi, Tulika Books, 2011.

২১। Subho Basu, *Does Class Matter?, Colonial Capital and Workers' Resistance in Bengal (1890 – 1937),* Delhi, Oxford University Press, 2004. pp. 192-193.

২২। Rajat Ray, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875 – 1939,* Delhi, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979. pp. 83-84.

২৩। Suchetana Chattopadhyay, *An Early Communist, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913 – 1929,* New Delhi, Tulika Books, 2011. p. 56.

২৪। G. Balachandran, *Globalizing labour?, Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945*, New Delhi, Oxford University Press, 2012, p-10.

২৫। Aaron Jaffer, *Lascars and Indian Ocean Seafaring 1780-1860, Shipboard Life, Unrest and Mutiny,* Woodbridge, Boydell Press, 2015.

২৬। G. Balachandran, *Globalizing labour?, Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945*, New Delhi, Oxford University Press, 2012.

২৭। Rozina Visram, *Asians in Britain, 400 Years of History*, Virginia, Pluto Press, 2002.

২৮। Vivek Bald, *Bengali Harlem and the Lost Histories of South Asian America,* U.S.A., Harvard University Press, 2013.

২৯। Laura Tabili, *'We Ask for British justice', Workers and Racial Difference in Late-Imperial Britain,* New York, Cornell University Press, 1994.

৩০। Rana, P. Behal, and Marcel Van der Linden (edited), *India's Labouring Poor, Historical Studies, c.1600-c.2000,* Ravi Ahuja, *Mobility and Containment: The Voyages of South Asian Seamen, c.1900-1960,* New Delhi, Foundation Books, 2007.

৩১। Ranajit Das Gupta, *Labour and Working Class in Eastern India Studies in Colonial History,* Calcutta, K P Bagchi & Company, 1994, p. 436.

৩২। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ – ২০০০,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ৮৬।

৩৩। সুকোমল সেন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ২।

৩৪। Dipesh Chakrabarty, *Rethinking Working-Class History, Bengal 1890 – 1940,* New Jersey, Princeton, 1989, p. 31.

৩৫। Rajat Kanta Roy (ed.), *Entrepreneurship and Industry in India, 1800 – 1947*, Amiya Kumar Bagchi, *European and Indian Entrepreneurship in India, 1900-30,* Calcutta, Oxford, 1994, pp. 164,165.

৩৬। চণ্ডী প্রসাদ সরকার, *বাঙালি মুসলমান, ১৮৬৩ – ১৯৪৭*, কলকাতা, মিত্রম, ২০০৭, পৃ. ৯৩।

৩৭। *তদেব,* পৃ. ১০০।

৩৮। Nilmani Mukherjee, *The Port of Calcutta, A Short History,* Calcutta, The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968, p. 53.

৩৯। *The Ananda Bazar Patrika (June, 1, 1923),* Report on News Papers and Periodicals in Bengal for the week ending Saturday, 9th June 1923, R.N.P. (1923)

৪০। Barun De, *'The History of Kolkata Port and Hooghly River and its Future',* Kolkata Port Trust Lecture, Kolkata, 2005, p. 6.

৪১। Rajat Roy, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939,* Calcutta, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979, p. 84.

৪২। *Ibid.,* p. 84.

৪৩। G. Balachandran, *Globalizing labour?, Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945*, New Delhi, 2012, Oxford University Press, p. 82.

৪৪। Goodall, H. (2008). *Port Politics: Indian Seamen, Australian Unions and Indonesian Independence, 1945-47.* Labour History, 94, 43-68.
URL: https://doi.org/10.2307/27516270

৪৫। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Development 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not found, Part-I p. 7.

৪৬। G. Balachandran, *Globalizing labour? Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945*, New Delhi, 2012, Oxford University Press, pp. 78-79.

৪৭। Dixon, Conrad, *'Lascars: The Forgotten Seamen', in Ommer, Rosemary and Panting,* Gerald (eds), The Working Men who got Wet, Newfoundland, 1980, Frank Broeze, *The Muscles of Empire – Indian Seamen and the Raj, 1919-1939,* The Indian Economic and Social History Review Vol. XVIII, No. 1, 1981, pp. 43-67.

৪৮। IB 123/23 (123/1923)

৪৯। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ – ২০০০,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ১৫১।

৫০। G. Balachandran, *Globalizing labour? Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945*, New Delhi, 2012, Oxford University Press, pp. 230.

৫১। *Ibid.,* pp. 230-231.

৫২। *Ibid.,* p. 231.

৫৩। *Ibid.,* p. 231.

৫৪। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Development 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not found, Part-I, P. 1.

৫৫। *Ibid.,* pp. 1-2.

৫৬। *Ibid.,* pp. 2-3.

৫৭। *Ibid.,* p. 8.

৫৮। IB 123/23 (123/1923), Suchetana Chattopadhyay, *An Early Communist, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913-1929*, New Delhi, Tulika Books, 2011, p. 56.

৫৯। IB 123/23 (123/1923)

৬০। G. Balachandran, *Globalizing labour? Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945*, New Delhi, 2012, Oxford University Press, p. 231.

৬১। File No. ADMN- 7068, Bundle No. – 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৬২। File No. ADMN- 7068, Bundle No. – 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৬৩। File No. ADMN- 7068, Bundle No. – 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৬৪। File No. ADMN- 7068, Bundle No. – 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৬৫। File No. ADMN- 7068, Bundle No. – 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৬৬। File No. ADMN- 7068, Bundle No. – 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৬৭। File No. ADMN- 7068, Bundle No. – 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৬৮। File No. ADMN- 7068, Bundle No. – 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৬৯। Hossain, Ashfaque, The World of the Sylheti Seamen in the Age of Empire, from the late eighteenth century to 1947, *Journal of Global History, Vol. 9,* pp. 425-446, doi: 10.1017/S1740022814000199

৭০। *Ibid.,* pp. 425-446.

৭১। *Ibid.,* pp. 425-446.

৭২। *Ibid.,* pp. 425-446.

৭৩। *Ibid.,* pp. 425-446.

৭৪। Rajat Roy, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure groups and Conflict of Interest in Calcutta City Politics, 1875-1937*, Calcutta, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979, p. 84.

৭৫। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-I, p. 7.

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার নাবিকদের বহির্বিশ্বে অভিগমনের মধ্যদিয়ে অভিবাসন লাভ এবং স্বদেশে আগত অভিবাসী নাবিকদের বিদেশে কর্মসম্পাদনের স্মৃতিচারণা

১.১ ভূমিকা:

এই অধ্যায়টিতে মূলত বহির্বিশ্বে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রারত জাহাজগুলিতে শ্রম চাহিদা মেটানোর জন্য জাহাজের কাজে যোগদানরত বাংলার নাবিকদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিগমনের মধ্যদিয়ে অভিবাসী হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ ভারতে অর্থনীতির প্রসার হয়েছিল রপ্তানির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক, আমদানি-রপ্তানি সংস্থা এবং জাহাজ ব্যবসার মধ্যদিয়ে দেশের বহির্বাণিজ্যের মূল অংশটা ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।[১] এভাবে বিদেশী পুঁজির দ্বারা বৃহৎ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রটি দৃঢ়ভাবে পরিচালিত হয়েছিল। তবে স্বল্প বেতন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে পুঁজিকে তরান্বিত করার জন্য জলপথে জাহাজ মারফৎ বহির্দেশীয় বাণিজ্যে সস্তা শ্রম চাহিদা পূরণে দেশীয় নাবিকদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। বিংশ শতকের শেষদিকে বহির্বিশ্ব বাণিজ্যের দ্রুতহারে সম্প্রসারণের ফলে বাংলার দুটি বৃহৎ বাণিজ্যিক বন্দর কলকাতা এবং চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে যাতায়াত করা ভাসমান জাহাজে কর্মের জন্য অগণিত বাংলার নাবিক নিয়োজিত হয়েছিল। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের মধ্য দিয়ে বাংলার বহু নাবিকদের জাহাজে কর্মসূত্রে বিদেশে পাড়ি দিতে দেখা গিয়েছিল। তবে নাবিকদের বহির্বিশ্বে পাড়ি দেওয়ার পাশাপাশি এই ঘটনা প্রক্রিয়াটি একটি বন্দর থেকে আর একটি বন্দরের মধ্যে বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক সংযোগসূত্র স্থাপন করেছিল।[২] সমুদ্রযাত্রার জন্য চুক্তি পত্রে স্বাক্ষরের পূর্বে পাসপোর্ট নেওয়ার জন্য গোয়ানিজ নাবিকদের উপর আরোপিত কঠোর এবং দ্রুত নিয়ম বাতিল করতে ISU এর পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে তা কার্যকরী করা হলে বহির্দেশে নাবিকদের পাড়ি দেওয়ার বিষয়টি অনেক সহজতর হয়েছিল।[৩] ঐতিহ্যময় কলকাতা শহর বন্দরটির সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দেশগুলি এছাড়া পূর্ব এবং পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দেশের বন্দরগুলির সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে বাংলার নাবিকেরা জাহাজে কাজের সুবাদে সমুদ্রপথে যাতায়াতের ফলে বিশ্বের উন্নতধর দেশগুলিতে প্রবেশের মধ্যদিয়ে নিজেদের পরিচয় ঘটিয়েছিল। এরই মধ্যে অনেক নাবিক বিদেশের উন্নত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, সংস্কার বিমুক্ত অত্যাধুনিক সমাজব্যবস্থা এবং রুচিশীল সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আবার কখনো কখনো এরা প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ সংকটকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বহির্বিশ্বের দেশগুলিতে একটানা দীর্ঘদিন কালযাপন করে অভিবাসী হয়েছিল। রোজিনা ভিস্রাম (Rozina Visram) চার শতাব্দী যাবৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাবিকদের অভিবাসী হওয়ার ঘটনা প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেছেন যা সপ্তদশ শতকের গোঁড়ার দিক থেকে শুরু হয়েছিল এবং এর ধারা বিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। তবে বিংশ শতকে এই এশিয়ার নাবিকদের অভিবাসনের বিষয়টি নিয়ে তিনি বেশি গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করেছেন।[৪]

বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাংলার চিকনদার নামক একদল বস্ত্র বিক্রেতাদের আমেরিকাতে বসবাস করতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই ব্যবসায়ীরা কখনো কখনো স্বদেশপ্রীতি জনিত কারণে এবং একই সংস্কৃতিক পরিচয় বহন করায় জাহাজ থেকে পালানো বাংলার নাবিকদের আশ্রয় দিয়েছিল। জাহাজ থেকে পালানো এই নাবিকদের সংখ্যাটি ধীরে ধীরে অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে দেখা গিয়েছিল। বিশেষত পূর্ব বাংলার সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা থেকে এরা সর্বাধিক সংখ্যায় এসেছিল তবে পরবর্তীকালে এই সকল নাবিকদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের কলকাতা, হুগলী, দুই চব্বিশ পরগণা এবং এরই সঙ্গে বাংলার অন্যান্য জেলাগুলি থেকেও কমবেশি নাবিক আমেরিকাতে দেশান্তরিত হয়েছিল।[৫] এই নাবিকদের বেশিরভাগই ছিল প্রান্তিক গ্রাম বাংলার মধ্যবৃত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান। এদের অনেকেই আমেরিকা এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার অন্যদিকে দূরপ্রাচ্যে ফিলিপিন্স, জাভা, মালয়েশিয়া, ফিজি প্রভৃতি দেশে পদার্পণ করে এরা নতুন জীবিকা গ্রহণের মধ্যদিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসিত ভারতবর্ষে বাংলার অন্যতম বন্দর কলকাতা থেকে ছেড়ে যাওয়া ব্রিটিশ মালিকানাধীন জাহাজগুলিতে কর্মের সুবাদে ব্রিটেনে বাংলার নাবিকদের ঘনঘন আসা যাওয়ার ফলে এরা ব্রিটেনে একসময় বসতি স্থাপন করে ফেলেছিল। জাহাজের কাজে সংযুক্ত ভ্রাম্যমান জীবনের দরুণ বহির্দেশে কোথায় কি প্রকৃতির কাজ পাওয়ার সম্ভবনা থাকতে পারে তার

হালহকিকত এদের খুব ভালো ভাবে জানা ছিল। এজন্য অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত এবং গ্রাম্য চেতনাশীল নাবিকের কাজে যুক্ত মানুষগুলি তাদের প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবার পরিজনবর্গের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য নিজ নিজ বিষয়-আশয় বিক্রি করে অথবা বন্ধক রেখে জাহাজের কাজের যোগসূত্রে বিদেশে গিয়ে নতুন জীবিকা গ্রহণ করে অভিবাসন লাভ করেছিল। এরা বিদেশে প্রথমে খনি, কারখানা, নির্মাণশৈলীর কাজে নিযুক্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে রেস্তোরাঁ, কফি হাউস, ফেরী বিক্রেতার কাজে যুক্ত হয়ে জীবনধারণ করেছিল। বাংলা ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের নাবিকেরা ইউরোপীয় কোম্পানির জাহাজগুলিতে কর্মসম্পাদনের মধ্যদিয়ে বহির্দেশে সঞ্চালিত হয়ে অভিবাসন গ্রহণ করেছিল। তবে ঔপনিবেশিক শাসনকালে কলকাতা ভারতের রাজধানী শহর হওয়ায় কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে বহির্দেশীয় বাণিজ্যিক জাহাজগুলিতে বাংলার নাবিকদের বিদেশে অভিগমন এবং অভিবাসন লাভ করার ঘটনা প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলার নাবিকদের নিয়ে ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার কবি এবং সাহিত্যিকেরা তাঁদের লেখার মধ্যদিয়ে জাহাজে অবস্থানরত নাবিকদের কর্মজীবন পদ্ধতি ও তাদের ইউরোপীয় বন্দরে প্রবেশ করার ঘটনাগুলি তুলে ধরেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলির 'নোনাজল', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাপান যাত্রী', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামী বন্দর', জীবনানন্দ দাসের 'ঝরাপলকের নাবিক' ও সাতটি তারার তিমির গ্রন্থের 'নাবিক' কবিতায় নাবিকদের বিশ্বজয়ের পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এসকল স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিকরা তৎকালীন সময়ে বাংলার নাবিকদের জাহাজে কাজকর্ম এবং দূর দেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য সমুদ্রযাত্রা করতে দেখেছিলেন, নাবিকদের এই অভিগমন ও দেশান্তরিত হওয়ার বিষয়টি তাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৬] নাবিকদের জলপথে ভাসমান জাহাজে দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থানকালীন সময়ে কর্মসম্পাদন করা মোটেই সহজ ছিল না। জাহাজে নাবিকদের কর্মসম্পাদনের সময় কর্ম এবং বর্ণবৈষম্য জনিত ভেদাভেদ, এছাড়া বিভিন্ন আরোপিত আইনগুলি তাদের অভিবাসীত হতে প্রভাবিত করেছিল। কর্মক্ষেত্রে ইউরোপীয় শ্বেতকায় নাবিকদের সঙ্গে দেশীয় কৃষ্ণবর্ণের নাবিকদের ভেদাভেদ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দেশীয় নাবিকদের প্রায়শই তাচ্ছিল্য, দুর্ব্যবহারের দ্বারা অপমান এবং অত্যাচারিত করা হলে এরা এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় প্রায়শই জাহাজের কাজে নিয়োজিত দেশীয় নাবিকদের সঙ্গে বিদেশী নাবিকদের বেতনের তারতম্য দেখা গিয়েছিল।

দীর্ঘদিন এই নাবিকদের জাহাজে অবস্থানকালীন সময়ে স্বল্প মজুরী, বর্ণগত বৈষম্যের কারণে তারা বিকল্প জীবিকা গ্রহণ করার জন্য মুখিয়ে ছিল। এশিয়ার কৃষ্ণকায় নাবিকদের উপর কঠোর নিয়মনীতির জন্য এরা ব্রিটিশ জাহাজে কর্মসূত্রে বিদেশের বিভিন্ন বন্দরে প্রবেশের সুবাদে জাহাজের কাজে চুক্তিভঙ্গ করে বহির্দেশে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোনো চুক্তিভিত্তিক বা স্থায়ী কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত হয়েছিল। অনেক সময় বহির্দেশীয় বন্দরে শিপবোর্ড কোয়ার্টারে অবস্থানরত নাবিকেরা পরবর্তী সমুদ্রযাত্রার জন্য অপেক্ষাকালীন সময়ে বন্দর সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে উন্নত বেতনে বিভিন্নপ্রকার কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এই নাবিকেরা জাহাজে যেভাবে বর্ণগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল একইভাবে বহির্বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে বসবাসকালীন সময়ে বৈষম্যের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার কৃষ্ণবর্ণের অভিবাসী নাবিকেরা বহির্দেশে বর্ণগত ও কর্মগত ভেদাভেদের জন্য সেখানকার শ্রমিক ইউনিয়নগুলিতে যোগ দিয়েছিল। এভাবে এই অভিবাসী নাবিকদের ব্রিটেনের শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হতে দেখা গিয়েছিল, তবে এই বিষয়টি ঔপনিবেশিক শাসনকালে তাদের কাছে মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রায় দশ হাজার চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েক হাজার কৃষ্ণাঙ্গ নাবিক শ্বেতকায় নাবিকদের সঙ্গে ইউনিয়নে যুক্ত হতে পেরেছিল। এশিয়ার নাবিকদের কম বেতন দেওয়ার জন্য মজুরি বাবদ জাহাজ মালিকদের বহু অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল। ইউনিয়ন নির্ধারিত বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ নাবিকেরা সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পায়নি এবং চুক্তিবদ্ধ একমুখী সমুদ্রযাত্রার ক্ষেত্রে বিনা খরচে নিজ দেশে ফিরে আসার ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এই ঘটনাগুলি এশিয়ার নাবিকদের ব্রিটেনে অভিবাসন গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল।[৭]

বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ঘটনা নাবিকদের জীবনে গভীর সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ নাগাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নাবিকদের জীবনে সর্বাপেক্ষা অনেকখানি জীবন সংকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। নাবিকরা সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের পাটাতনে কষ্টসহিষ্ণু ভ্রাম্যমাণ জীবন ও সময় বিশেষে পরিস্থিতির শিকার হয়ে কিংবা সম্ভাব্য উন্নত ভবিষ্যতের জন্য ইউরোপ কিংবা আমেরিকা মহাদেশের উন্নত দেশগুলিতে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে অভিবাসন লাভ করেছিল। তবে ভারতীয় নাবিকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে প্রশংসনীয় পরিষেবা প্রদান করেছিল যার মধ্যে বাংলার নাবিকেরাও বিদ্যমান ছিল। এরা

কর্মদক্ষ, অদম্য সাহসী এবং কষ্ট সহনশীল প্রকৃতির হওয়ায় জাহাজের বিপদ সংকুল মুহূর্তে নিজেদের জীবন বাজি রেখে জাহাজকে রক্ষা করেছিল। কখনো কখনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে বাংলার বহু লস্করেরা প্রাণ হারিয়েছিল। এরা তাদের কর্মের প্রতি অবিচল ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির আনুগত্য নিয়ে বীরত্বের সাথে তাদের জীবনকে উৎসর্গিত করেছিল। ইষ্ট ইন্ডিজের অ্যাডমিরাল এই লস্করদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার জন্য প্রশংসনীয় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। যুদ্ধ কিংবা শান্তি যে সময়কালই হোক না কেন তিনি সর্বদা লস্করদের পাশে পেয়েছিলেন। সেসময় কলকাতা বন্দর থেকে বিদেশে পাড়ি দেওয়া অধিকাংশ টর্পেডোতে শত্রুপক্ষের জাহাজ দ্বারা আক্রমণ হয়েছিল। এই যুদ্ধকালীন আপৎকালে বাংলার নাবিকরা অসীম সাহসিকতা নিয়ে জাহাজের কর্মসম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য প্রশংসিত হয়েছিল।[৮]

বাংলার নাবিকদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) সিলেট জেলার অধিবাসী ছিল যারা জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল। একটি অবাক করা বিষয় সিলেট পূর্ববঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও (সমুদ্র উপকূল থেকে সিলেটের দূরত্ব কমপক্ষে ৩০০ মাইল) এই এলাকার লোকেরা সামুদ্রিক জাহাজের কাজকর্মে খুবই সাহসী এবং দক্ষতা সম্পন্ন ছিল। এই নাবিকেরা রান্নার (*Bhandari*) কাজে দক্ষ হওয়ায় এদের রান্নার কাজের জন্য ভাড়া করে নিয়ে আসা হত।[৯] সিলেটি নাবিকরা বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক সংখ্যায় দেশান্তরিত হয়ে অভিবাসন লাভ করে জীবনধারণ করেছিল। এই নাবিকেরা ব্রিটেনে এতো বেশি সংখ্যায় প্রবেশ করেছিল যে ব্রিটেনে একটি স্থানে Sylheti Colony গড়ে তুলেছিল। এইভাবে বাংলার নাবিকেরা ব্রিটেনে অভিবাসন লাভ করেছিল।[১০]

১.২. বাংলার নাবিকদের জাহাজের কর্মসূত্রে ভ্রাম্যমাণ শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ এবং অভিবাসন লাভের প্রক্রিয়া:

বাংলার নাবিকদের জাহাজের কর্মসূত্রে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিতে অভিবাসন নিয়ে জীবনধারণ করতে দেখা গিয়েছিল। এসকল নাবিকদের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্যুত হয়ে জাহাজে দীর্ঘদিন যাবৎ একঘেয়েমি কষ্টকর জীবনযাত্রা এছাড়া জাহাজে থাকাকালীন কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, বর্ণবিদ্বেষ এবং ইউরোপীয় জাহাজ মালিকদের প্রেষিত জাহাজ কর্মীদের দ্বারা অকথ্য শাসন ও শোষণ তাদেরকে অভিবাসন নিতে বাধ্য করেছিল। ইউরোপ এবং আমেরিকা

মহাদেশের উন্নত দেশগুলিতে ঊনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার নাবিকদের অভিবাসন নিতে দেখা গিয়েছিল। তবে আমেরিকাতে বাংলার নাবিকদের অভিবাসনের পূর্বে (অবিভক্ত বাংলার বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে) হুগলী জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা কাপড়ের উপর নকশা করা কাজগুলি আমেরিকার শহরগুলিতে ফেরি করে বিক্রি করত। সেই সময়কালে আমেরিকার উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর লোকেদের বাংলার এই নকশা করা বস্ত্রদ্রব্যগুলির প্রতি মোহ ছিল, তাই এদের এই দ্রব্যগুলির প্রতি চাহিদা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এজন্য এই বাঙালি ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে নিউ জার্সির সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যেখানে আমেরিকার অধিবাসীরা ঘুরতে আসতো সেখানে তাদের ব্যবসার পশরা নিয়ে বসেছিল। ক্রমান্বয়ে ব্যবসার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এরা উত্তরের ধনী শহর নিউ ইয়র্ক থেকে ল্যুইসিয়ানার নিউ ওরলায়েন্স শহরের দিকে ব্যবসার বিস্তার ঘটিয়েছিল। বাংলার নাবিকদের আমেরিকাতে অভিবাসনের পূর্বে এই ক্ষুদ্র ফেরি ব্যবসায়ীরা আমেরিকাতে তাদের শিকড় গেড়েছিল। পরবর্তী সময়ে যে সকল বাংলার নাবিকেরা অবৈধভাবে ব্রিটিশ জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় পদার্পণ করে অভিবাসী হয়েছিল তাদের এরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[১১]

কলকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর তীরবর্তী বাবনান, সিনেত, আলিপুর, চাঁদপুর মান্দারা, বন্দিপুর, বোরা, দাদপুর, গোপীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি চিকনবস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এলাকার মুসলিম মহিলারা সুন্দর নকশাওয়ালা চিকন বস্ত্র উৎপাদন করত। দক্ষিণ কলকাতার কলিঙ্গ বাজার, কলিন লেন, কার লেন এলাকায় চিকন বস্ত্রের বাজার ছিল এবং সেই সঙ্গে এখানে স্বল্পব্যয়ে থাকা খাওয়ার ব্যাবস্থা ছিল। এই ব্যবসার সহিত যারা যুক্ত ছিল তাদেরকে 'চিকনদার' বলা হত। ব্যবসা সূত্রে পশ্চিমী দেশগুলিতে এদের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং সেখানে তারা প্রথমে ফেরিওয়ালার কাজ করত ও পরে অন্যান্য কাজে লিপ্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানির (BISN) এস. এস. গোর্খা (S.S. Gorkha) নামক জাহাজটিতে কলকাতা বন্দর থেকে এরা বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। এই জাহাজে ভারতীয় যাত্রীদের জন্য জাহাজের ডেকে থাকার সুব্যবস্থা ছিল। এই জাহাজটি মাদ্রাজ, কলম্বো, বোম্বাই, এডেন হয়ে সুয়েজখাল অতিক্রম করে লন্ডনে পৌঁছাত। লন্ডনে জাহাজ পরিবর্তন করে এস. এস. সেন্ট পাউল (S.S. St. Paul) জাহাজে আটল্যান্টিক মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, নিউ ওরলায়েন্স, নিউ জার্সি প্রভৃতি শহরে পৌঁছাত।

ব্যবসার সূত্রধরে মধ্যবয়সী যুবক ও অল্পবয়সী কিশোর ফেরিওয়ালারা আমেরিকার শহরে এসে জীবনযাপন শুরু করেছিল। ৩৮ বছর বয়সী হাজী হক, ৬০ বছরের আব্দুল আজিজ, ৫১ বছরের আব্দুল গফফর, ৪৬ বছরের আব্দুল মজিদ, সলোমন মণ্ডল, আলিফ আলি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বসবাস করত।[১২]

১৯১০ সালে আমেরিকার নিউ ওরলায়েন্স শহরের জনগণনা সূত্রে পঞ্চাশ জন আমেরিকা বহির্ভূত বাঙালি ব্যক্তির নাম পাওয়া গিয়েছিল। এদের মধ্যে আলিফ আলি ও মহম্মদ মুশা নামে ২ জন বড় ব্যবসায়ী, ১৯ জন খুচরো ব্যবসায়ী, ২৬ জন ফেরিওয়ালা, একজন বাঙালি ছাত্র এবং বাকী ২ জন অন্যান্য কাজে লিপ্ত ছিল। এই শহরে St. Louis Street -এ ২৪ জন, N. Claiborne Street -এ ৬ জন, Conti Street -এ ৫ জন, N. Roman Street -এ ১১ জন, N. Johnson Street -এ ৪ জন বসবাস করত। বাঙালি মুসলিম ফেরিওয়ালাগণ নিউ ওরলায়েন্সে কিছুদিন থাকার পর দক্ষিণের শহরগুলির দিকে ফেরি করার কাজের জন্য রওনা দিয়েছিল এবং সেখানে বসবাস শুরু করেছিল। এরা নিজেরা মালপত্র বিক্রয় করত এবং বাংলা থেকে আগত আত্মীয়-স্বজনদের আশ্রয় দিত। ১৯১৭ - ১৯১৮ সালের সমীক্ষায় দেখা গেছে New Orleans -এ ৩৪ জন, Cherleston -এ ৭ জন, Memphis -এ ৪ জন, Chattanooga -এ ১ জন, Galveston -এ ২ জন, Dallas -এ ২ জন, Birmingham -এ ২ জন, Atlanta -তে ৩ জন এবং Jacksonville -এ ৬ জন বাঙালি ফেরিওয়ালারা দক্ষিণের এই শহরগুলিতে বসবাসের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট Draft Registration করেছিল।[১৩]

আমেরিকাতে বসবাসরত এসকল বাংলার ফেরিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের সঙ্গে বিবাহ করে তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করেছিল। ১৮৯০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত New Orleans শহরে মোট ২৫ টি মিশ্র বিবাহের কথা জানা যায়। আবার কখনো কখনো দেখা গেছে এরা আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধ নিয়মে বিবাহ না করে একইসঙ্গে থেকে জীবন অতিবাহিত করেছিল। সেভাবেই আলিফ আলি এমিলি লেকোমপর্টের সঙ্গে বিবাহ না করে একত্রে বসবাস করত এবং তাদের দুটি সন্তান ছিল। আবার আলি ১৮৯২ সালে আদাওয়ালেকে বিবাহ করে, যা মাত্র ৩ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে মকসেদ আলি এলা এলিজাবেথকে বিবাহ করেছিল, এছাড়াও ১৯২০ সালে আব্দুল জলিল জেনীকে বিবাহ করে

সেখানে জীবনধারণ করেছিল। এই মিশ্র বিবাহের ফলে এদের আমেরিকাতে অভিবাসী হওয়ার প্রক্রিয়া অনেকটা সহজতর হয়েছিল।[১৪]

চিকনদারদের আসার এক কিংবা দুই যুগ পার না হতেই বাঙালিদের আরেকটি দল নিউ ইয়র্ক ও পূর্বদিকে আমেরিকার অন্যান্য বন্দরগুলিতে নেমে বসবাস আরম্ভ করেছিল। এরা ছিল ব্রিটিশ জাহাজ থেকে পালানো বাংলার খালাসী নাবিক। বিবেক বাল্‌দ্‌ এদের ভবঘুরে ফেরি শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ১৯১০ সালে জাহাজ থেকে পলাতক নাবিকদের দল নিউ জার্সি, পেনসিলভ্যানিয়া ও উত্তরে নিউ ইয়র্ক শহরের বিভিন্ন কারখানায় কাজের খোঁজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসব জাহাজ পালানো নাবিকদের বেশীর ভাগই ছিল পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের গ্রামাঞ্চল থেকে আসা বাংলার বিভিন্ন মুসলিম পরিবারের সন্তান। স্বল্প শিক্ষিত এই বাঙালিদের ব্রিটিশ জাহাজে লস্কর বা খালাসী রূপে নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত করা হয়েছিল। ১৯১০ সাল থেকে জাহাজ পালানো লস্করদের ক্ষীণধারা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। বিশ বছর পূর্বে এদের পূর্বসূরি হিসাবে চিকনদাররা পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলের পর্যটনের জায়গাগুলিতে থাকতে শুরু করেছিল, অপরদিকে জাহাজ থেকে পলাতক নাবিকেরা উত্তরের শিল্প প্রধান রাজ্যগুলিতে পাকাপোক্তভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। এসকল বাংলার নাবিকেরা ধীরে ধীরে সেখানে ইস্পাত শিল্পে, জাহাজ মেরামতির কাজে, যুদ্ধ-সরঞ্জাম শিল্পে, গাড়ির যন্ত্রাংশ জোড়ার কারখানায় শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল।[১৫] যুদ্ধকালীন সময়ে আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায়ের অনেকেই যুদ্ধে যোগদানের কারণে শিল্পাঞ্চলগুলিতে শ্রমিকের অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল ফলস্বরূপ অভিবাসী বাঙালি নাবিক কর্মীদের কাজ পাওয়া অনেকটা সহজতর হয়েছিল। আবার অনেক সময় দেখা গেছে বাংলার অনেক নাবিক জাহাজে রান্না করার কাজে লিপ্ত ছিল যার ভান্ডারী *(bhandari)* নাবিক নামে পরিচিত, এসকল নাবিক জাহাজ থেকে পালিয়ে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকাতে বিকল্প জীবিকা হিসাবে রেস্টুরেন্ট খুলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের শেষদিকে ইব্রাহিম চৌধুরী, হাবিব উল্লাহ নামে দুজন বাঙালি লস্কর এবং একজন পিয়র্টো রিকোর অধিবাসী ভিক্টোরিয়া ইচেভারিয়া উল্লাহ (হাবিব উল্লাহের স্ত্রী) আমেরিকাতে অভিবাসী হয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের থিয়েটার জেলায় যৌথ উদ্যোগে ‘বেঙ্গল গার্ডেন’ নামে একটি রেস্তোরাঁ খুলেছিল। এটি ছিল সেখানে কিছু মুষ্টিমেয় ভারতীয়

রেস্তোরাঁগুলির মধ্যে একটি জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ। স্বাভাবিকভাবে এই রেস্তোরাঁতে আমেরিকানসহ বিদেশী বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষেরা আহারের জন্য আসতো। এজন্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এই রেস্তোরাঁতে কর্মচারী হিসাবে কাজ করত। ইব্রাহিম বিভিন্ন ভাষায় সাবলীল হওয়ার ফলে তার কর্মচারী এবং রেস্তোরাঁতে আগত ব্যাক্তিদের সাথে কখনো বাংলা, কখনো উর্দু, কখনো বা ইংরাজী, যে যেভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত তার সঙ্গে সেভাবেই বাক্যালাপ করত। হাবিব উল্লাহ রান্না করা থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁতে আগত অতিথিদের খাবার টেবিলের প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজগুলি দেখাশোনা করত। হাবিব উল্লাহের স্ত্রী ভিক্টোরিয়া ইচেভারিয়া রেস্তোরাঁতে আগত গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী খাবারগুলি পরিবেশন এবং দৈনন্দিন হিসাব পরিচালনা করত। এরা তিন জনই ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে উপস্থিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ইব্রাহিম চৌধুরী সম্ভবত প্রথম এসেছিল। সে একসময় পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশে) ছাত্র নেতা ছিল, এজন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছিল এর ফলস্বরূপ তাকে ভারত থেকে পালাতে হয়েছিল। সে একটি বহির্গামী স্টিমশিপে সেরাং হিসাবে কাজ পেয়েছিল। এমনকি তাকে একসময় ক্রু নাবিক হিসাবে জাহাজে কাজ করতে হয়েছিল। এরপর সে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পালিয়ে এসে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেছিল। প্রায় একই সময়ে হাবিব উল্লাহও এই শহরে এসেছিল। সে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে নোয়াখালী থেকে কলকাতায় চলে এসে একটি জাহাজে নাবিক হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিল। কলকাতা থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজটি বোস্টন বন্দরে পৌঁছালে সেখানে সম্ভবত শারীরিক অসুস্থতা কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে সে জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বলা ধরে নেওয়া হয়। হাবিব ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিল না কিন্তু কোনোভাবে নিউ ইয়র্ক শহরে চলে এসে Lower East Side এ অন্য এক বাঙালি নাবিকের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিল এবং জীবিকার তাগিদে থালা-বাসন পরিষ্কার করা (dishwasher) এবং তার পাশাপাশি রান্নার কাজে লিপ্ত হয়েছিল। ১৯৩০ এর দশকে হাবিব Lexinton Avenue চলে এসেছিল যেটি East Harlem -এ অবস্থিত, এখানে বহু সংখ্যক বাঙালি বসতি স্থাপন করেছিল এবং এখানেই তার ভিক্টরিয়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এরপর তারা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা যৌথ প্রচেষ্টায় বেঙ্গল গার্ডেন (Bengal Garden) নামক রেস্তোরাঁটি খুলেছিল।[১৬]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নিউ ইয়র্ক বন্দরকে কেন্দ্র করে বহু বাঙালি মুসলিম নাবিকের অভিবাসন ঘটেছিল। সেখানে তারা বিভিন্ন প্রকার জীবিকা গ্রহণ করে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছিল। নিউ ইয়র্ক বন্দর সংলগ্ন এলাকায় কর্মসূত্রে এবং মিশ্র বিবাহসূত্রে তারা অন্য ভিনদেশী অভিবাসীদের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরেছিল। ১৯২২ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে বাংলার অসংখ্য লোকজন আমেরিকাতে এসে অভিবাসন গ্রহণ করেছিল যারা পূর্বে জাহাজে নাবিক হিসাবে কাজ করত। এসকল বাংলার নাবিকেরা এখানে অভিবাসন গ্রহণ করে আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার মহিলাদের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে জীবনধারণ করেছিল। এরকম বেশকিছু মিশ্র বিবাহের ঘটনাবলী নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া হল–

সারণি সংখ্যা – ১

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে বাঙালি অভিবাসী নাবিকদের মিশ্র বিবাহ (১৯২২-১৯৩৭)

Date	Name	Age	Address	Color	Occupation	Birthplace
February 10, 1926	Solomon Khan Agnes Weeks	23 23	1808 3rd Ave. 9 E. 130th st.	White Colored	Salesman …….	Calcutta, India Barbados, BWI
July 10, 1926	Nawab Ali Frances Santos	24 18	222 E. 100th St. 317 E. 100th St.	Colored White	Laundry Man …….	Calcutta, Br. East Indies Porto Rico
August 2, 1930	Caramath Ali Carolina Green	26 27	1978 2nd Ave. 230 E. 99th St.	White White	Bell Boy …….	East India Dominican Republic
August 2, 1930	Nawab Ali Bernardina Colon	29 16	222 E. 98th St. 222 E. 98th St.	Indian White	Laundry Work …….	Calcutta, India Juana Diaz, Puerto Rico
October 3, 1930	Kassim Ullah Frances English	27 22	329 Grand St. 217 Grand St.	Colored Colored	Painter ……	East India Carlisle, South Carolina
January 18, 1933	Habib Ali Dolores Velera	23 22	90 Orchard St. 42 Rivington St.	Colored White	Waiter …….	Calcutta, India Puerto Rico
December 14, 1934	Nabob Ali Maria Cleophe Jusino	28 22	57 E. 110th St. 57 E. 110th St.	White White	Cook …….	Calcutta, India Sabana Grande, P.R.
June 26, 1937	Eleman Miah Emma L. Douglass	27 22	39 W. 112th St. 183W. 115th St.	East Indian Colored	Cook's Helper …….	Calcutta, India Indianapolis, IN

সূত্র: City of New York, *Certificates and Record of Marriage, 1899-1937* উদ্ধৃত থেকে সংগ্রহ করে Vivek Bald -এর *Benhali Harlem, and the lost of South Asian American, pp, 168-169,* গ্রন্থে *Indian Mixed Marriages, Harlem and Lower East Side, 1922-1937* -এর তালিকা তৈরি করেছেন সেখান থেকে বাংলার নাবিকদের নিউ ইয়র্ক শহরে মিশ্র বিবাহ করে অভিবাসী হওয়ার বিষয়টি তালিকাতে তুলে ধরা হল।

বাংলার নাবিকরা অনেক সময় অবৈধভাবে বিদেশের ভূখন্ডে প্রবেশের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এভাবে সৈয়দউল্লা (Said Ulla) নামক একজন মুসলিম বাঙালি নাবিক ১৯২৭ সালে আমেরিকার টেক্সাসে আর্থার বন্দরে এসেছিল। বাংলার জগন্নাথপুরের বাসিন্দা এই সৈয়দউল্লা (Said Ulla) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশের কারণে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম ইমিগ্রেশন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্বাসিত করা হয়েছিল। হংকং হয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে জরুরী কারণবশত S. S. President Wilson জাহাজে তাকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এই নাবিকের প্রস্থানের বিষয়টি হংকং এবং Straits Settlement -এর গভর্নরদের অবগত করানো হয়েছিল।[১৭] শুধুমাত্র বাংলার নয় এশিয়ার অনেক লস্কর বহির্দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করার জন্য স্থানীয় পুলিশ দ্বারা গ্রেফতার হয়েছিল। আলি আকবর (Ali Akbar) এবং জামদার ওরফে জামদাদ (Jambdar whose correct name is said to be Jamdad) বর্তমান পাকিস্থানের কেম্পবেলপুর জেলার দুজন লস্কর প্রথমে S.S. "Ranpura" এবং পরবর্তী সময়ে "City of Rome" নামক জাহাজে ফায়ারম্যানের কাজের সূত্রে চিন, জাপান এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছিল। তারা এক সময় লিভারপুল থেকে কার্ডিফে যাওয়ার পথে তাদের কাছে পরিচয়পত্রের প্রমাণস্বরূপ কোনো ডকুমেন্ট না থাকায় সেখানকার পুলিশ সন্দেহজনকভাবে তাদেরকে গ্রেফতার করেছিল। এরপর ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালে এই দুজন লস্করকে লন্ডন থেকে স্কটল্যান্ডের লেইথ বন্দর হয়ে ভারতে ফেরত পাঠিয়েছিল।[১৮]

বাংলার নাবিকদের আমেরিকাতে অভিবাসনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে অভিবাসন লাভের প্রক্রিয়াটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলার নাবিকেরা ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মসূত্রে প্রায়শই ব্রিটেনে আসা যাওয়া করত। ব্রিটেনে বাংলার নাবিকদের দীর্ঘদিন যাবৎ থাকার জন্য বোর্ডিং হাউস গড়ে তোলা হয়েছিল। তোফুসিল আলি ১৯১৩ সালে লন্ডনে প্রথম ভারতীয় বোর্ডিং হাউসটি নির্মাণ করেছিল। ১৯১৯ সাল নাগদ এরকম অন্তত তিনটি বোর্ডিং হাউস গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। ১৯১৯ সালে আয়ুব আলি মাস্টার জাহাজের কাজ পরিত্যাগ করে আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে সে ব্রিটেনে এসে East London -তে একটি বোর্ডিং হাউস এবং একটি ক্যাফে (Café) খুলেছিল যেটি পলাতক বাঙালি নাবিকদের প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া নাইরুলা দ্বারা পরিচালিত ১৯১৯ সালে লন্ডনে আরেকটি খ্যাতিসম্পন্ন লজিং হাউস দেখা গিয়েছিল যেখানে পলাতক ভারতীয় এবং চীনা নাবিকরা আশ্রয় নিয়েছিল।[১৯]

মাত্রাতিরিক্ত অভিবাসন লাভের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য ব্রিটিশ সরকার অভিবাসনের উপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তবে এতো সব নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও যেহেতু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকালীন সময়ে বহু বাংলার নাবিক ব্রিটেনে অভিবাসী হয়ে বসবাস শুরু করেছিল সেহেতু যুদ্ধ পরবর্তীকালে আগত নাবিকদের উপর ব্রিটেনে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জনিত আইনগুলিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়নি। ১৯২০ সালের মাঝামাঝির দিকে নাবিকদের প্রবেশাধিকার এবং কাজকর্মের ক্ষেত্রে খুব একটা বিধিনিষেধ লাগু হতে দেখা যায়নি। ঐ সময় বেশকিছু নাবিক জাহাজ থেকে পলিয়ে গিয়ে ব্রিটেনে আশ্রয়গ্রহণ করেছিল। ১৯২০ সালের পর ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়া ব্রিটেনে আগত নাবিকদের মেরিটাইম আইনের মাধ্যমে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারত সরকার সে সময় পাসপোর্ট এবং ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের উপর প্রবল নিয়মনীতি প্রয়োগ করেছিল। এসত্বেও নাবিকদের জাহাজ থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা পূর্বের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল এই বিষয়টি দেশীয় রাজনৈতিক উত্তেজনার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অফিসারদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। ফলস্বরূপ এসকল অফিসাররা এলোমেলো একটি পরিসংখ্যান সরকারের নিকট তুলে ধরেছিল। ব্রিটিশ অফিসিয়াল বর্ণনা অনুযায়ী একমুখী যাত্রার জন্য যে সকল ছদ্মবেশী নাবিক ব্রিটেনে প্রবেশ করেছিল সে সকল নাবিকদের উপর কঠোরভাবে নজর রাখা হয়েছিল। ১৯১৭ সালের পর আমেরিকাতে এশিয়ার নাবিকদের উপর বিধিনিষেধ ভীষণ কড়াকড়ি করা হয়েছিল। ১৯৩০ সালে জাহাজ থেকে পলাতক সিলেটি নাবিকেরা যুক্তরাজ্যে এসে হোটেল রেস্তোরাঁর কাজে যোগদান করেছিল। বাংলা থেকে আগত এসকল নাবিকরা ব্রিটেনে কারখানা, খনিতে কাজকর্ম এবং অনেকে ফেরি শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করেছিল। এই বাঙালি অভিবাসী নাবিকদের সঙ্গে পাঞ্জাবী এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের নাবিকেরাও ব্রিটেনে অভিবাসন নিয়েছিল।[২০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি তথ্য অনুসারে, পূর্বদিকের দেশগুলির মধ্যে সিঙ্গাপুরে ৩,০০০ জনের একটি শক্তিশালী সিলেটি নাবিকদের সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠী ছিল, যারা ১৯১৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশ মার্চেন্ট ভেসেলে গিয়ে সেখানের উপকূলবর্তী স্থানে কর্মসংস্থানের সন্ধান করেছিল। যদিও এই তথ্যটি আব্দুল মজিদ অতিরঞ্জিত করে বলেছিল বলে মনে করা হয় কারণ চীনা এবং মালয় নাবিকদের দ্বারা সিঙ্গাপুর বন্দরে তার জাহাজের দালালি ব্যবসা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই ব্যবসা পুনুরুজ্জীবিত করার জন্য সে বাংলার নাবিকদের

আহ্বান করেছিল। তবে যাইহোক সেখানে বাংলার নাবিকদের কর্মকান্ড এবং জীবন নির্বাহের বিষয়টি একেবারে অস্বীকার করা যায় না।[২১] এভাবে ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়াসহ সমগ্র বিশ্বে বাংলার নাবিকদের বিচরণ করতে দেখা গিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার নাবিকদের মতো বাংলায় বিভিন্ন পেশাদারী কর্মসন্ধানী মানুষজন সমুদ্রপথে বহির্দেশে পাড়ি দিয়েছিল। এদের অনেকেই ব্যবসায়ী ও ফেরির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেখ সরফউদ্দিন হুগলী জেলার সিঙ্গুরের তেলিপুকুর গ্রামের বাসিন্দা ফেরির কাজ করার জন্য বিদেশে গিয়েছিল। সে ১৯২৯ সালের ৩রা মে বহির্দেশে যাত্রার জন্য একটি পাসপোর্ট (পাসপোর্ট নম্বর – ১০৯৭) ইস্যু করেছিল। তার পাসপোর্টটি ভারত এবং ত্রিনিদাদের জন্য বৈধ ছিল। সফরউদ্দিন ১৯২৯ সালের অক্টোবরে পানামাতে পৌঁছেছিল এরপর সে ২৭ মে ১৯৩২ সালে ক্রিস্টোবাল বন্দর থেকে 'Reina del Pacifico' জাহাজে করে লিভারপুল হয়ে তার নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। আব্দুল গফুর হুগলীর রসুলপুরের একজন ব্যবসায়ী ১৯২৯ সালে অক্টোবরের ৩ তারিখে একটি পাসপোর্ট ইস্যু (পাসপোর্ট নম্বর – ৩০৮৫) করে পেঙ্গান হয়ে পানামাতে গিয়েছিল। আবার সে ১৯২৯ সালের ২০ শে অক্টোবর 'S. S. PRESIDENT HAYES' জাহাজে বালবা বন্দর হয়ে স্বদেশে ফিরেছিল। সেখ সাতকড়ি মণ্ডল হুগলীর হরিপালের আকন্দগাছি গ্রামের একজন ব্যবসায়ী ১৯২২ সালের ১লা আগস্ট পাসপোর্ট ইস্যু করে (পাসপোর্ট নম্বর – ২৩১০) কোলন বন্দর হয়ে পানামা গিয়েছিল। তবে কোন জাহাজে সাতকড়ি মণ্ডল পানামাতে পাড়ি দিয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।[২২] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে এদের বহির্দেশে কর্মযোগের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বহন করেছিল কারণ এদের বহির্দেশে যাত্রাপথটি সমুদ্রপথে নাবিকদের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়েছিল। এসকল বাংলার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন কর্মীদের বহির্বিশ্বে অভিগমনের দ্বারা শ্রম সংস্থানে বিশ্বায়ন ঘটেছিল। আবার এই শ্রমের সঞ্চালনের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকেরা জলপথে জাহাজে কর্মসম্পাদনের মধ্যদিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলা থেকে বহির্বিশ্বে যাত্রারত বিভিন্ন জীবিকাধারী মানুষেরা ঔপনিবেশিক শোষণের জায়গাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। বাংলার কংসারিপুরের আহমেদ জামদারের ৩ ছেলে (১) আব্দুল ওদুদ জমাদার (২) আব্দুল ওজুদ ওরফে আব্দুল রফি জমাদার এবং (৩) আব্দুল রসিদ জমাদার বিংশ শতকের দুইয়ের দশকে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেছিল। এসময় আমেরিকায় বেশকিছু ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছিল

যার মধ্যে আব্দুল ওজুদ ওরফে আব্দুল রফি জমাদারকে ব্রিটিশরা সন্দেহের তালিকায় নিয়ে এসেছিল এই কারণে তাকে ভারতে ফিরে আসার জন্য আর পাসপোর্ট দেওয়া হয়নি। তবে সে তার ভাই আব্দুল ওদুদের নামে পাসপোর্টের আবেদন করলে তা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এভাবে আব্দুল ওজুদ তার ভাই আব্দুল ওদুদের নামে পাসপোর্ট ইস্যু করে আমেরিকা থেকে স্বদেশে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। এরপর আব্দুল ওজুদ পানামা যাওয়ার জন্য তার বড়ো ভাই আব্দুল ওদুদের নামে পাসপোর্ট ইস্যু করেছিল যদিও আব্দুল ওদুদ আমেরিকার পানামাতে সেসময় বসবাস করছিল। ব্রিটিশ সরকার এদের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের সেভাবে কোনো তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় এদের তদন্ত অনুসন্ধানে আগ্রহ দেখায় নি।[২৩] এই ঘটনাগুলি বহির্বিশ্বে বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষদের ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী চেতনাগুলিকে উজ্জীবিত করেছিল।

ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনমূলক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক ভারতে পাঞ্জাবী শিখরা সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন করেছিল। তাদের প্রতিবাদ আন্দোলনের স্ফুরণ বিংশ শতকের প্রথম দশকে কোমাগাতামারু জাহাজে পাঞ্জাবী শিখদের নির্মম হত্যাকান্ডের ফলে গদর আন্দোলনের উদ্ভব ঘটিয়েছিল আবার এই দশকের শেষদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের মতো ঘটনা শিখদের ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে বহু শিখদের বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিভিন্ন কর্মসূত্রে তারা বহির্দেশে পাড়ি দিলেও জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের একতাবদ্ধ করে তুলেছিল। ১৯২৮ সালে গান্দা সিং (Ganda Singh) নামে বাংলার হাওড়া জেলার একজন পাঞ্জাবী শিখ কাজের জন্য বাংলা থেকে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তীকালে তাকে একটি ইমার্জেন্সি সার্টিফিকেট প্রদান করে সানফ্রান্সিসকো থেকে হংকং হয়ে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এই ঘটনাটি কোমাগাতামারু জাহাজের যাত্রাপথটি যেমন চিহ্নিত করেছিল আবার অন্যদিকে এইরকম কর্মসন্ধানী ও ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী মানুষগুলি জলপথে যাত্রারত অবস্থায় বাংলার নাবিকদের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল।[২৪]

ছবি: গান্দা সিং -এর (Ganda Singh) ছবি (বামদিকে) এবং গান্দা সিং –এর আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার Emergency Certificate -এর ছবি (ডানদিকে)।

১.৩. যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বহির্বিশ্বে সুমদ্র যাত্রাকালীন সময়ে জাহাজে কর্মরত বাংলার নাবিকদের সংকটকালীন পরিস্থিতি:

প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বের দেশগুলিকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিয়েছিল। এই দুটি যুদ্ধ জলপথ, স্থলপথ এবং আকাশপথেও সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। এই দুই বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী ধ্বংসলীলার তান্ডব বহু মানুষকে আহত, নিহত এবং প্রবল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করে সর্বস্বান্ত করে তুলেছিল। তবে এই ভয়ঙ্কর দুই বিশ্বযুদ্ধ সারা বিশ্ব জুড়ে শিরা উপশিরা সঞ্চালিকার মতো প্রতিটি দেশকে যুদ্ধের ভয়াবহতার রূপ আস্বাদন করিয়েছিল। যদিও বিশ্বের উন্নতশীল দেশগুলি এই মহাযুদ্ধের প্রধান ভূমিকা নিয়ে রণাঙ্গনে হাজির হয়েছিল। এই মহাযুদ্ধ ঘটার পেছনে বাহ্যিক যে কারণই থাক না কেন ইউরোপীয় দেশগুলির খুব দ্রুত শিল্প, বাণিজ্য এবং আর্থিক দিক দিয়ে উন্নতিলাভ, ভয়াবহ দুই বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস তৈরি করেছিল। তৎকালীন সময়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতশীল দেশগুলি জল, স্থল এবং আকাশপথে সামরিক শক্তির নিরিখে উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। এই দেশগুলি উন্নত

অস্ত্রশস্ত্র, অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ও জাহাজ নির্মাণের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এর ফলস্বরূপ যুদ্ধের ভয়াবহতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় হাওয়ায় দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকার নৌ এবং বিমান ঘাঁটি পার্ল হারবারে জাপানী সেনার অতর্কিত আক্রমণে আমেরিকার বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আমেরিকা এর প্রত্যাঘাত রূপে ১৯৪৫ সালের ৬ই এবং ৯ই আগস্ট জাপানের জনসমৃদ্ধ হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমানবিক অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। এভাবে যুদ্ধাস্ত্রের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ধ্বংসলীলাকে পূর্বের বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধে ভয়াবহ করে তোলা হয়েছিল। ইউরোপের উন্নতশীল দেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিতে দীর্ঘদিন যাবৎ ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম রেখেছিল যা বিংশ শতকের মাঝামঝি পর্যন্ত স্থায়িত্বলাভ করেছিল। আবার আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো সদ্য অর্থসমৃদ্ধ ক্ষমতাধর দেশগুলি আত্মপ্রকাশের জন্য ভূখন্ডের পরিধি বিস্তারের প্রতিযোগিতায় রত ছিল। তবে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, ডাচ প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের ঐতিহ্যশালী উপনিবেশগুলিতে শোষণ চালিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক ঘাটতি পূরণে এই উন্নত ক্ষমতাধর দেশগুলি উপনিবেশগুলিতে ঋণের বোঝা চাপিয়েছিল যা পরবর্তী দিনগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনস্ত উপনিবেশগুলিতে তীব্র অর্থসংকট সৃষ্টি করেছিল।[২৫]

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সমগ্র বিশ্ববাসীকে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ধ্বংসের রূপ দেখিয়েছিল। ইংল্যান্ড এই মহাযুদ্ধে সরাসরি যোগদানরত দেশ হওয়ায় সে তার উপনিবেশগুলিতে অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করেছিল। ভারত ইংল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ হওয়ায় এখান থেকে যুদ্ধের জন্য সৈন্য, রসদ এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বলপূর্বকভাবে নিজ দেশে নিয়ে গিয়েছিল। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী ও সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন প্রকার নিত্য নতুন পন্থা অবলম্বন করে ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণকে তীব্রতর করে তুলেছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত ভারতের জনগণ ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এবং লুটের ভয়াবহতার রূপ দেখেছিল। ব্রিটিশেরা এসময়ে ভারতের শ্রমিকদের উপর করের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সামরিক এবং অসামরিক প্রশাসনের খাতে যে বিপুল পরিমাণ ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছিল তা উসুল করা হয়েছিল জনগণের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি এবং শোষণকার্যের দ্বারা।[২৬] যুদ্ধে খাদ্য, রসদ, সৈন্য এছাড়া আরও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইউরোপে সহজে এবং সুলভে সরবরাহের জন্য জলপথে ব্রিটিশ জাহাজগুলি ছিল একমাত্র অবলম্বন।

জলপথে কর্মরত বাংলার নাবিকেরা এই যুদ্ধকালীন সময়ে জাহাজে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করেছিল।

যুদ্ধকালে মার্চেন্ট শিপে কর্মরত নাবিকদের মৃত্যুর জন্য ব্রিটিশেরা জার্মানির কাছে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ চেয়েছিল সে সম্পর্কে ভারত সরকারের কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে যাইহোক, তাদের দাবির ভিত্তি ছিল ভারত এবং ব্রিটিশ উভয় নাবিকদের সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিতকরণ করা।[২৭] যুদ্ধকালে যেসমস্ত নাবিক জাহাজে কর্মসম্পাদনের সময় প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়ে নিহত হয়েছিল তারা মূলত তিনটি শ্রেণীতে পড়ে—

> প্রথমত, ব্রিটিশ জাহাজে থাকাকালীন নাবিকেরা হয় শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডে নিহত হয়েছিল কিংবা উত্তর অক্ষাংশে যুদ্ধের জরুরী অবস্থা হিসাবে এরা কর্মে যোগদানের ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গিয়েছিল (যেখানে এরা নিয়োজিত হয়নি) অথবা শত্রু দেশে বন্দি অবস্থায় মারা গিয়েছিল।[২৮]
>
> দ্বিতীয়ত, এই নাবিকেরা মিত্র বাহিনীর জাহাজে প্রতিকূল কর্মকাণ্ডে নিহত হয়েছিল।[২৯]
>
> তৃতীয়ত, এসকল নাবিক শত্রু দেশের জাহাজ দ্বারা আটক ছিল এবং এরা জার্মানিতে বন্দী অবস্থায় মারা গিয়েছিল।[৩০]

যুদ্ধকালীন সময়ে বহির্দেশে মারা যাওয়া নাবিকদের জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতার ব্যবস্থা এবং ক্ষতিপূরণের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিল।[৩১]

বাংলার নাবিকরা জাহাজী শ্রমিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করলেও তা পরবর্তী দিনগুলিতে সুখকর না হওয়ার জন্য এরা কাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বহির্দেশে ভিন্ন জীবিকা গ্রহণ করে জীবনধারণ করেছিল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইংল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে জাহাজগুলির আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এজন্য বাংলার নাবিকদের পূর্বের থেকে কাজের পরিসর এবং দায়িত্ব অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাঝ সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় এদের শত্রু দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী সীমানায় চলাচলরত জাহাজগুলিকে এড়িয়ে চলতে হত। এ সত্বেও কোনো কোনো সময় মধ্য সমুদ্রে শত্রুপক্ষের জাহাজ দ্বারা ব্রিটিশ জাহাজে আক্রমণের জন্য জাহাজে কর্মরত বাংলার নাবিকরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। এখানে বহু নাবিকের প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে অবিভক্ত বাংলা এবং আসামের ৮৯৬ জন লস্কর তথা বাংলার নাবিক ব্রিটিশ জাহাজে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। যুদ্ধে শহিদ

হওয়া বাংলার নাবিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শিপিং এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির প্রচেষ্টায় কলকাতা ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে প্রিন্সেপ ঘাটের ১০০ গজের মধ্যে Lascar War Memorial স্মৃতি সৌধটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এই স্মৃতি সৌধটি ১৯২৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন (Lord Lytton) জনসাধারণের জন্য উন্মোচন করেছিলেন। নিম্নে Lascar War Memorial -এর চিত্রগুলি দেওয়া হল:-

"Lascar War Memorial" –এর বাইরের দৃশ্য এবং এর সম্মুখ ভাগ অংশের ছবিগুলি

সূত্র: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lascar_War_Memorial

"Lascar War Memorial" –এর ভিতরের ছবিগুলি

সূত্র: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lascar_War_Memorial

বাংলার নাবিকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে প্রশংসনীয় পরিষেবা প্রদান করেছিল। তারা কর্মদক্ষ, অদম্য সাহসী এবং কষ্ট সহনশীল হওয়ায় জাহাজের দুর্বিপাকে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। এ সময় শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে হাজার হাজার নাবিক প্রাণ হারিয়েছিল। এই সাহসী বাংলার নাবিকরা তাদের কর্মের প্রতি অবিচল ছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বীরত্বের সাথে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। ইষ্ট ইন্ডিজের অ্যাডমিরাল নাবিক তথা লস্করদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার জন্য একটি উজ্জ্বল শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। শান্তি কিংবা যুদ্ধ যাই হোক না কেন তিনি সর্বদা লস্করদের পাশে পেয়েছিলেন। সেসময় কলকাতা বন্দর থেকে বিদেশে পাড়ি দেওয়া অধিকাংশ টর্পেডোতে শত্রুপক্ষের জাহাজ দ্বারা আক্রমণ হয়েছিল। জাহাজের আপৎকালীন বিপদের সময় বাংলার লস্কররা তাদের ধৈর্য এবং সাহসিকতা সম্পন্ন কৃতিত্বের জন্য প্রশংসিত হয়েছিল।[৩২]

জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হলে যুদ্ধ প্রতিশোধস্বরূপ জার্মানীর কাছে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছিল যেখানে ব্রিটেনের অর্থ দপ্তর ঘোষণা করেছিল ৫,০০০,০০০ পাউন্ড অর্থ ১৭,০০০ জন নিহত ব্রিটিশ মার্চেন্ট নাবিকদের উদ্দেশ্য প্রদান করা হবে। একটি সরকারী বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের আক্রমণে ৩৪২৭ জন ব্রিটিশ জাহাজে কর্মরত ভারতীয় মার্চেন্ট নাবিকরা নিহত হয়েছিল এরই মধ্যে ৪৭ জন নাবিক জার্মানীতে বন্দী অবস্থায় মারা গিয়েছিল। জার্মানীর ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি নিয়ে ISU এর পক্ষ থেকে ১৯২২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জেনারেল মিটিংয়ের মধ্যদিয়ে ভারতীয় নাবিকেরা ন্যায্য দাবি জানিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্রিটিশ মার্চেন্ট নাবিকদের সঙ্গে যেসকল ভারতীয় মার্চেন্ট নাবিকেরা মারা গিয়েছিল তাদের সকলের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছিল।[৩৩]

বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে জাহাজে কর্মরত বাংলার নাবিকেরা শত্রুপক্ষের জাহাজ দ্বারা আক্রমণের ফলে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এই দুই বিশ্বযুদ্ধে জাহাজে বোমা নিক্ষেপ ও গোলাগুলির দ্বারা সংঘর্ষে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে নাবিকদের ব্রিটেনে অধিকতর অভিবাসন নিতে দেখা গিয়েছিল। এছাড়া আরও একটি দিক হল যুদ্ধে ভগ্নপ্রায় জাহাজগুলি মেরামত করার জন্য অনেকটা সময় লাগত তাই তাদেরকে সেখানে কর্মহীন হয়ে দীর্ঘ সময় কাটাতে হত। ব্রিটিশ ভারতীয় জাহাজগুলি ব্রিটেনে গ্লাসগো, সাউথ শিল্ড, নর্থ শিল্ড, লিভারপুল, লন্ডন, বেরী, নিউ পোর্ট, কার্ডিফ প্রভৃতি বন্দরে প্রবেশ করলে

সেখান থেকে জাহাজী নাবিকেরা যাতে পালিয়ে না যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হত। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে এই বন্দরগুলিতে অবস্থানরত নাবিকরা শিপ মাস্টারদের নজর এড়িয়ে জাহাজের কাজ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়ে ব্যাপক সংখ্যায় অভিবাসন ঘটিয়েছিল। এই সময়কালে নাবিকদের জীবিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়নি, তারা ব্রিটিশ শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কর্মসম্পাদন করেছিল। এরফলে জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্যের জন্য ব্রিটিশ শ্বেতকায় এবং এশিয়ার কৃষ্ণবর্ণের নাবিকদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হতে দেখা গিয়েছিল। এই বিষয়টি ব্রিটেনে অভিবাসন নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা সহ সমগ্র এশিয়ার নাবিকদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। এভাবে এই অভিবাসী নাবিকরা ব্রিটেনে সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল।[৩৪] তবে বাংলার নাবিকেরা কর্মদক্ষ এবং সংগ্রামশীল চেতনাসম্পন্ন হওয়ায় বহির্বিশ্বে বিপদসংকুল পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে অভিবাসী হতে সক্ষম হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নাবিকেরা প্রচুর সংখ্যায় রয়েল নেভিতে যোগ দিয়েছিল এরফলে ইউরোপীয় মার্চেন্ট জাহাজে বৃহৎ সংখ্যক লস্কর কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল। এই যুদ্ধকালীন সময়ে জাহাজ কর্মে আয়ুব আলি মাস্টার, সৈয়দ আব্দুল কোরেশী, ইসরাইল মিয়াঁ প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ সিলেটি নাবিকদের ভূমিকা ছিল অকপট সত্য। মার্চেন্ট নেভির দায়িত্ব ছিল রয়েল নেভিগুলিকে যুদ্ধের সম্মুখে প্রেরণ করা, সাধারণ আমদানি রপ্তানি বজায় রাখা, কারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করা এবং দেশে ও বিদেশে খাদ্য সরবরাহ করা। ১৯১৭ সালে জার্মানী যুদ্ধে অনিয়ন্ত্রিত সাবমেরিন দ্বারা আক্রমণ শুরু করলে ব্রিটিশ জাহাজগুলির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে প্রায় ১৭,০০০ নাবিক প্রাণ হারিয়েছিল এবং ৩,৩০৫ টি বাণিজ্যিক জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।[৩৫]

১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল তখন এশিয়ার নাবিকদের কর্মসংস্থানের উপর প্রাক-যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং এদের অনেককে মার্চেন্ট নেভিতে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এই যুদ্ধের সময় ভারতীয় উপমহাদেশের সহযাত্রী সহ এক হাজারেরও বেশি সিলেটি ব্রিটেনে এসেছিল কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারা যুদ্ধে সেখানে প্রাণ হারিয়েছিল। তৎকালীন সময়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া অনেকটা জীবন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এই ক্ষতির পরিমাণ ১৯৪২ সালে শীর্ষে পৌঁছেছিল কারণ জার্মান সাবমেরিন ব্রিটেনের উপর অবরোধ আরোপ করার চেষ্টা করেছিল। সবমিলিয়ে ৪৭৮৬ টি মার্চেন্ট জাহাজ ধ্বংসের সঙ্গে সর্বমোট প্রায় ৩২০০০ জন

নাবিক প্রাণ হারিয়েছিল। অনেক সিলেটি প্রবীণ ব্যাক্তি যুদ্ধের সময় তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাগুলি Caroline Adams কাছে বর্ণনা করেছিল যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছিল। জার্মান U-boat গুলির আক্রমণে মারা যাওয়ার ঝুঁকি বুঝে এদের মধ্যে অনেকে এই জীবিকা ছেড়ে ব্রিটেনের রেস্তোরাঁগুলিতে নিরাপদ জীবিকা হিসাবে পুরাতন পেশায় ফিরে গিয়েছিল।[৩৬]

বাংলার সিলেটি নাবিকসহ দক্ষিণ এশিয়ার নাবিকরা যুদ্ধকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) এক হাজারেরও বেশি নাবিক উপমহাদেশের সিলেট জেলা থেকে তাদের সহকর্মী নাবিকদের নিয়ে ব্রিটেনে এসেছিল। সশস্ত্রবাহিনীতে তালিকাভুক্ত ব্রিটিশ নাবিকদের পরিবর্তে দক্ষিণ এশিয়ার নাবিকদের নিয়ে আসা হয়েছিল এবং এদের মধ্যে অনেকেই অনিবার্যভাবে তাদের জীবন হারিয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হলে অল্প সংখ্যক নাবিক যারা বেঁচেছিল তারা ব্রিটিশ ভূখন্ডে বসবাস শুরু করেছিল। এদের মধ্যে অনেকে আইরিশ, স্কটিশ ও ইংরেজ মহিলাদের বিয়ে করে গ্লাসগো, কার্ডিফ, লিভারপুল এবং লন্ডনের মতো ডক অঞ্চলীয় শহরে চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অবশিষ্ট প্রাক্তন সিলেটি নাবিকরা স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল। স্বদেশে ফিরে গেলেও অনেকে সমুদ্র এবং ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। ভারতের তুলনায় ব্রিটেনে বেতন কাঠামো অনেক ভালো হওয়ায় স্বদেশে আগত নাবিকেরা তাদের পুরনো সাহেবী স্যুট প্যান্ট পরিধানের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে নিয়ে ব্রিটিশ জাহাজে নাবিক হিসাবে কাজ করার জন্য তাদের পুরনো পরিচয় পত্র নিয়ে ব্রিটেনে ফিরে গিয়েছিল।[৩৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সাবমেরিন বহর ব্রিটিশ জাহাজ চলাচলে অবরোধ আরোপ করেছিল। যুদ্ধ সম্প্রসারণের সাথে সাথে সিলেটি নাবিকদের দলবদ্ধতা আরও শক্ত হয়ে ওঠেছিল। পিতা-পুত্র, ভাই, চাচা-ভাতিজা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সবাই একসাথে জাহাজে কর্মসম্পাদন করত যার ফলস্বরূপ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ এসকল ক্রুদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক ও জোরালো মনোবল বিদ্যমান ছিল। তবে অত্যাধিক ঘনিষ্ঠতা কখনো কখনো বিপর্যয়কর ফলাফলও নিয়ে আসে। নিয়ামতপুরের বাসিন্দা মহম্মদ আলি এবং তার চাচা দুজনেই একই ডুবন্ত জাহাজে ছিল। এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ডুবন্ত জাহাজে অবস্থানকারী অন্যান্য নাবিকেরা যখন লাইফ বোট এবং নিরাপত্তার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করছিল তখন মহম্মদ আলি ও তার চাচা একে অপরকে খুঁজতে খুঁজতে পিছনে রয়ে গিয়েছিল, যারফলে জাহাজ ডোবার

সঙ্গে সঙ্গে এই দুজন চাচা-ভাতিজা সলিল সমাধি হয়ে গিয়েছিল। এরকম আরও একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল, কুশিদ আলি ও তার ভাই অন্য একটি জাহাজে ছিল যেটিতে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। জাহাজটি যখন জ্বলছিল তখন জাহাজের অন্যান্য ক্রুরা জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে লাইফ বোটে উঠে নিজেদের জীবন রক্ষা করেছিল। কুশিদ আলি এই লাইফ বোটের একটিতে ছিল, কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে ভাইকে দেখতে না পেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং ডুবন্ত জাহাজের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করেছিল। এরকম অনেক ঘটনাবলীর কথা সিলেটের নাবিকেরা স্মৃতিচারণা করে পরিবারবর্গের কাছে ব্যক্ত করেছিল।[৩৮]

১.৪. বাংলার সিলেটিদের জাহাজে নাবিক হিসাবে যোগদান এবং অভিবাসন লাভের ঘটনা:

বাংলার যে সমস্ত জেলাগুলি থেকে নাবিকদের অভিবাসী হতে দেখা গিয়েছিল তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের সিলেট ছিল অন্যতম। এই স্থানটি পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত) দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরবর্তী হওয়া সত্বেও আশ্চর্যভাবে এই এলাকার অধিক সংখ্যক মানুষ নাবিক রূপে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। এদের বহির্বিশ্বে যাত্রারত জাহাজগুলিতে উৎসাহের সহিত কর্মসম্পাদন করতে দেখা গিয়েছিল। এরা ছিল জাহাজের কাজে কর্মদক্ষ, কষ্টসহিষ্ণু, কঠোর পরিশ্রমী এবং অদম্য সাহসিকতাসম্পন্ন নির্ভীক প্রকৃতির মানুষ। তাই বহির্বিশ্বে বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়েও এই নাবিকদের সংখ্যাটি নিম্নমুখী হতে দেখা যায়নি। ব্রিটিশদের ভারতে আসার পূর্ব থেকেই এই সিলেটিরা বাণিজ্যতরী নির্মাণ করে সুর্মা, কুশিয়ারা নদী হয়ে বিভিন্ন প্রণালীর (channel) মধ্যদিয়ে মেঘনা নদীপথে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর পার হয়ে দূর দেশের সহিত বাণিজ্য করত। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় বহুকাল পূর্ব থেকে এদের সমুদ্রের প্রতি একটি অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। পাহাড়, অরণ্য, বিস্তীর্ণ জলাভূমি এবং নদনদী সবকিছু মিলিয়ে সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল বেশ আকর্ষণীয়। এরা নিকটবর্তী বনাঞ্চলের উন্নতমানের কাঠ দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাণিজ্যতরী নির্মাণ করতে পারত। রবার্ট লিন্ডসে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট যিনি সিলেটের চীফ ম্যাজিস্ট্রেট পদে ১২ বছর থাকার পর তার আত্মজীবনীতে ঢাকা হয়ে নদীপথে সিলেট পৌঁছানোর বিবরণ ও সিলেট সম্বন্ধে বহু ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ অফিসারগণ ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় লিপ্ত থাকতেন। লিন্ডসে সিলেটের স্থানীয় কারিগর দিয়ে সুন্দর জাহাজ নির্মাণের ব্যবসা করতেন যেগুলি মালাক্কা প্রণালী হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্য করত। এখানকার বিখ্যাত উৎকৃষ্ট মানের চুনাপাথর, চাল, চা, পাট

ইত্যাদি কলকাতা বন্দর হয়ে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত। ঔপনিবেশিক ভারতের অন্যান্য খনি শিল্পের মতো এখানকার চুনাপাথরের খনিগুলি আর্মেনিয়ান, গ্রীক ও ব্রিটিশদের মালিকানাভুক্ত ছিল।[৩৯] এইভাবে বহির্বিশ্বে বহির্বাণিজ্যের সূত্র ধরে সিলেটের অধিবাসীদের জাহাজে নাবিকের কাজে অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নদীপথ বাণিজ্যে দেশীয় নৌকার পরিবর্তে বাষ্পীয় জলযানের ব্যবহারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও সুলভ হয়েছিল যার ফলে সিলেটি বণিকরা আসাম, সিলেট, কলকাতা ও বহির্বিশ্ব ব্যবসায় অধিকতর তৎপর হয়ে উঠেছিল। পলতোলা দেশীয় নৌকা ও জাহাজের তুলনায় বাষ্পীয় জলযানে অধিক সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হওয়ায় জাহাজ নির্মাণ কর্মে দক্ষ সিলেটিরা (কৃষি ও অন্যান্য কাজে লিপ্ত ঔপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত যুবক) তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় দলে দলে জাহাজে নাবিকের কাজে যোগদান করার জন্য কলকাতা বন্দর ও খিদিরপুরের ডক অঞ্চলে ভিড় করেছিল। এখানে আসার পর কেউ ডক কর্মী, কেউ জাহাজ নির্মাণ কাজে, কেউ বিদেশগামী জাহাজে নাবিকের কাজে লিপ্ত হয়েছিল। অবস্থাপন্ন স্বচ্ছল ও ধনী শ্রেণীর লোকেরা অনেক সময় নাবিকের কাজে যোগদান করার আশায় থাকা যুবকদের সুদে টাকা ধার দিত। এই সকল মহাজন এবং বিভিন্ন জাহাজে নাবিকের কাজে নিযুক্ত করে দেওয়ার জন্য দালাল শ্রেণীর লোকজন বন্দর নগরীতে বসবাস করতে শুরু করেছিল।[৪০]

বাংলার সিলেট জেলার ঝিগলী গ্রামের বাসিন্দা ওয়ারিদ আলি (Warid Ali) একটি বিদেশী জাহাজে ৫ বছর ধরে কোলম্যানের কাজ করেছিল। তার পরিবারের বাবা এবং ভাই দাদারা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং ওয়ারিদ আলির গ্রামের আরও সঙ্গী সাথীরা যারা জাহাজের কাজে গিয়েছিল তাদের অনেকেই কৃষক পরিবারের সন্তান ছিল। শুধুমাত্র তার গ্রাম নয় পূর্ববঙ্গের যে সকল নাবিক জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল তাদের বেশিরভাগই ছিল কৃষক পরিবারের যুবক। ওয়ারিদ আলি যে জাহাজে কাজ করত তার নাম এবং জাহাজ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারেনি তবে কোলম্যানের কাজ খুব কষ্টকর হওয়ায় একটি আমেরিকাগামী স্টিমারে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ হলে সে নিউ ইয়র্ক বন্দর থেকে পালিয়ে গিয়ে ৪ বছর যাবৎ আমেরিকাতে বসবাস করেছিল। সেখানে সে বোম্বাই থেকে আমেরিকাতে আগত এক প্রবাসীর সহযোগিতায় ২২ ওয়াটারলু স্ট্রীটে একটি লজিং হাউসে থাকতে শুরু করেছিল। সে সেখানে বস্ত্রের নকসার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছিল। পরবর্তীকালে

আমেরিকান পুলিশ ওয়ারিদ আলিকে গ্রেফতার করে ২ সপ্তাহ জেলবন্দী করে এবং এরপর তাকে S. S. "Christian Hall" নামক জাহাজে ওয়ারিশ আলির সঙ্গে দেশে ফেরত পাঠায়। ওয়ারিশ আলির সঙ্গে ওয়ারিদ আলির কোনো পূর্ব পরিচয় ছিল না বলে জানা যায়। স্বদেশে ফিরে ওয়ারিশ আলি 26 Dent Mission Road, Kidderpore -এ Hafiz Tindal -এর লজিং হাউসে থাকতে শুরু করেছিল।[৪১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশকিছু বাংলার অভিবাসী নাবিকদের নির্বাসিত করেছিল। এই নির্বাসিতদের মার্কিন সরকার ১৯৪০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর S.S. "Santhia" জাহাজে আমেরিকা থেকে হংকংয়ে প্রেরণ করেছিল, এরপর এরা ১৯৪১ সালের ১৫ই জানুয়ারি কলকাতা বন্দরে এসে স্বদেশে ফিরেছিল। এখানে ১৩ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে ১০ জন নাবিক পূর্ববঙ্গের সিলেট জেলার অধিবাসী এবং বাকী ৩ জনের মধ্যে একজন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, একজন পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুর জেলার বাসিন্দা ছিল আর একজনের ঠিকানাটি জানা যায়নি। এখানেই বোঝা যাচ্ছে সিলেটিদের বহির্বিশ্বে বিচরণের সংখ্যাটা অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় ছিল অনেকটাই বেশি।[৪২]

সিলেট থেকে আগত নাবিকদের সঙ্গে বাংলার অন্যান্য জেলার নাবিকদের পার্থক্য ছিল। এরা সকলেই যে দরিদ্র অশিক্ষিত কৃষক পরিবারের ছেলে বা খেতমজুর ছিল তা নয়। বরং এদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল স্বচ্ছল মুসলিম পরিবারের শিক্ষিত যুবক। নতুন নতুন দেশকে জানার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় এরা মাতৃভূমি ছেড়ে সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিকের কাজ নিয়ে বিদেশে গিয়েছিল। বিদেশ ফেরৎ নাবিকদের কাছে সেসকল দেশের গল্প শুনে ও তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখে এলাকার কিশোর ও যুবকদের মধ্যে নাবিক হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। শিক্ষিত ও জ্ঞানী নাবিকদের "Master" বা "Poet" বলা হত। আয়ুব আলি মাস্টার একজন স্কলারশিপ পাওয়া মেধাবী ছাত্র যার পিতা নৌকার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ৬০০ টাকার মহাজনী ঋণে সুদ সমেত ৩০০০ টাকা পরিশোধ করে সর্বস্বান্ত হওয়ায় ২০ বছর বয়সে বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করে জাহাজে নাবিকের কাজে যোগ দিয়ে বিদেশে রওনা দিয়েছিল। তিনি কলকাতায় ফিরে এসে সীমেন্স ইউনিয়নের একজন নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নাবিক সংগঠনকে জোরদার করেছিলেন। পরে আয়ুব আলি International Labour Organization (ILO) এর একজন কর্মকর্তা হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে উচ্চবর্গের হিন্দুগণ ছিলেন ঋণদানকারী মহাজন এবং মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর মুসলিম

কৃষক ছিল ঋণগ্রহণকারী। কবি আব্দুস সামাদ চৌধুরী জাহাজের কাজে আসার পূর্বে সিলেটের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি জাহাজের কাজ ছেড়ে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন। আমেরিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগমন করলে সেখানে আয়ুব আলি মাস্টার ও আব্দুস সামাদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। হাসান আলি আমেরিকায় প্রথম ভারতীয় রেস্টুরেন্টের ব্যবসা আরম্ভ করেন। মুস্তফা জন আলি ও ইব্রাহিম চৌধুরী আমেরিকার নিউ ইয়র্কে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা বিবাহ করে সন্তান সন্ততি সহ বসবাস শুরু করেছিলেন।[৪৩] এভাবে সিলেটি নাবিকেরা বহির্বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের মেলে ধরেছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বাষ্পীয় জাহাজে সমুদ্র বাণিজ্য শুরু হলে জাহাজের তলদেশে ফারনেসের উত্তপ্ত অস্বস্তিকর নোংরা পরিবেশে ইঞ্জিন রুমের বিপদসংকুল স্থানে কাজ করার জন্য বহু নাবিকের প্রয়োজন হয়েছিল। এই সকল ঝুঁকিপূর্ণ কঠোর পরিশ্রমের কাজে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও সিলেটের লোকজন অধিক পরিমাণে যোগ দিয়েছিল। দুই বা তিন বছরের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত দক্ষিণ এশিয়ার এই নাবিকদের 'লস্কর' বলা হত। একই কাজের জন্য ইউরোপীয় নাবিকদের তুলনায় এদের মজুরী কম দেওয়া হত। নিম্নমানের খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে কম বেতন প্রদান করা, বর্ণ বিদ্বেষের মতো ঘটনা সবই তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছিল। এছাড়াও অনেক সময় লস্করেরা ইঞ্জিন রুম ও ফারনেসের গরম সহ্য করতে না পেরে সমুদ্রে ঝাঁপ দিত এমন ঘটনাও ঘটতে দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের (জার্মান) সাবমেরিনের আঘাতে জাহাজ ডুবে বহু লস্করের প্রাণহানি ঘটেছিল। নুরুল ইসলামের বর্ণনা অনুযায়ী থমাস ওয়ালটন জাহাজে এগারো জন মৃত নাবিকের মধ্যে সাত জন সিলেটি নাবিক ছিল।[৪৪]

সিলেটিরা আমেরিকা সহ পৃথিবীর বহু দেশে ও বড় বড় শহরে বসবাস শুরু করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে লন্ডনে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে তাদের আগমন ঘটেনি। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজগুলিতে লস্কর হিসাবে সিলেটিরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে নির্ভীকভাবে জাহাজের কাজকর্ম সচল রেখেছিল। এই অবস্থায় যাদের মৃত্যু হয়েছিল তাদের নাম লন্ডনে টাওয়ার হিল স্মৃতিস্তম্ভে খোদায় করা হয়েছিল। উপলব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে ৬,৬০০ জনের বেশি নাবিক তাদের দায়িত্ব পালনে প্রাণ হারিয়েছিল এবং ১০২২ জন আহত হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই আবার পঙ্গু হয়েছিল এবং ২১১৭ জন যুদ্ধবন্দী হয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিল। লন্ডনের

বণিক সভায় এবং পার্লামেন্টে লস্করদের বীরত্বের কথা আলোচিত হয়েছিল। যুদ্ধের পূর্ব থেকেই নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের কিছু লোক লন্ডনে বসবাস করত কিন্তু তারা লস্কর বা নাবিক ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলির জনগণের কাছে আবেদন করেছিলেন, আপনারা এখানে আসুন এবং দেশের পুনর্গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করে আমাদের সহায়তা করুন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সারা ব্রিটেন ব্যাপী সর্বপ্রকার শ্রমিকের চাহিদা প্রচন্ড হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল জাহাজে লস্করদের অবদান হেতু সিলেটিগণের ব্রিটেনে প্রবেশ ও সেখানে কর্মের সংস্থান করার বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। এই সময় একজন সাধারণ শ্রমিক সপ্তাহে দশ পাউন্ড পর্যন্ত রোজগার করত। মৌলভীবাজারের জরিফ মিঞা প্লেনে করে সিলেটি শ্রমিকদের ব্রিটেনে পৌঁছে দিত। কাজ করে রোজগার করার পর তারা প্লেন ভাড়া ও অন্যান্য খরচের টাকা পরিশোধ করত। সিলেটিরা লন্ডনে বহু রেস্টুরেন্টে ব্যবসা করত যেখানে ভারতীয় খাবারের খুব কদর ছিল। আয়ুব আলি মাস্টার আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে এক রেস্টুরেন্টে বাঙালি খাবারগুলি বিক্রি করত। লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে ব্রিক লেনে বেশিরভাগ সিলেটিদের বসবাসের স্থান "বাংলা টাউন" নামে পরিচিত ছিল।[৪৫] ব্রিটেনের সাহেবরা বাংলার পোলাও এবং কোর্মা খেতে খুব পছন্দ করত। সেই সুবাদে ব্রিটেনে বিভিন্ন প্রকৃতির বাঙালি রান্না করা খাবারগুলির কদর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এজন্য সিলেটি বাঙালিরা খাবারের রেস্টুরেন্ট, ফার্স্ট ফুডের দোকান এবং হোটেলে কাজ করে কর্মসংস্থান জুটিয়ে পরবর্তী সময়ে নিজেরাই এই হোটেল রেস্তোরাঁর মালিক হয়ে বিদেশে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটিয়েছিল। এইভাবে রান্নার সুদক্ষ কারুকার্যতার মধ্য দিয়ে অভিবাসী এই সিলেটি নাবিকেরা বাংলার রন্ধন সাংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে উন্নীত করেছিল।

১.৫. উপসংহার:

ঔপনিবেশিক সময়ে কলকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যদিয়ে বহু লস্কর জাহাজের কর্মসূত্রে স্থানান্তরিত হয়ে ভ্রাম্যমান জাহাজী শ্রমিক হিসাবে দেশান্তরিত হয়েছিল এবং এদের অনেকেই বহির্দেশে জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পেশা অবলম্বন করে অভিবাসী হয়ে জীবন কাটিয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতের কলকাতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমৃদ্ধ বন্দর নগর এবং এটি ১৫০ বছরেরও অধিক সময়কাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী শহর থাকায় সারা বিশ্বের সঙ্গে একটি বৃহৎ ব্যবসা ও বাণিজ্য ভিত্তিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করেছিল। নিম্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ জুড়ে

অসংখ্য ছোট বড়ো নদ-নদী প্রবাহিত হওয়ার ফলে নদী চ্যানেল পথে বাংলার অভ্যন্তরীণ নদী ঘাট থেকে কাঁচা পাট এবং অন্যান্য কৃষিজ বাণিজ্যিক পণ্য সম্ভার কলকাতা বন্দরে আনা হয়েছিল। বাংলার এই কাঁচা পাটের বহির্বিশ্বে খুবই কদর ছিল তাই এই কাঁচা পাট কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিদেশে রপ্তানি করা হত।[৪৬] সময় পরিবর্তনের সঙ্গে বাণিজ্যিক উন্নতি এবং শিল্পের বিকাশ ঘটলে শিল্পসমৃদ্ধ কলকারখানা, বন্দর এবং জাহাজে কাজের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন পড়েছিল। বাংলার বহু ভূমিহীন দিনমজুর, শিল্প হারা কারিগরি শিল্পীরা মফস্বল থেকে চলে এসে কলকাতায় বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজে যোগ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছিল। অন্যদিকে কলকাতা বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া ব্রিটিশ মালিকানাধীন জাহাজগুলিতে 'জাহাজী শ্রমিকের' অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এসকল দেশীয় নাবিকেরা লস্কর নামেও পরিচিত ছিল। এরা সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের পাটাতনে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছিল। এদের দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করে ভ্রাম্যমান জাহাজী নাবিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল।

বাংলার এই নাবিকদের একটা অংশ আমেরিকা, ইউরোপ মহাদেশ এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে দেশান্তরিত হয়ে জীবিকা পরিবর্তন করে অভিবাসী হয়েছিল। তবে আমেরিকাতে বাংলার নাবিকদের অভিবাসী হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলার চিকনদারদের অনেকখানি অবদান ছিল। নাবিকরা জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিদেশে জীবিকা পরিবর্তন করে ফেরিওয়ালা, রেস্তোরাঁ, ফার্স্ট ফুডের দোকান এবং কারখানার কাজে যোগ দিয়ে জীবনধারণ করেছিল। আবার অনেক সময় এই উন্নত দেশগুলিতে বাংলার নাবিকেরা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে বিদেশের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টিগুলি খুব সহজে অনুধাবন করতে পেরেছিল।

বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে জাহাজে কর্মরত বাংলার লস্করেরা শত্রুপক্ষের জাহাজ দ্বারা আক্রমণের ফলে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এই দুই বিশ্বযুদ্ধে জাহাজে বোমা নিক্ষেপ ও গোলাগুলির দ্বারা সংঘর্ষে ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজে কর্মরত বাংলার বহু নাবিক প্রাণ হারিয়েছিল। আবার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির শিকার হয়ে দেশীয় বাংলার অনেক নাবিকেরা আমেরিকা কিংবা ব্রিটেনে অভিবাসন লাভ করেছিল। উপমহাদেশীয় জাহাজ ব্রিটেন এবং আমেরিকার বন্দরে প্রবেশ করলে সে সময় কোনো নাবিক যাতে জাহাজ থেকে পালিয়ে না যায় সে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হত। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে শিপ মাস্টারদের সেভাবে নজরদারি

রাখা সম্ভব না হওয়ার ফলে মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যক নাবিক জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে অভিবাসন গ্রহণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছিল।

বাংলার বিপুল সংখ্যক সিলেটি নাবিকদের বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচরণ করতে দেখা গিয়েছিল। এরা বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটেন এবং আমেরিকাতে ব্যাপক সংখ্যায় অভিবাসী হয়েছিল। এদের হাতে তৈরি করা বাঙালি রান্না করা খাবারগুলি বিদেশীরা খুবই পছন্দ করত এজন্য এরা বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিতে রান্নার কাজে সংযুক্ত পান্থশালা, হোটেল, ফার্স্টফুডের দোকানে কর্মী কিংবা ব্যবসায়িক মালিক হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেছিল। এইভাবে ব্যাবসায়িক সূত্রে সিলেটি নাবিকেরা ধীরে ধীরে বিদেশে আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছিল। আফতাব আলি, আয়ুব আলি মাস্টার, সুরাত আলি, ইব্রাহিম চৌধুরী মতো এই সিলেটি নাবিকেরা বহির্বিশ্বে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদের বহির্দেশে কর্মকান্ডগুলি বাংলার নাবিকদের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। তবে সামগ্রিক ভাবে বাংলার নাবিকদের বহির্দেশে অভিগমন এবং অভিবাসী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের জাহাজের কাজে কর্মদক্ষতার বিষয়টি বেশ কার্যকরী ছিল কারণ এর সূত্র ধরেই নাবিকেরা বহির্বিশ্বে দেশান্তরিত হয়েছিল।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫ - ১৯৪৭,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৩, পৃ. ৩৩।

২। IB 75/27 (34/1927)

৩। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908–1924,* Calcutta, Publication date not known, Part – II, p. 13.

৪। Rozina Visram, *Asians in Britain, 400 years of History,* London, Pluto Press, 2002.

৫। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Appendix-XIII, pp. LXXXI, LXXXII.

৬। নির্বাণ বসু (সম্পাদনা), *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস,* শুভেন্দু শিকদার, *পরিবহন শ্রমিক ও বাংলা সাহিত্যঃ ১৮৭০ - ১৯৫০,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৪৮৬-৪৯১।

৭। Laura Tabili, *"We Ask for British Justice", Workers and racial difference in late imperial Britain,* New York, Cornell University Press, 1994, pp. 45-47.

৮। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-I, pp. 4-5.

৯। Gopalan Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870-1945,* New Delhi, Oxford University Press, 2012, p. 182.

১০। Rana, P. Behal and Marcel Van der Linden (edited), *India's Labouring Poor, Historical Studies, c.1600 – c.2000,* Ravi Ahuja, *Mobility and Containment: The Voyages of South Asian Seamen, c.1900 – c.1960,* New Delhi, Cambridge University Press India Pvt. Ltd., 2007, pp. 113-114.

১১। Vivek Bald, *Bengali Harlem, and the Lost Histories of South Asian America,* U.S.A., Harvard University Press, 2013.

১২। *Ibid.,* pp. 28-33.

১৩। *Ibid.,* p. 36.

১৪। *Ibid.,* p. 76.

১৫। *Ibid.,* p. 98.

১৬। *Ibid.,* pp. 160-162.

১৭। IB 429/27 (175/1927)

১৮। IB 429/27 (175/1927)

১৯। Gopalan Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870-1945,* New Delhi, Oxford University Press, 2012, p. 178.

২০। *Ibid.,* pp. 181-182.

২১। *Ibid.,* p. 180.

২২। IB 26E/29 (18/1929)

২৩। IB 26E/29 (18/1929)

২৪। IB 429/27 (175/1927)

২৫। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫ – ১৯৪৭,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৩, পৃ. ১৪৩ – ১৫১।

২৬। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ – ২০০০,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১০৮।

২৭। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-III, p. 55.

২৮। *Ibid.,* p. 55.

২৯। *Ibid.,* p. 55.

৩০। *Ibid.,* p. 55.

৩১। *Ibid.,* p. 56.

৩২। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-I, p. 1-2.

৩৩। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: Development 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-III, p. 53.

৩৪। Gopalan Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870-1945,* Oxford University Press, New Delhi, 2012, p. 178.

৩৫। Ashfaque Hossain, "The World of the Sylheti Seamen in the Age of Empire, from the late eighteenth century to 1947," *Journal of Global History,* Vol. 9, 2014, p. 438.

৩৬। *Ibid.,* pp. 438-39.

৩৭। Ashfaque Hossain, *Colonial Globalization and its Effects on South Asia, Eastern Bengal, Sylhet and Assam, 1874 – 1971,* New York, Routledge, 2023, p. 141.

৩৮। *Ibid.,* p. 141.

৩৯। *Ibid.,* pp. 122-124.

৪০। *Ibid.,* p. 126.

৪১। IB 429/27 (175/1927)

৪২। IB 429/27 (175/1927)

৪৩। Ashfaque Hossain, *Colonial Globalization and its Effects on South Asia, Eastern Bengal, Sylhet and Assam, 1874 – 1971,* New York, Routledge, 2023, p. 131-132.

৪৪। *Ibid.,* p. 142.

৪৫। *Ibid.,* p. 145.

৪৬। Dipesh Chakrabarty, *Rethinking Working-Class History, Bengal 1890 – 1940,* New Jersey, Princeton University Press, 1989, p. 17.

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার নাবিকদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন, সমাবেশ এবং ধর্মঘট (১৯২০-১৯৪৭)

১.১. ভূমিকা

সাম্রাজ্যবাদীদের ধারক এবং বাহক রূপে পুঁজিশক্তির শোষণ ছিল ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য। যেখানে ভারতীয় উপমহাদেশে পুঁজিপতি মালিক শ্রেণীর দ্বারা শ্রমিক এবং কৃষকদের উপর অবাধ শোষণ হতে দেখা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতের প্রাথমিক পর্বে শ্রমিক আন্দোলনগুলি ছিল মূলত অসংগঠিত এবং বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির। এর ফলস্বরূপ এই শ্রমিকেরা তাদের কাঙ্খিত দাবিদাওয়াগুলি ব্যবসায়ীক পুঁজিপতিদের সম্মুখে আন্দোলনের মধ্যদিয়ে উত্থাপিত করতে পারেনি। পুঁজিশক্তি এবং দেশীয় সুবিধাভোগী দালালরা অসংগঠিত শ্রমিকদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতারিত করে ক্রমাগত শোষণ করেছিল। ১৯১৪ সালের পূর্বে কদাচিৎ স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক ধর্মঘট হতে দেখা গিয়েছিল, যদিও কোনো শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়নি। তবে এন. এম. লোখান্ডে ১৮৮১ ও তার পরে বোম্বাইতে শ্রমিকদের উন্নতিকরণের জন্য প্রচেষ্টা চলিয়েছিলেন।[১] ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর কলকাতায় হুগলী নদীর দুই তীরে গড়ে ওঠা শিল্পগুলির মধ্যে পাটশিল্প এবং কার্পাস বস্ত্রশিল্প ছিল অন্যতম। এই শতকের শেষভাগে বাণিজ্যিক তৎপরতার জন্য শিল্পকারখানাগুলিতে অসংখ্য শ্রমিকের কর্মসম্পাদন হতে দেখা গিয়েছিল। কারখানার মালিকদের অধিক মুনাফা লাভের জন্য অহরহ শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিকের অতিরিক্ত সময়কালীন শ্রম, শ্রমের নিরিখে অপর্যাপ্ত বেতন এবং সর্দার বা দালালদের শ্রমিকদের কাছ থেকে বকশিশ হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ বা ঘুষ নেওয়ার ফলে শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তারা সংগঠিত হওয়ার পথ খুঁজেছিল। পরবর্তীকালে বাংলায় পাটশিল্প এবং কার্পাস বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। এই শিল্প কারখানার শ্রমিক ব্যতীত হাতে টানা রিক্সা থেকে শুরু করে রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, বন্দর এবং জাহাজে পরিবহন শ্রমিকেরাও শোষিত এবং শাসিত হয়েছিল। এই শ্রমিকেরাও সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিভিত্তিক মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ধর্মঘট এবং হরতাল ডেকে কর্মবিরতির মধ্যদিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

বিংশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বে দীর্ঘ সময়কালীন ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলার ভঙ্গুর অর্থনৈতিক দৈন্যদশা পরিলক্ষিত করা গিয়েছিল। এর সঙ্গে রাজনৈতিক উত্তেজনা, বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা, জাতিগত ভেদাভেদ, সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিষয়গুলি জুড়ে গিয়ে বাংলায় অস্থির অবস্থা তৈরি হয়েছিল। এর কিছু পরে বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ঔপনিবেশিক শোষণকে তরান্বিত করেছিল যা বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বিশেষত এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপন্থী হয়ে বাংলার বহু নিম্নবৃত্ত কৃষক, দিনমজুর সহ বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্র শ্রমিকেরা একত্রে সামিল হয়ে আন্দোলন এবং ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে তাদের দাবিদাওয়া উত্থাপিত করেছিল। এই আন্দোলন এবং ধর্মঘটকে পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কর্মগত ক্ষেত্র বিন্যাসে বাংলায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলি বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ১৯০৭ - ১৯০৮ সালের সময়কালের মধ্যে ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাসোসিয়েশন (Indian Telegraph Association), পোস্টাল ক্লাব (Postal Club) এবং ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান (Indian Seamen's Anjuman) মূলত এই তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। তবে কিছুকালের মধ্যেই এই গড়ে ওঠা ইউনিয়নগুলি অস্তিত্ব হারিয়েছিল। এই ইউনিয়নগুলি নানারকম উত্থান পতনের মধ্যদিয়ে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পরিপক্ক ইউনিয়ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[২] এই তিনটি ইউনিয়নের মধ্যে ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান নামক ইউনিয়নটি উত্থান পতনের মধ্যদিয়ে কীভাবে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন রূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল সেই বিষয়টি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির গড়ে ওঠার উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন এটি সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিশক্তির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে দেশীয় ব্যবসাদার এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এই প্রতিযোগিতার দরুন অনেক সময় দেশীয় ব্যবসাদারদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দেশীয় ব্যবসাদারদের ধারণা ছিল শ্রমিকদের দ্বারা ইউনিয়ন গঠনের মধ্যদিয়ে পরবর্তী সময়ে ধর্মঘট এবং সভা সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলনগুলি জোরালো করে বিদেশী পুঁজিপতি এবং শিল্পপতিদের কাবু করা সম্ভব হবে।[৩] বিশেষত এই কারণে অপরিপক্ক ইউনিয়নগুলিকে সচল রাখার জন্য দেশীয় ব্যবসায়ীরা অর্থের জোগান দিয়ে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করেছিল যাতে করে ইউনিয়নের আওতাভুক্ত সংগঠিত শ্রমিকদের বিদেশী

পুঁজিশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ক্ষিপ্র করে তোলা যায়, এরফলে দেশীয় এবং ইউরোপীয় ব্যবসাদারদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় আর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। এই উদ্দেশ্যকে প্রণোদিত করার জন্য বাংলার দেশীয় ব্যবসাদারেরা শ্রমিকদের দ্বারা সংগঠিত সমাবেশ এবং আন্দোলনকে মদত দিয়েছিল, আবার অর্থ সংকটে পরিমিত অর্থ দিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে ধর্মঘট এবং আন্দোলনকে সফলতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পর থেকে বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনগুলি পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিল। বাংলায় পাট, কার্পাস বস্ত্র, চা-বাগিচা, লৌহ-ইস্পাত, খনি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, বন্দর, ঠিকা, নির্মাণশৈলী, নারী শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে বহু আলোচনা হতে লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে এই শ্রমিকদের ধর্মঘট, আন্দোলন এবং সমাবেশের বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে পুঁজি শোষণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিষয়টিও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উপরিউক্ত ক্ষেত্র শ্রমিকদের গড়ে ওঠা ইউনিয়নগুলিও শ্রমিকদের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রান্ত হওয়ার পর শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ, ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘ ILO (International Labour Organization) প্রতিষ্ঠা লাভ এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (AITUC) আবির্ভাবের ফলে শ্রমিকদের নতুন উদ্যমে জাগ্রত হতে দেখা গিয়েছিল। এর সঙ্গে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং নৌ-বিদ্রোহের মতো জাতীয় স্তরের আন্দোলনগুলি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। অন্যদিকে ১৯২০ সাল নাগাদ কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব শ্রমিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল যদিও ভারতে এসময় শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র কোনো রাজনৈতিক বা কমিউনিস্ট দল গড়ে ওঠেনি। এর পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে অধিকাংশ শ্রমিক আন্দোলনগুলি বামপন্থী কমিউনিস্ট ধারায় বাহিত হয়ে শ্রমিক স্বার্থের সহায়ক হয়ে পুঁজিশক্তির শোষণ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল।[৪]

১৮৭০ সালে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গঠনের পর বাণিজ্যিক উন্নতিসাধনের জন্য ঊনবিংশ শতকের আটের দশকের পর থেকে কলকাতা বন্দরের সঙ্গে সংযোগরত বহির্দেশীয় মালিকানাধীন জাহাজগুলিতে ব্যাপক সংখ্যক বাংলার নাবিকদের কাজকর্ম করতে দেখা

গিয়েছিল।[৫] এসকল নাবিকেরা মূলত অধিকাংশ ছিল পূর্ববঙ্গের সিলেট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহের নিম্ন ও মধ্যবৃত্ত মুসলিম কৃষক পরিবারের, এরা বংশ-পরম্পরায় জাহাজের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, এসকল নাবিকদের দেখে উৎসাহিত হয়ে কলকাতা সংলগ্ন নিম্ন গাঙ্গেয় জেলাগুলির মানুষ জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল।[৬] জাহাজের কাজে যুক্ত বাংলার এই নাবিকদের খালাসী, লস্কর, সুখানী নামে অভিহিত করা হত। বাংলার নাবিকদের জাহাজ কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সময় ঘাট-সারেংদের উৎকোচ সংগ্রহ দ্বারা শোষণ, অসমুচিত বেতন, ইউরোপীয় এবং দেশীয় নাবিকদের বর্ণগত ভেদাভেদ এবং কর্মগত বিভাজনের শিকার হতে দেখা গিয়েছিল। এছাড়া বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে হতাহত নাবিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রদানের জন্য সংগঠিত নাবিকেরা আন্দোলন, ধর্মঘট এবং সমাবেশের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

১.২. বাংলার নাবিকদের উত্থাপিত দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া:

বাংলার নাবিকদের সংগঠিত রূপে আত্মপ্রকাশের ফলস্বরূপ বন্দরকেন্দ্রিক ধর্মঘটগুলি ক্রমপর্যায়ে হতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ধর্মঘটগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলায় গড়ে ওঠা সীমেন্স ইউনিয়নগুলির অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ইউনিয়নগুলির মধ্যে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU), বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন, ন্যাশনাল সীমেন্স ইউনিয়ন ছিল উল্লেখযোগ্য তবে এই ইউনিয়নগুলির মধ্যে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন বৃহত্তর ইউনিয়ন রূপে নাবিক স্বার্থে অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছিল। এই ISU সংগঠিত নাবিকদের ধর্মঘটের দিকটি বিচার বিশ্লেষণ করে কখনো মধ্যস্থতা আবার কখনো জোরকদমে আন্দোলনের মধ্যদিয়ে নাবিকদের সঠিক দিশা দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার নাবিকদের দ্বারা সংগঠিত ধর্মঘটগুলির লক্ষ্য ছিল ঘাট-সারেংদের মতো দালাল শ্রেণীর উৎখাত করা, উপযুক্ত বেতন কাঠামোর দাবি এবং কর্মের সঠিক সময় নির্ধারণ করা। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত নাবিকদের চরম দুর্দশায় পতিত করেছিল। বহির্বিশ্বে কর্মকালীন সময়ে শত্রুপক্ষের জাহাজ দ্বারা ব্রিটিশ জাহাজের উপর আক্রমণের ফলে বাংলার বহু নাবিক আহত, নিহত এবং নিরুদ্দেশ হয়েছিল। এই ক্ষতিগ্রস্ত নাবিকেরা এছাড়া মৃত নাবিকদের পরিবার যাতে যথাযথ পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায় তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল। অন্যদিকে আফিম ও ড্রাগ চোরাচালানকারী, কিছু ট্যাক্সি ক্যাবের মালিক এবং জাহাজের দালাল শেখ সামির ১৯২০ সালে আঞ্জুমান-ই-জাহাজাইন নামক ইউনিয়নটি গড়ে তুলেছিল। এই ইউনিয়নে A. H. Zaherala, Muhammad Yasin,

Muhammad Isac Chaudhuri, Abdul Rahaman, Abdul Majid এসকল গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ইউনিয়নের নামে মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নাবিকদের সামাজিক যোগাযোগের পরিসর বৃদ্ধি করা এবং তাদের স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখা কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের কার্যক্রমকে স্তব্ধ করা। পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের সংগঠকরা আঞ্জুমান-ই-জাহাজাইনের সভাপতি ও সংগঠক শেখ সামির সহ জাহাজ দালালদের বরখাস্ত করেছিল।[৭] ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নটি (ISU) নাবিক স্বার্থে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন রূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল।

ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) নাবিকদের সংগঠিত করে ধর্মঘট এবং আন্দোলনগুলিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে অর্থের চাহিদা মেটানোর জন্য ইউনিয়ন সদস্যদের কাছে নূন্যতম পরিমাণ চাঁদা ধার্য করেছিল। যে সকল সদস্যরা কোনো চাঁদা প্রদান করেনি তাদের মধ্যে পুঁজিবাদ বিরোধী বা মুনাফা ভাগাভাগির বিষয়টি সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় বাঞ্ছনীয়।[৮] যদিও সদস্যদের এই বিষয়টি আপত্তি হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ এটি তাদের স্বার্থে নিয়জিত করা হয়েছিল। ১৯২৬ সালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নের অ্যাক্ট দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছিল, এটি ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট-ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, অ্যামস্টারডাম, হল্যান্ড এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (AITUC) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছিল। এই ইউনিয়নের কিছু সংবিধান এবং নিময় তৈরি করা হয়েছিল, ৬ নং নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন সদস্যদের বিভিন্ন স্কেলে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সদস্য চাঁদা গ্রহণ করার বিষয়টি উল্লেখিত ছিল।[৯] বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে থেকে নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত নাবিকদের আন্দোলনগুলি ছিল পুঁজি এবং জাহাজ মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রজ্যবাদী শক্তির ব্যাপক শোষণের ফলে এই আন্দোলনগুলি জাতীয়তাবাদী রূপ ধারণ করে পুঁজি শোষণের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর বাংলায় কলকাতা শহরকেন্দ্রিক বন্দর এবং জাহাজ শ্রমিকদের নিয়ে ১৯২০ সালের পর বেশকিছু পরিপক্ক ইউনিয়ন গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল যে ইউনিয়নগুলি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) –এর সমসাময়িক ছিল। এই ইউনিয়নগুলির মধ্যে পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লইয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (Port Trust Employees' Association) নামক ইউনিয়নটি ১৯২০ সালে কলকাতার খিদিরপুরে ৩০ নং রাম কমল মুখার্জী স্ট্রীটে গড়ে উঠেছিল। আঞ্জুমান-ই-জাহাজাইন (Anjuman-i-Jahajian) নামক ইউনিয়নটি ১৯২০ সালে

শেখ সামিরের নেতৃত্বে কলকাতার ৩৭ নং কর্পোরেশন স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইন্‌ল্যান্ড স্টিমশিপ অ্যান্ড ফ্ল্যাট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (Inland Steamship and Flat Employees' Association) নামে ইউনিয়নটি ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে মহম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে কলকাতার তালতলায় ৩৩/১ নং আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন (The Indian National Seamen's Union) নামক ইউনিয়নটি Mr. R. Braunfield -এর সভাপতিত্বে 4A, Radha Bazar Lane -এ ১৯২০ সালের ৪ঠা জুলাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।[১০] এই ইউনিয়নগুলি জল পরিবহন শ্রমিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। কলকাতা শহরকেন্দ্রিক এই শ্রমিকদের সংগঠিত হয়ে তাদের শ্রমিক স্বার্থ অটুট রাখার জন্য পুঁজি এবং মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের ফলস্বরূপ ইউনিয়নকে অবলম্বন করে ধর্মঘট ও হরতাল ডেকে আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শোষণ এবং এর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে অর্থনৈতিক মন্দার জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্রের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি নিম্নবৃত্ত নাবিকদের গভীরভাবে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল যার ফলশ্রুতিতে নাবিকেরা ১৯১৯ সালের জুনে ধর্মঘট করেছিল এবং জাহাজ কর্মে সমুদ্রযাত্রার জন্য স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিল। নাবিকদের অভাব অভিযোগের বিষয়টি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের (ISU) হস্তক্ষেপে শিপিং কোম্পানি এবং শিপিং মাস্টারদের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এরফলে গভার্মেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে শিপিং মাস্টাররা সমুদ্রগামী স্টিমার-লাইনগুলিতে কর্মরত নাবিকদের বেতন বৃদ্ধি করতে রাজি হয়েছিল।[১১] নিম্নে ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বেতন কাঠামোর পরিবর্ধিত তালিকাটি দেওয়া হল –

সারণি সংখ্যা: ২

ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমুদ্রগামী স্টিমার লাইনের সম্মতিতে ১৯১৯ সালের জুলাই –এ শিপিং মাস্টার কর্তৃক অনুমোদিত পরিবর্ধিত মজুরি বৃদ্ধির হার

DECK STAFF

Ratings.	Rate in 1914	Present rate
Deck serang	Rs. 35/-	Rs. 60/-
Seacunney	35/-	55/-

Tindal	28/-	37/-
2nd. Tindal	24/-	30/-
Cassab	22/-	30/-
Winchman	21/-	28/-
Lascars	16/- (average)	18/--25/-
Bhandary	14/-	25/-
Topas	14/-	22/-

ENGINE ROOM STAFF.

Ratings.	**Rate in 1914**	**Present rate**
Engine Serang	Rs. 35/-	Rs. 60/-
1st. Tindal	26/-	35/-
2nd. Tindal	24/-	30/-
3rd. Tindal	22/-	28/-
Cassab	24/-	28/-
Donkeyman	23/-	28/-
Oilman	20/-	26/-
Firemen	17/-	23/-
Trimmer	12/-	18/-
Bhandary	17/-	25/-
Topas	14/-	22/-

SALOON DEPARTMENT.

Rating. 1914	Passenger Steamer Present rate.	Cargo Line Present rate.
Butler incharge ….	Rs. 80/-	….
Butler under Steward …	75/-	….
Baker mate …	30/-	….
Baker …	70/-	….
Chief cook …	70/-	….
2nd Cook Rs. 25/-	40/-	Rs. 40/-
3rd Cook …	25/-	…
4th Cook	20/-	…
Chief cook & Baker 50/-	75/-	75/-

Saloon Boy 18/-	32/- B.I. Rs, 33/-	35/-
Half Saloon Boy…	15/-	…
Captain's boy 18/-	32/- B.I. 30/-	35/-
Chief Engineer's boy 18/-	32/- 30/-	35/-
Officer's Boy 18/-	32/- 30/-	35/-
Marconi Boy	30/-	
Mess Room Boy	33/-	
Mess Room Mate	16/-	
Butcher	45/- to Rs. 50/-	
Butcher's Mate	25/-	
Scullion	24/-	
Topas 14/-	22/-	
Pantryman 1st Class	40/-	37/-
Pantryman 2nd Class	35/-	
Pantryman Mate	20/-	
2nd Class Butler	50/-	

সূত্র: এটি মহম্মদ দাউদের লেখা *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924* গ্রন্থে Appendix I এর page I এবং II থেকে নেওয়া হয়েছে।

শিপিং কোম্পানিগুলো ১৯১৯ সালে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত ধর্মঘটের কারণে মজুরি বৃদ্ধির জন্য কিছুটা হার মেনে নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নাবিকদের সন্তুষ্ট করার জন্য এই মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি যথোপযুক্ত ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে আবার সেই সঙ্গে নাবিকদের জাহাজে চড়ে জাহাজ কর্মগুলি সম্পাদন করার সময় যে অকথ্য কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা প্রতিদানে তাদের শ্রম বিবেচনা সুলভ বেতন প্রদান করেনি। জাহাজগুলিতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে মজুরির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল, ১৯১৯ সালে তথাকথিত মজুরি বৃদ্ধি সত্বেও কলকাতার নাবিকদের বেতন বোম্বের নাবিকদের তুলনায় অনেকাংশই কম ছিল। বাংলার নাবিকদের এসকল বঞ্চনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ১৯২১ সালের ৯ই মার্চ ISU নাবিকদের ন্যায্য অধিকারের দাবিগুলি তুলে ধরে একটি সাধারণ সভা ডেকে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং একটি রেজোলিউশন পাশ করে যেখানে নাবিকদের মজুরি ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছিল।[১২]

জেনেভা ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সের খসড়া কনভেনশন ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি দেখে ISU বোম্বে সীমেন্স ইউনিয়ন এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাথে আলোচনার পর বোম্বেতে কিছু প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। ভারত সরকারের উল্লিখিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ইউনিয়নগুলি যৌথভাবে প্রতিবাদ করেছিল। মিঃ মহম্মদ দাউদ, সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দ মিন্নাত আলি, কোষাধ্যক্ষ এবং যুগ্ম সম্পাদক সমুদ খানকে প্রতিনিধি হিসাবে বোম্বেতে পাঠানো হয়েছিল। মিঃ দাউদ বোম্বে সীমেন্স ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ জোসেফ ব্যাপ্টিস্টা এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিঃ দেওয়ান চমন লালের সাথে একটি সম্মেলনে বোম্বেতে একটি প্রতিনিধি সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন এবং বোম্বে লেবার ফেডারেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬.১০.১৯২১ তারিখে বোম্বেতে একটি মাড়োয়ারি বিদ্যালয় হলে যৌথভাবে প্রতিবাদ করার জন্য একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে মিঃ ব্যাপ্টিস্টার সভাপতিত্বে, মিঃ এ. এম. মাজরেলো (জেনেভা কনফারেন্সে সীমেন্স ইউনিয়নের প্রতিনিধি) নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন – "ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় নাবিকরা এই বৈঠকে ভারত সরকারের বৈরী মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানিয়েছিল। জেনেভা সম্মেলনে রেজোলিউশন অনুমোদন না করার কারণে এই ধরনের মনোভাবের জন্য ভারতীয় নাবিকরা ইউরোপীয় কমরেডদের তীব্র বিরোধিতা করে এবং আন্তরিকভাবে সুপারিশ করে যে সরকারকে দেরি না করে দ্রুত আইন প্রণয়ন করা উচিত, খসড়া কনভেনশন এবং ইন্টারন্যাশনাল সীমেন্স কনফারেন্সে সুপারিশগুলিকে উন্মোচিত করা উচিত"। কলকাতার ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি মিঃ মহম্মদ দাউদ এবং কলকাতার অন্যান্য প্রতিনিধিরাও রেজোলিউশনের প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছিলেন। তদন্ত কমিটিতে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের অর্ধেক প্রতিনিধিত্বের সুপারিশকারীরা প্রবিধানগুলি জেনেভায় ভারতীয় শ্রম প্রতিনিধি মিঃ এন. এম. যোশীর কাছে একটি বেতার পাঠানোর কথা বলে, যাতে জেনেভায় শ্রম অফিসের সামনে নাবিক সংগঠনগুলির হয়ে প্রতিবাদ জানানো যায়। মিঃ ব্যাপ্টিস্টা এবং দেওয়ান চমনলাল সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করেন এবং তারা একটি সীমেন্স কনফারেন্সের আহ্বান জানান। জেনেভা ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সকে সমর্থন না করার জন্য ভারত সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখে Mr. K. Ahmed (Bar-at-

law) –এর সভাপতিত্বে হাজার হাজার নাবিকদের উপস্থিতিতে কলকাতায় দুটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি তালতালায় এবং অন্যটি খিদিরপুরে।[১৩]

সমস্ত শিপিং কোম্পানিগুলিকে এই রেজোলিউশন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল কিন্তু তারা তাতে সাড়া দেয়নি। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার নাবিকরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এবং তাদের অসন্তোষ একটি বড় ধর্মঘটের রূপ নিতে শুরু করে। ইউনিয়ন তাদের একটি সাধারণ ধর্মঘট থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করেছিল এবং তাদের এই বিষয়ে ধৈর্য ধরতে বলেছিল। ১৯২২ সালের জুন মাসে কলকাতার নাবিকরা আসলে একটি সাধারণ ধর্মঘট করেছিল। ইউনিয়ন একটি সমঝোতা বোর্ড গঠনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিল কিন্তু এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। বেঙ্গল লেবার ইন্টেলিজেন্স অফিসারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল যিনি ১৯২২ সালের ২২শে জুন তার 104-L-I-O নং পত্রে ইউনিয়নকে জানিয়েছিলেন যে ট্রেড এবং শিপিং কোম্পানিগুলির অবস্থা তখন একটি হতাশাজনক পরিস্থিতিতে ছিল কাজেই তাদের বেতন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বর্তমানের জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত। শিপিং কোম্পানিগুলোর আর্থিক দুরাবস্থার বিষয়টি নাবিকদের বুঝিয়ে দেওয়ায় পর তারা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ভালো সময় এলে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস পায় এবং ১২ দিন ধরে ধর্মঘটের পর আবার কাজ শুরু করেছিল।[১৪]

১৯২৪ সালে নাবিকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা নতুন করে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, ইউরোপীয় নাবিকেরা বাংলার নাবিকদের সাথে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিল সেটি বাংলার নাবিকদের পক্ষে যথেষ্ট অপমানজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই অসাম্যমূলক আচরণের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যেখানে একজন ইউরোপীয় ফায়ারম্যান ৯ পাউন্ড বেতন পেত সেখানে একজন ভারতীয় ফায়ারম্যান পেত মাসিক ২৩ টাকা মাত্র। ইউরোপীয় নাবিকদের উচ্চমূল্যের ভাতা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান এছাড়া বেতনের এত পার্থক্য কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। বাংলার নাবিকরা এই বৈষম্যজনিত পার্থক্যের বিষয়টি খুব গভীরভাবে অনুভব করেছিল। এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণকে বিদায় না দিলে অদূর ভবিষ্যতে বিষয়টি কোন দিকে প্রবাহিত হবে তা জানা ছিল না।[১৫]

১৯২৬ সালে ISU ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টের মাধ্যমে রেজিস্ট্রিকৃত হওয়ার পর কিছু নিয়ম নির্ধারণ করেছিল যেখানে ৪ নং নিয়মে সদস্য নিয়োজিত হওয়ার বিষয়টি বলা

হয়েছিল, যে সমস্ত নাবিক ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে নিয়োজিত হবে তাদের বয়স কমপক্ষে ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতি, বর্ণ এবং ধর্ম নির্বিশেষে নৌপরিবহন, জল পরিবহন বাণিজ্যে বা যে কোনও উপায়ে নিযুক্ত অভ্যন্তরীণ জল, পোতাশ্রয়, ডকইয়ার্ড, জেটি, ঘাট, এবং ওয়ার্ক-শপ এই সকল প্রকার কর্মী সাগরে বা সমুদ্রের কাজে সক্ষমতায় ভারতীয় বন্দর থেকে স্বাক্ষর করে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে নিয়োজিত হয়েছিল, তারাই ইউনিয়নের সাধারণ সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। তবে সাম্মানিক সদস্য পদের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিরা ৪ নং বিধির ১ নং ধারার অধীনে ছিল না। কিন্তু তারা ইউনিয়নের বিষয় এবং নীতিগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল ও এসকল সম্মানীয় সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় বা কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বারা নির্বাচিত হতে পারত এবং তাদের সংখ্যা ইউনিয়নের মোট কর্মকর্তার এক-চতুর্থাংশের বেশি ছিল না। ৫ নং বিধিতে বলা ছিল সদস্যপদের জন্য সকল প্রার্থীকে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ফর্ম অনুযায়ী সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে হবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ যে কোনো প্রার্থীর ক্ষমতা বলে ভর্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। ১৮ নং বিধিতে উল্লেখিত ছিল যদি ইউনিয়নের সদস্যরা কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত ধর্মঘট করে, তবে তারা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবে না। সদস্যদের সমস্ত অভিযোগ কার্যনির্বাহী পরিষদ বা তার কর্মকর্তাদের দ্বারা মোকাবিলা করা হবে। ইউনিয়নের সদস্যদের বোর্ডে থাকাকালীন তাদের নিজ নিজ কর্মকর্তাদের আদেশ মেনে চলতে হবে, এবং কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে, এটি কার্যনির্বাহী পরিষদকে জানাতে হবে, যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১৬]

১৯২৯ সালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের (ISU) বাৎসরিক সাধারণ সম্মেলনে ISU - এর পক্ষ থেকে নাবিকদের স্বার্থে কিছু দাবিদাওয়া গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৭] এই কর্মসূচিতে গৃহীত দাবিদাওয়াগুলি হল -

১) পঞ্চাশ শতাংশ হারে সকল নাবিকদের মজুরি বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়।

২) সমুদ্রে এক সপ্তাহের কাজ সম্পাদনের জন্য ৪৮ ঘণ্টা এবং বন্দরে সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা সময় স্থির করার দাবি জানানো হয়।

৩) সমুদ্র বা বন্দর যাই হোক না কেন সমস্ত ওভারটাইম সপ্তাহের দিনগুলির জন্য দেড়গুন এবং রবিবার ও ছুটির দিনগুলিতে দ্বিগুণ হারে বেতন প্রদান করতে হবে।

৪) কর্মদিবসের বেতন কর্মীর স্বাক্ষর করার পর শুরু হবে এবং দিনের শেষে স্বাক্ষর করেই কর্ম পরিসমাপ্তি হবে।

৫) অসুস্থতার কারণে বিদেশী বন্দরে রেখে দেওয়া সমস্ত নাবিকদের জন্য হোমপোর্টে আগমনের দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মজুরি প্রদান করতে হবে এবং বিনামূল্যে হোমপোর্টে নিয়ে আসতে হবে।

৬) মোট মজুরির ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত সমস্ত কর্মীদের জন্য মাসিক বরাদ্দ মঞ্জুর করতে হবে এবং সমস্ত ক্রু সদস্যরা যে কোন বন্দরে সমতা বজায় রেখে বিচরণ করতে পারবে।

৭) নাবিকদের জন্য উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিনামূল্যে খাওয়ার ব্যবস্থা সহ মেস-ঘর স্থাপন করতে হবে। মেস-ঘর, রান্না ঘর এবং খাওয়ার পাত্র ধৌতালয় ঘরগুলি থেকে শাওয়ার যুক্ত স্নানাগারগুলি পৃথকভাবে তৈরি করতে হবে। ভারতীয় নাবিকেরা যাতে সমস্ত জাহাজে স্টুয়ার্ড হিসাবে নিয়োজিত হতে পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮) নাবিকদের জন্য পুরাতন মজুত থাকা খাদ্য সামগ্রী রসদের পরিমাপটি সরিয়ে "পূর্ণ এবং প্রচুর" পরিমাণে রসদের পরিমাপ কাঠি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৯) জাহাজ মালিকদের বিনামূল্যে বিছানা, বালিশ, বালিশের কভার, কম্বল, তোয়ালে এবং সাবান সরবরাহ করতে হবে এবং এগুলি সাপ্তাহিক পরিষ্কার ও পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) সমস্ত নাবিকদের জন্য ২০ বছরের একটি পেনশন স্কিম চালু করতে হবে। জাহাজ মালিকরা নাবিকদের পরিষেবার বিষয়টি একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত করবে এবং জাহাজ মালিকরা সম্মিলিতভাবে একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় তহবিল তৈরি করবে তাতে নাবিকদের কাছে কোনো ভাবে কিছু ধার্য করা যাবে না এবং যেখান থেকে সমস্ত পেনশন নাবিকদের প্রদান করা হবে।

১১) জাহাজের ধ্বংস, অগ্নিকান্ড, দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নাবিকদের কিট বা ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিষপত্রের জন্য জাহাজের মালিকদের দ্বারা নাবিকদের সম্পূর্ণ নগদ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১২) দামি মূল্যের তামাক, সিগারেট, কাজের জামাকাপড় এবং বুট জুতাগুলি জাহাজে থাকা ক্রুদের সরবরাহ করতে হবে।

১৩) লাইসেন্সপ্রাপ্ত দালালদের মাধ্যমে নাবিক নিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটাতে হবে এবং ১৯২২ সালের নাবিক নিয়োগ কমিটির সুপারিশ অনুসারে নাবিকদের কর্মসংস্থান ব্যুরো এবং উপদেষ্টা কমিটিগুলির প্রতিস্থাপন করতে হবে।

১৪) ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের স্বীকৃত নাবিক ব্যতীত জাহাজের মালিকরা কোনো অবস্থাতেই নন-ইউনিয়ন নাবিক নিয়োগ করতে পারবে না।

ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের এই উত্থাপিত দাবিদাওয়াগুলি নাবিকদের অধিকারের বিষয়টি সচেতন করেছিল যা পরবর্তী সময়গুলিতে পুঁজি এবং মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নাবিকদের সংগঠিত করে ধর্মঘটের পথে চালিত করেছিল। তবে দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘটের বিষয়টি পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত হিসাবে সকল ইউনিয়নভুক্ত নাবিক সদস্যদের মেনে নিতে হয়েছিল। এই সীমেন্স ইউনিয়নের কিছু প্রথমসারির সাম্মানিক সদস্যবৃন্দ সমাবেশ এবং অধিবেশনের মধ্যদিয়ে নাবিকদের অভাব অভিযোগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিচার বিশ্লেষণ করে ধর্মঘটকে পরবর্তী দিনগুলিতে সঠিকভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

১.৩. বাংলায় নাবিক স্বার্থে ISU -এর নেতৃত্বাধীন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘট:

ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নে প্রথম সারির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বাংলায় নাবিক স্বার্থে নিরলস কর্ম পরিচালনার দ্বারা নাবিকদের সংগঠিত সংগ্রামগুলিকে বাড়তি অক্সিজেন প্রদান করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে নাবিক নিয়োগ প্রক্রিয়াটিতে দালালদের স্বার্থ রক্ষিত হওয়ায় নাবিকদের নানা প্রকার ক্ষতিকর প্রভাবগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৮৫৯ সালের Indian Merchant Shipping Act I এর ১৮ এবং ১৯ নং ধারায় দালাল দ্বারা ভারতে নাবিক নিয়োগ প্রক্রিয়াটি চালু ছিল।[১৮] কলকাতায় ১৮৯৫ সালের অ্যাক্ট ১ এর ১৮ নং ধারার অধীনে শিপিং কোম্পানিগুলির অধীনে কিছু লাইসেন্সপ্রাপ্ত দালালেরা (কলকাতায় ঘাট-সারেং নামে পরিচিত ছিল) নাবিকদের নিয়োজিত করার অধিকার লাভ করেছিল।[১৯] এই দালালেরা ব্যক্তিগত স্বার্থে নাবিকদের কাছে ঘুষ হিসাবে অর্থ আত্মসাৎ করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছিল। তারা নাবিকদের নিয়োগের সময় মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করেছিল এবং এসময় প্রচুর পক্ষপাতিত্ব

সম্পন্ন অসাধু দালালের উদ্ভব ঘটেছিল যার ফলে নাবিক নিয়োগে অনিয়ম লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আবার ইউনিয়নভুক্ত নাবিকদের নিজেস্ব সুরক্ষার জন্য জাহাজ কর্মে যুক্ত হওয়ার সময় তাদের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুই বছরের এশিয়ার নাবিকদের শ্রম চুক্তির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিয়োগকর্তারা প্রথম তিন মাস পর যে কোনো সময় এই চুক্তিটির আইন বাতিল করতে পারত যার ফলস্বরূপ এই ক্রু নাবিকদের পদত্যাগের কোনো আইনি ভিত্তি না থাকায় তাদের বকেয়া মজুরি পুনরুদ্ধারের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। ১৯১৩–১৪ সালে নিয়োগকর্তারা প্রতিটি ইউরোপীয় নাবিকদের শিপবোর্ডে থাকার জন্য ১২০ কিউবিক ফুট জায়গা বরাদ্দ রেখেছিল যেখানে প্রতি লস্করের জন্য জায়গা বরাদ্দ ছিল মাত্র ৭২ কিউবিক ফুট।[২০] এজন্য ইউনিয়নকে সরকারের কাছে দাবিদাওয়ার বিষয়গুলি আইনগত ভাবে পাশ করার জন্য বহু সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এভাবে নাবিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়মগুলি অপসারণের জন্য তারা তাদের ইউনিয়নের মাধ্যমে ১৯২০ সাল থেকে নিম্নলিখিত রেজোলিউশনগুলি পাশ করিয়ে অভিযোগগুলি উন্মুক্ত করেছিল।[২১] রেজোলিউশনগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:-

১ নং রেজোলিউশনে ইউনিয়ন ভারতীয় নাবিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দালালদের অযৌক্তিক দাবির বিষয়ে নাবিকদের ক্ষতির আশঙ্কা বুঝেছিল। এইজন্য ইউনিয়ন ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়নের এজেন্সির দ্বারা নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে সম্মানের সঙ্গে অনুরোধ করেছিল।[২২]

২ নং রেজোলিউশনে নাবিকদের নিয়োগে দালালদের অযৌক্তিক দাবির কারণে নাবিকদের সৃষ্ট অসুবিধার বিষয়টি কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছিল এবং নাবিকদের নিযুক্তির জন্য ইউনিয়নের লাইসেন্স সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে এই জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কার্যনির্বাহী পরিষদ ইউনিয়নের মাধ্যমে জাহাজে নাবিকদের নিযুক্তির জন্য শিপিং কোম্পানিগুলির কাছে অনুমোদিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছিল। ইউনিয়নের অন্তর্গত কোনো নাবিককে নিযুক্ত করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে দালালদের একজন সহকারীর আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল এবং এরপর এই বিষয়টির প্রাথমিক তদন্তের জন্য কলকাতার শিপিং মাস্টারের অবিলম্বে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল।[২৩]

৩ নং রেজোলিউশনে, ভারতীয় নাবিকদের অভিযোগগুলিকে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মেরিন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির নিকট একটি ডেপুটেশনের মাধ্যমে উপস্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বোর্ড শিপে নাবিকদের নিযুক্তির জন্য ইউনিয়নের একটি লাইসেন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা রাখার কথা বলা হয়েছিল। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারির (মেরিন) কাছে ডেপুটেশনটি দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন থেকে রেজোলিউশন পাশ করানো হয়েছিল। এই ডেপুটেশনটি ৮ জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই সকল সদস্যরা হলেন ১) R. Broundfield (Bar-at-law, President), ২) K. Ahmed (MLA), ৩) B. K. Bose (BL), ৪) Mr. Daud (M. A. BL), ৫) Mr. Moghal Jan, ৬) Mr. Manfur Khan, ৭) Mr. Samud Khan, ৮) Mr. Syed Minnat Ali. এই সদস্যদের নিয়ে ১৯২১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে কার্যনির্বাহী পরিষদ বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মেরিন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির কাছে একটি ডেপুটেশন পাঠানোর জন্য রেজোলিউশন নিশ্চত করেছিল এবং উল্লিখিত সেক্রেটারিকে দ্রুত ডেপুটেশন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।[২৪]

৪ নং রেজোলিউশনে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের দ্বারা পরিচালিত একটি সভায় সম্মানের সাথে সরকার এবং শিপিং কোম্পানিগুলির সামনে ভারতীয় নাবিকদের নিম্নলিখিত বহুবিধ অভিযোগগুলি খুব শীঘ্রই প্রতিকারের জন্য আর্জি জানানো হয়েছিল।[২৫] আর্জিগুলি হলঃ-

১) ক) দালালদের মাধ্যমে ভারতীয় নাবিকদের নিয়োজিত করার ব্যবস্থাটি একেবারেই অবাঞ্ছিত ছিল, কারণ এটি কেবল নাবিকদের স্বার্থের জন্যই নয়, তাদের নিয়োগকর্তাদের জন্যও ক্ষতিকর ছিল।

খ) নাবিকদের নিয়োজিত করার জন্য দালাল এবং তাদের সহকারীদের দাবিগুলি শুধুমাত্র যে ভারতীয় নাবিকদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর তা নয় বরং প্রচুর পরিমাণে অসৎ পক্ষপাতিত্ব বিরাজ করার ফলে যোগ্য এবং দক্ষ নাবিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ) নাবিকদের কর্মের প্রাপ্ত মজুরি, ক্ষতিপূরণ এবং বোনাসের অর্থ পাওয়ার সময় দরিদ্র ভারতীয় নাবিকদের অযথা দালালদের দ্বারা শোষণের শিকার হয়ে শোষিত হতে হয়। এই ব্যবস্থাটি অবিলম্বে বাতিল করা উচিত এবং ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নকে একটি বৈধ লাইসেন্স দেওয়া উচিত যাতে এই ইউনিয়নটি নাবিকদের সরাসরি নিয়োজিত করতে পারে।

(২) খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় ভারতীয় নাবিকদের বর্তমান মজুরি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত ছিল, তাই বেতন কমপক্ষে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা উচিত।

(৩) ভারতীয় নাবিকদের একটি সাধারণ রেজিস্টার কলকাতা বন্দরে রাখা উচিত এবং দাবির অগ্রাধিকার অনুযায়ী নিযুক্তি করা উচিত।

(৪) যে সমস্ত ভারতীয় নাবিক এবং তাদের বংশধর যারা বিশ্বযুদ্ধের সময় বীরত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করেছে তাদের দাবির ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা উচিত।

(৫) রেলওয়ে শ্রমিকদের রেলওয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের মত একই প্রকার বৃদ্ধ বয়সে অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় নাবিকদের ভবিষ্যৎ তহবিল চালু করা উচিত।

(৬) পুরস্কারের ২৫ শতাংশ পদগুলি যোগ্য ভারতীয় নাবিকদের জন্য বরাদ্দ করা উচিত – এর ফলে ভারতীয় নাবিকদের আরও ভাল স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন গড়ে তুলতে সুবিধা হবে।

(৭) আহত এবং মৃত নাবিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং বোনাস দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত ছিল এটি প্রসারিত হওয়া উচিত।

(৮) ভারতীয় নাবিকদের জন্য জাহাজে উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৯) যাতে ভারতীয় নাবিকরা জাহাজে তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রদত্ত অনুপযুক্ত আচরণ থেকে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

(১০) ওভারটাইম কাজের জন্য ভারতীয় নাবিকদের অতিরিক্ত মজুরি প্রদান করা উচিত।

(১১) ইন্ডিয়ান শিপিং মাস্টারের উচিত ভারতীয় নাবিকদের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিনামূল্যে সাক্ষাৎকার দেওয়া।

(১২) দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব এবং হয়রানি প্রতিরোধে শিপিং অফিসের নিবিড় তদারকি বজায় রাখা উচিত।

(১৩) সমুদ্রযাত্রার জন্য নাবিকদের স্বাক্ষর করার আগে পাসপোর্ট নেওয়ার জন্য যে কঠোর এবং দ্রুত নিয়ম আরোপ করা হয়েছিল তা বাতিল করা উচিত।

(১৪) নাবিকদের মজুরির বিষয়টি নবিকদের নিয়োজিত এবং বরখাস্তের শাংসাপত্রগুলিতে উল্লেখ করা উচিত।

৫ নং রেজোলিউশনে, ১৯২১ সালের ৯ই মার্চের বৈঠকে ইতিমধ্যেই উল্লিখিত অভিযোগগুলি ছাড়াও, এই সভাটিতে ইঞ্জিন এবং ডেক বিভাগের দরিদ্র ও অসহায় নাবিকদের কাছ থেকে ঘাট-সারেংদের অযৌক্তিক এবং নিপীড়নমূলক ঘুষ আদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল। শুধুমাত্র তাদের সুপারিশ করার জন্য BISN কোম্পানির জাহাজে তাদের নিযুক্তি এবং ঘাট-সারেংয়ের মাধ্যমে শোষণের অবিলম্বে বিলুপ্তির জন্য উল্লিখিত কোম্পানির প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং ইউনিয়নের মাধ্যমে ক্রুদের সরাসরি নিয়োজিত হওয়ার জন্য আবেদন প্রার্থনা করা হয়েছিল।[২৬]

অভিযোগ প্রতিকারের জন্য ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০.০২.১৯২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মেরিন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির কাছে ডেপুটেশন পাঠানোর জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল এবং ০৯.০৩.১৯২১ তারিখে সাধারণ সভার দ্বারা রেজোলিউশনটি নিশ্চিত করা হয়েছিল। অভিযোগগুলিকে স্পষ্ট করার পর রেজোলিউশনের অনুলিপিগুলি বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। রেজোলিউশনের অনুসরণে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মেরিন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির অনুকূলে ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি মহম্মদ দাউদ No. 36 dated 16-03-21 একটি পত্রে ডেপুটেশন গ্রহণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা তৈরি করার আবেদন করেছিলেন। ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি মহম্মদ দাউদ বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মেরিন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকে সম্বোধন করে ডেপুটেশনের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মেরিন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি ডেপুটেশন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 1222 to Mne dated 1-04-21 পত্রে উত্তর স্বরূপ জানান “Government are not

prepared to take action on the general representations referred to in your letter and do not consider that any useful purposes would be served by receiving a deputation from your Union". সরকারের এই নেতিবাচক উত্তরে নাবিকদের সংগ্রাম শুরু করতে দেখা গিয়েছিল।[২৭]

বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কর্তৃক ডেপুটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করায় ০৩.০৪.১৯২১ তারিখে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় Mr. S. N. Mullik (M. A., B. L., M. L. C) –এর উপস্থিতিতে এবং সহ-সভাপতির সভাপতিত্বে ইউনিয়ন থেকে একটি রেজোলিউশন পাশ করা হয়েছিল। S. N. Mullik বাংলার গভর্মেন্টের অত্যন্ত অসহানুভূতিশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে মিঃ মল্লিককে নাবিকদের অভিযোগের প্রশ্নটি কাউন্সিলে তোলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ইউনিয়ন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যম এবং মিটিংয়ের পর মিটিং অনুষ্ঠিত করে তাদের অভিযোগগুলি জোরালোভাবে উত্থাপিত করে আন্দোলন করা শুরু করেছিল। Mr. C. R. Das, Maulana Abul Kalam Azad, Messrs. S. N. Halder, B. K. Bose, N. C. Sen এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের নির্দেশনায় মিটিং বা আলোচনা সভাগুলি সংগঠিত হয়েছিল।[২৮]

১৯২১ সালের ২৪ শে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সভাটি ছিল একটি স্মরণীয় সভা এবং সভাটির সভাপতিত্ব করেছিলেন Mr. C. R. Das. এই সভাটির উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল খিদিরপুরের ভূকায়লাস ময়দানে। এই সভা অনুষ্ঠানে প্রায় ১০,০০০ জন সাধারণ নাবিকদের নিয়ে Moulana Abul Kalam Azad, Messrs. R. Braunfield (Bar-at-law), S. N. Mullik (M. L. C.), S. N. Haldar (Bar-at-law), N. C. Sen (Bar-at-law), Wahed Hossain (Vakil), Panchkari Banerjee, Mahabubul Haq প্রমুখ প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ হাজির হয়েছিলেন। সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মওলানা আবুল কালাম আজাদ অত্যন্ত দুর্দশার একটি করুণ বর্ণনা দেন যেখানে বলা হয়েছিল নাবিকদের নিয়োগের সময় তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ৩ মাসের মজুরি কেটে নেওয়া হত। এই প্রক্রিয়াটি 'তিন তালাব' নামে পরিচিত। এই পরোক্ষভাবে ঘুষ হিসাবে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটি দুর্নীতির চরমতম দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিলক্ষিত করা গিয়েছিল। 'কোরান' উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে ঘুষ দেওয়া এবং নেওয়া 'হারাম' এবং নাবিকদের এই অভিযোগের প্রতিকার পেতে ইউনিয়নের সঙ্গে র‍্যালি করে ঘোরার পরামর্শ দেন। Mr. Das তার সমাপনী ভাষণে বলেছিলেন যে ভারতে একটি

ইউনিয়নের অনুপস্থিতিই নাবিকদের দুর্ভোগের একমাত্র কারণ এবং তারা যখন একত্রিত হবে তখনই তাদের দুর্ভোগের অবসান হবে। এই সভার বিষয়টি ২৬.০৪.১৯২১ তারিখে "Indian Daily News" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২৯]

বাংলার দুস্থ নাবিকদের অভাব অভিযোগগুলি ধর্মঘট এবং আন্দোলনের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল যা সংবাদ মাধ্যমগুলিতে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছিল। ০৫.০৪.১৯২১ তারিখে "The Bengalee" পত্রিকার সম্পাদকীয়তে একটি ডেপুটেশন প্রার্থনার বৈধ দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য গভর্নমেন্টের অবিবেচক নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে যুদ্ধকালীন সময়ে চোরাগোপ্তা এবং সমুদ্র বেষ্টিত মারাত্মক মাইন দ্বারা পরিপূর্ণ অংশগুলিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নাবিকদের কাজ করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে মিঃ সি. এ. ইন্স (Mr. C. A. Innes) যিনি তৎকালীন ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি নাবিকদের অভিযোগগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে ২৯.০৪.১৯২১ তারিখে ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি মিঃ মহম্মদ দাউদের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং তাকে নাবিকদের সমস্যা জনিত বিষয়গুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে প্রতিকারের আশ্বাস দিয়েছিলেন।[৩০]

স্টিমার, বোট এবং নৌকায় কর্মরত বাংলার নাবিকরা যারা লস্কর, সুখানী নামে পরিচিত ছিল তাদের দ্বারা ধর্মঘট হতে পরে এবিষয়টি সেসময় কলকাতায় অবিরাম গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। ইউনিয়ন সদস্য প্রতিনিধিদের করা অনুসন্ধানগুলিতে দেখা যায় যে নাবিকদের বিরুদ্ধে সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং যে কোনও সময় তারা কাজ স্থগিত করে ধর্মঘট শুরু করতে পারে। অবশেষে নাবিকরা সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল এবং এর ফলস্বরূপ তারা ধর্মঘট ডেকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। ১৯২১ সালের জুন মাসে চাঁদপুর স্টিমার ধর্মঘট শুরু হয়। কলকাতায় নাবিকদের অভিযোগগুলির ভিত্তিতে সমস্যা দূর করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদাসীনতা দেখা দেওয়ায় নাবিকেরা অসন্তোষের মনোভাব নিয়ে উদ্বেলিত হয়েছিল। ১৯২১ সালের ১২ই জুন তারা একটি গণসমাবেশ করেছিল এবং ধর্মঘটে একটি প্রস্তাব পাশ করানোর জন্য ধর্না দিয়েছিল। তারা শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবের প্রতি আনুগত্যের সাথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি মিঃ মহম্মদ দাউদ শুধুমাত্র একটি গুরুতর ঝুঁকির মধ্যেই বিক্ষিপ্ত নাবিকদের সংগ্রাম পরিস্থিতি এড়াতে পেরেছিলেন। যিনি সমবেত নাবিকদের কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করার

অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি তাদের দুর্ভোগ কমানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারেন। অবশেষে দেখা গেল বেঙ্গল গভর্নমেন্ট নাবিকদের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়টি সুনজরে দেখেছিলেন। যার ফলে ধর্মঘট এড়ানো হয় এবং দ্বিতীয়বার ডেপুটেশনের জন্য প্রার্থনার প্রস্তাব পাশ হয়। ডেপুটেশন গ্রহণের জন্য ১৩.০৬.১৯২১ তারিখে একটি টেলিগ্রাম বাংলার গভর্নরের সেক্রেটারির নিকট পাঠানো হয়েছিল।[৩১]

১৮.০৬.১৯২১ তারিখে "ENGLISHMAN" পত্রিকায় নাবিকদের ধর্মঘটের গুজবের বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়েছিল। গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি ইরাভিং (Iraving) ISU এর সেক্রেটারি মহম্মদ দাউদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারিকে বলা হয়েছিল যে নাবিকদের ধর্মঘট বর্তমানের জন্য স্থগিত করা হয়েছে, বাংলার গভর্নরের কাছে ডেপুটেশনের উত্তরের জন্য নাবিকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। মিঃ দাউদ ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের অবহিত করেন এবং তাদের সকল নাবিকদের কাছে এটা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেন যে ডেপুটেশনের ফলাফল না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের ধারণাটি ত্যাগ করা উচিত। নাবিকদের অবহিত করা হয়েছিল যে ফলাফল সন্তোষজনক না হলে, তাদের পছন্দের যেকোন পন্থা নেওয়ার জন্য তাদের উন্মুক্ত করা হবে এবং সংবাদ মাধ্যমগুলির দ্বারা এই বিষয়গুলি প্রচার করা হবে। এসকল সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মরত নাবিকদের প্রধান অভিযোগ ছিল বর্তমান অপব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন করা যাদের অধীনে এতদিন তারা নিযুক্ত হয়ে এসেছিল। জাহাজী নাবিকদের সঙ্গে সঙ্গে বন্দরকেন্দ্রিক শ্রমিকরাও দালাল ও ঘাট-সারেংদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল এবং তার সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের সময় হ্রাস করার জন্য দাবি তুলেছিল।[৩২]

কলকাতাতে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের মধ্যে একটা নেতৃত্বগত অন্তর্কলহ জনিত বিবাদ দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। ১৯২৭ সালে আফতাব আলির পুনঃপ্রচেষ্টায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সীমেন্স ইউনিয়ন (NSU) একটি পৃথক ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের মধ্যবর্তীতায় ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে এবং নতুন ব্যাবস্থায় এই ইউনিয়নটি পুনরায় পুরাতনের সাথে (ISU) এক হয়ে গিয়েছিল। মিঃ দাউদ জেনারেল সেক্রেটারি থেকে চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। জেনারেল সেক্রেটারী হলেন আব্দুল মতিন চৌধুরী, মিঃ মুজাম্মিল আলি এবং মিঃ আফতাব আলি সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছিলেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব ইউনিয়নের মুরুব্বি হিসাবে দায়িত্বে

ছিলেন। এখানে বলা হয়েছিল এবারে যদি ইউনিয়ন কিছু বিপ্লবাত্মক ধারণা নিয়ে কাজ করে তা হলে আমরা বড় খুশি হব।[৩৩] এই বিষয়টি গণবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে পত্রিকাটির অংশটি নিম্নে দেওয়া হল -

কলহের অবসান—

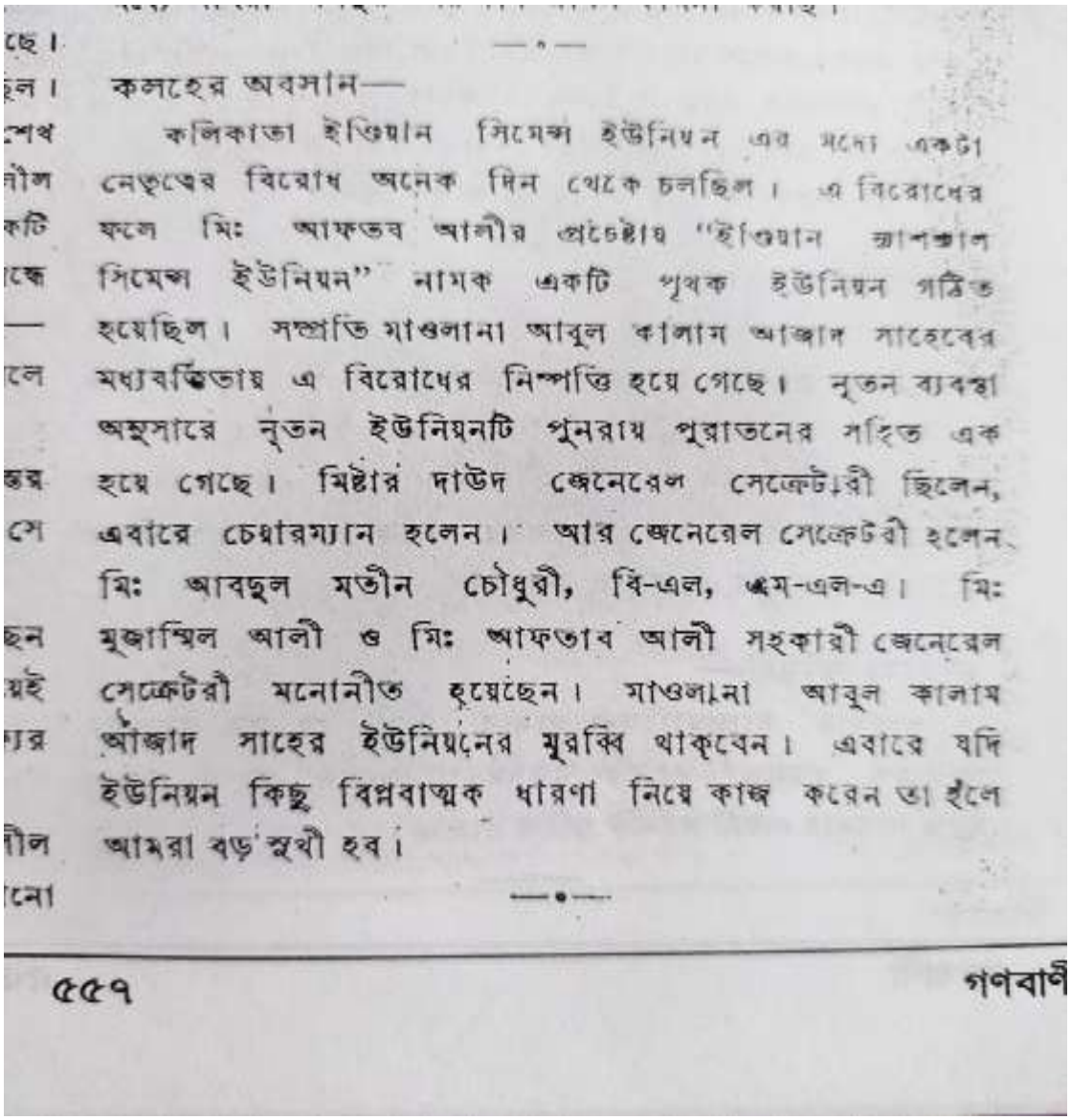

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান সিমেন্স ইউনিয়ন এর মধ্যে একটা নেতৃত্বের বিরোধ অনেক দিন থেকে চলছিল। এ বিরোধের ফলে মিঃ আফতব আলীর প্রচেষ্টায় "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সিমেন্স ইউনিয়ন" নামক একটি পৃথক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। সম্প্রতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় এ বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে নূতন ইউনিয়নটি পুনরায় পুরাতনের সহিত এক হয়ে গেছে। মিষ্টার দাউদ জেনেরেল সেক্রেটারী ছিলেন, এবারে চেয়ারম্যান হলেন। আর জেনেরেল সেক্রেটরী হলেন মিঃ আবদুল মতীন চৌধুরী, বি-এল, এম-এল-এ। মিঃ মুজাম্মিল আলী ও মিঃ আফতাব আলী সহকারী জেনেরেল সেক্রেটরী মনোনীত হয়েছেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব ইউনিয়নের মুরব্বি থাকবেন। এবারে যদি ইউনিয়ন কিছু বিপ্লবাত্মক ধারণা নিয়ে কাজ করেন তা হলে আমরা বড় সুখী হব।

৫৫৭ গণবাণী

মুজফ্ফর আহ্মদের সম্পাদিত "গণবাণী", একটি বাংলার সাপ্তাহিক কমিউনিস্ট পত্রিকা, ১৯২৭ সালে ISU – এর আভ্যন্তরীণ সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশনা কাল, ১১ই আগস্ট, ১৯২৭, পৃ. ১।

১৯২৭ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন এবং ন্যাশনাল সীমেন্স ইউনিয়ন দুটি সংমিশ্রিত হয়ে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন রূপে শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছিল। এই ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়টি কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বারা স্থির হয়েছিল পূর্বের ন্যায় কলকাতার ৭ নং, খিদিরপুরের, একবালপুর লেনেই থাকবে। ১৯২৭–২৮ সালের নির্বাচিত

অফিস-বিয়ারার সদস্যরা পদাধিকার বলে এই ইউনিয়নের দায়িত্ব সামলেছিলেন। এই ইউনিয়নের নির্বাচিত ব্যাক্তিদের মধ্যে মুরুব্বি বা প্রধান রক্ষাকর্তা হিসাবে ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে ছিলেন মিঃ মহম্মদ দাউদ (M. A., B. L.), ৫ জন সহ-সভাপতি হিসাবে ছিলেন - ১) মিঃ মহবুবুল হক (M. A., B. L.), ২) ডঃ মহম্মদ আলি (M. B.), ৩) ডঃ এস. আব্দুর রহমান, ৪) ডঃ সৈয়দ মহম্মদ আলি, ৫) মিঃ আব্দুর রাজ্জাক। ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন – মিঃ আব্দুল মাতিন চৌধুরী (B. L., M. L. A.) এবং ২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন – ১) মিঃ মুজাম্মিল আলি এবং ২) মিঃ আফতাব আলি। ৪ জন জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসাবে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন - ১) মিঃ এস. মোঘলজান, ২) মিঃ ফাজলুর রহমান, ৩) মিঃ আব্দুল ওয়াহিদ এবং ৪) মিঃ আব্দুল করিম। ৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন – ১) মিঃ আব্দুল হালিম, ২) মিঃ এ. জি. রডরিগাস, ৩) মিঃ আক্রম আলি, ৪) মিঃ মহম্মদ নুরুজ্জামান, ৫) মিঃ মহম্মদ ফাজিল, ৬) মিঃ এইচ. এ. চৌধুরী, ৭) মিঃ সিদ্দিক আহমেদ, ৮) মিঃ মহম্মদ শরীফ-উল্লা এবং কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন মিঃ সৈয়দ মিন্নাত আলি। এছাড়া ১৯২৭–২৮ বর্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্মানীয় সদস্য সেলুন ডিপার্টমেন্ট, ডেক ডিপার্টমেন্ট এবং ইঞ্জিন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব সামলেছিলেন, এদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের নাম তুলে ধরলাম তারা হলেন মিঃ জাফর আলি, মিঃ কোরবান আলি, মিঃ মহম্মদ ইব্রাহিম, মিঃ মুজফ্ফর আহ্ মদ প্রমুখ।[৩৪]

মুজফ্ফর আহ্মদ কলকাতার নাবিকদের সঙ্গে তার যে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সে কথা স্বীকার করেছেন। তার জন্মস্থান অর্থাৎ সন্দ্বীপের অধিকাংশ লোকজন জাহাজের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই জাহাজের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের মজুরিগত সমস্যা নিয়ে বাংলায় প্রায়শয়ই ধর্মঘটের ডাক দিতে দেখা গিয়েছিল। "নবযুগ" পত্রিকার মাধ্যমে তিনি এই জাহাজ নাবিক শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ এবং দাবিদাওয়ার বিষয়গুলি উন্মুক্ত করেছিলেন। আহ্মদ মার্কসীয় চেতনাকে বাংলার নাবিকদের মধ্যে অঙ্গীভূত করেছিলেন।[৩৫]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের কিছু আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলিতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ১৯৪৬ সালের "দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং" তার একটি জলন্ত উদাহরণ স্বরূপ ঘটনা। যেখানে হিন্দু এবং মুসলিমদের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত করতে

চেয়েছিল। এসময়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শ্রমিক ছাঁটাই হতে দেখা গিয়েছিল। ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন এবং বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ আফতাব আলি মালিকদের এই অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছিলেন যা ৩০.১১.১৯৪৬ তারিখে "স্বাধীনতা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৬] পত্রিকার অংশটি নিম্নে দেওয়া হল -

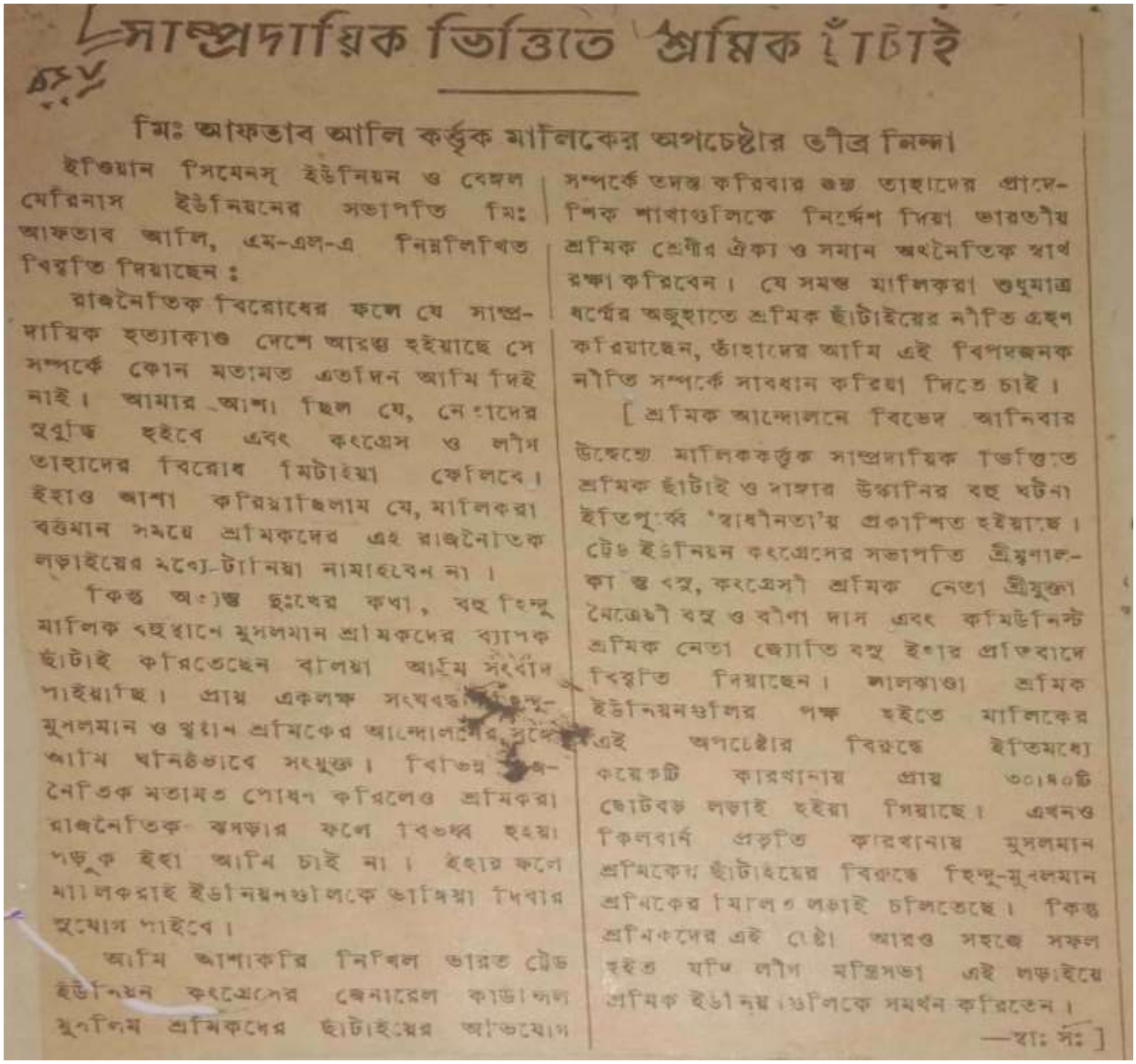

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শ্রমিক ছাঁটাই

মিঃ আফতাব আলি কর্তৃক মালিকের অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা

ইণ্ডিয়ান সিমেনস্ ইউনিয়ন ও বেঙ্গল মেরিনাস ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ আফতাব আলি, এম-এল-এ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

রাজনৈতিক বিরোধের ফলে যে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড দেশে আরম্ভ হইয়াছে সে সম্পর্কে কোন মতামত এতদিন আমি দিই নাই। আমার আশা ছিল যে, নেতাদের সুবুদ্ধি হইবে এবং কংগ্রেস ও লীগ তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবে। ইহাও আশা করিয়াছিলাম যে, মালিকরা বর্তমান সময়ে শ্রমিকদের এই রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যে টানিয়া নামাইবেন না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, বহু হিন্দু মালিক বহুস্থানে মুসলমান শ্রমিকদের ব্যাপক ছাঁটাই করিতেছেন বলিয়া আমি সংবাদ পাইয়াছি। প্রায় একলক্ষ সংঘবদ্ধ হিন্দু-মুসলমান ও স্থায়ী শ্রমিকের আন্দোলনের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামত পোষণ করিলেও শ্রমিকরা রাজনৈতিক কলহের ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ুক ইহা আমি চাই না। ইহার ফলে মালিকরাই ইউনিয়নগুলিকে ভাঙিয়া দিবার সুযোগ পাইবে।

আমি আশাকরি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিল মুসলিম শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য তাহাদের প্রাদেশিক শাখাগুলিকে নির্দেশ দিয়া ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সমান অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করিবেন। যে সমস্ত মালিকরা শুধুমাত্র ধর্মের অজুহাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আমি এই বিপদজনক নীতি সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিতে চাই।

[শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ আনিবার উদ্দেশ্যে মালিককর্তৃক সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শ্রমিক ছাঁটাই ও দাঙ্গার উস্কানির বহু ঘটনা ইতিপূর্বে 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমৃণালকান্ত বসু, কংগ্রেসী শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্তা নেত্রেয়ী বসু ও বীণা দাস এবং কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা জ্যোতি বসু ইহার প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়াছেন। কলিকাতা শ্রমিক ইউনিয়নগুলির পক্ষ হইতে মালিকের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে কয়েকটি কারখানায় প্রায় ৩০।৪০টি ছোটবড় লড়াই হইয়া গিয়াছে। এখনও কিলবার্ণ প্রভৃতি কারখানায় মুসলমান শ্রমিকের ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকের মিলিত লড়াই চলিতেছে। কিন্তু শ্রমিকদের এই চেষ্টা আরও সহজে সফল হইত যদি লীগ মন্ত্রিসভা এই লড়াইয়ে শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে সমর্থন করিতেন।

—স্বাঃ সঃ]

১৯৪৬ সালের ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত "স্বাধীনতা" পত্রিকায় ISU -এর সভাপতি আফতাব আলি মালিক পক্ষের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক শ্রমিক চাঁটাই -এর তীব্র নিন্দা করেছিলেন

বাংলার সংগঠিত নাবিকদের দুর্বল করার লক্ষ্যে মালিক পক্ষ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিভেদ নীতি, গুজব প্রভৃতি অপপ্রচারমূলক কর্মকান্ডে নিযুক্ত ছিল। তৎকালীন সময়ে পত্র-পত্রিকাগুলি এই শ্রমিকদের সতর্কতামূলক বার্তা প্রেরণ করে দাঙ্গা জনিত ভেদাভেদগুলিকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং পুঁজি মালিকদের এই শ্রমিকদের উপর শোষণ এবং শাসনের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকাগুলি বুমেরাংয়ের মতো আঘাত হেনেছিল। বাংলার পত্র-পত্রিকার মধ্যে অনেক পত্রিকায় কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সকল পত্র-পত্রিকাগুলিতে ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের দ্বারা লেখাগুলি নাবিক শ্রমিকদের প্রভাবিত করে সচেতন করেছিল।

১.৪. বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলার নাবিকদের দ্বারা সংগঠিত ধর্মঘট:

বিংশ শতকের শুরু থেকে নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত দুটি ভয়ানক বিশ্বযুদ্ধ বাংলার নাবিকদের শুধুমাত্র যে জীবনহানি বা ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন করেছিল তা নয় এর পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির সীমাহীন শোষণে সমুদ্র কর্মে নিয়োজিত নাবিকেরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে মৃত বা নিখোঁজ নাবিকদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে বহু সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল আবার কখনো কখনো মৃত পরিবারের প্রিয়জনদের নিরাস হতেও দেখা গিয়েছিল। এরই সঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি অক্ষশক্তির দ্বারা আঘাতগুলিকে প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়া চালিয়েছিল যা ঔপনিবেশিক শোষণকে তরান্বিত করেছিল। তাই এর ফলস্বরূপ মজুরি হ্রাস, স্বল্প বেতনে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং যুদ্ধকালে নিরাপত্তা জনিত অভাব শিপিং কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে বাংলার নাবিকদের সংগ্রাম বা ধর্মঘটে নামতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সময় ভারতীয় নাবিকরা জাহাজে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য বোনাস সহ পর্যাপ্ত পরিমাণ বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিল। এই দাবি না মানলে তাদের মধ্যে অনেকেই এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জাহাজে কাজ করতে অস্বীকার করেছিল। এই সময়ে ISU -এর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৪০,০০০ এবং ইউনিয়নের তহবিলে ৮,৭০,০০০/- বেশি অর্থ মজুত ছিল। সারা বছর ধরে ইউনিয়ন সংগঠকরা ইউনিয়নের ব্যানারে নাবিকদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলার জন্য প্রচার চালিয়েছিল। একটি "সীমেন্স ভলেন্টিয়ার ক্রুপস" (জাহাজী মুক্তি সেনা) গঠন করা হয়েছিল এবং ৫৫ জন

স্বেচ্ছাসেবক, যাদের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছিল এদের ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত মিটিং এবং মিছিলে অংশগ্রহণ করতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ইউনিয়ন সদস্যদের জন্য একটি নাইট স্কুল খোলা হয়েছিল। ইউনিয়ন দাবিদাওয়ার একটি সনদ প্রণয়ন করেছিল এবং এটিকে নাবিকদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।[৩৭] এই দাবিগুলি নিম্নে দেওয়া হলঃ-

১) পঞ্চাশ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করা।

২) ভারতের সমস্ত বন্দরে বেতন সমান রাখা।

৩) রেশনের বর্তমান স্কেলের সংশোধনকরণ।

৪) কাজের সময় এবং ওভারটাইমের বেতন নির্ধারণ করা।

৫) ব্রিটিশ বোর্ড অফ ট্রেডের সুপারিশকৃত র‍্যালি বুকের পরিবর্তন করা।

৬) ক্লো কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটি জয়েন্ট এমপ্লয়মেন্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা।

৭) ঘুষ এবং দুর্নীতি দমন করা।

৮) নাবিকদের প্রতিনিধিত্ব সহ একটি ন্যাশনাল মেরিটাইম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা।

৯) নাবিকদের জন্য জাতীয় পেনশন কল্যাণ তহবিল গঠন করা।

১০) ভারতীয় নাবিকদের বেতন নির্ধারণের জন্য অল ইন্ডিয়া সীমেন্স ফেডারেশনের মান্যতা দান এবং এর সাথে যৌথ চুক্তি স্থাপন করা।

ইউনিয়ন নাবিকদের মধ্যে প্রচলিত ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং শোষক হিসাবে নিন্দিত ঘাট-সারেং ও লাঠি রক্ষকদের অপকর্মের অবসান ঘটানোর জন্য জোরালোভাবে আন্দোলন শুরু করেছিল। আবার নাবিক নিয়োগের জন্য "ওপেন মাস্টার" প্রবর্তনের দাবি জানিয়েছিল যা দুর্নীতি দমনের একমাত্র কার্যকর উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। এই আন্দোলনের সাথে জড়িত আফতাব আলি এবং আব্দুল আজিজ সহ ইউনিয়নের নেতা সংগঠকরা ব্রিটিশ সরকার, ইউরোপীয় কর্মকর্তা এবং শিপিং কোম্পানিগুলির দুর্নীতির বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিল। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি আইনসম্মত ধর্মঘট এবং ভারতের সমস্ত বন্দর অবরোধের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ইউনিয়ন নাবিকদের দাবিগুলি পূরণ করতে এবং তাদের

অভিযোগের প্রতিকারে শিপিং কোম্পানিগুলি কোনো পদক্ষেপ না নিলে জাহাজ মালিকদের সঙ্গে নাবিকদের সংঘর্ষ বাধতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল।[৩৮]

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, তাদের চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে শতাধিক নাবিককে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ভারতীয় নাবিকদের দাবি এবং ধর্মঘটের গতি প্রকৃতি নিয়ে রোজিনা ভিস্রাম বিস্তারিতভাবে তার আলোচনায় তুলে ধরেছেন।[৩৯] বালাচন্দ্রন যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা তাদের কাজ এবং বেতনের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়েছিল।[৪০] যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক হারে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমবাজারের ক্ষেত্র গড়ে ওঠেছিল। এজন্য বহু নাবিক ব্রিটিশ কোম্পানির জাহাজের কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। এসময় শত্রুপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রিটিশ জাহাজগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার ফলে সমুদ্রে নাবিকদের জীবনের ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছিল। এসময় অল ইন্ডিয়া সীমেন্‌স ফেডারেশন (AISF) যুক্তি দিয়েছিল যে পূর্বে বেতন বৃদ্ধির যে দাবি জানানো হয়েছিল তা মূলত শান্তিকালীন পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য ছিল।[৪১] এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মের জন্য ভারতীয় নাবিকরা তাদের বেতন কাঠামো জোরপূর্বক বর্ধিত করার শর্তে উন্নত বেতন লাভের সুযোগ পেয়েছিল। কলকাতার শিপিং মাস্টারও উল্লেখ করেছেন যে নাবিকরা নতুন করে তাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুদ্ধকালীন দাবিদাওয়ার সাথে সাথে তারা যুদ্ধ বোনাস এবং জীবনহানি হলে তাদের আত্মীয় পরিজনদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিল।[৪২] এইভাবে ধর্মঘটগুলি পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল যার মধ্যে ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল।

ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইউনিয়ন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল যার জন্য নাবিকদের প্রয়োজনে ব্রিটেনের যুদ্ধ জাহাজগুলিতে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা লক্ষ্য করা যায়নি এবং এর সাথে উচ্চ বেতনে নাবিকদেরও কাজের প্রতি আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে দালাল এবং ঘাট-সারেংদের ঘুষ হিসাবে অর্থ আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে "Bribery Protest Day" পালিত হয়েছিল যখন আফতাব আলি একটি "সীমেন্স রিক্রুটমেন্ট ব্যুরো" গঠনের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আফতাব আলি, এম. আব্দুল হক ও সোহরাব আলি মিলিত হয়ে একটি ডেপুটেশন শ্রমমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছিলেন, যেখানে নাবিকদের অভিযোগের কথা বর্ণিত ছিল।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন গোপন এজেন্টের মতে, আফতাব আলি, আব্দুল হক, শামসুল এবং ইউনিয়নের অন্যান্য সংগঠকদের ন্যায় কলকাতায় কোলম্যান ও ফায়ারম্যানদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে এদের সঙ্গে নাবিকদের সংগঠিত করার কথা বলা হয়েছিল যাতে করে সমস্ত সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিকদের দ্বারা একটি সফল ধর্মঘট সম্ভব হয়।[৪৩]

১৯৩৯ সালের মে মাসে আফতাব আলি জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিদেশে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের শাখা খোলার পরিকল্পনা করেন। জেনেভা থেকে আফতাব আলি কর্তৃক ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের এবং সদস্যদের কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মিমাংসা করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ শিপিং ফেডারেশনের সাথে ভারতীয় নাবিকদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে তিনি জেনেভা থেকে লন্ডনে যাবেন। জাহাজের মালিকরা যদি তার শর্ত উপেক্ষা করে তবে তিনি শিপিং কোম্পানিগুলির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য সংগঠিত নাবিকদের দ্বারা ধর্মঘটের ডাক দিয়ে আন্দোলন শুরু করবেন।

জেনেভা থেকে অন্য একটি চিঠিতে আফতাব আলি বলেছিলেন যে তিনি নাবিকদের সমর্থনে জেনেভাতে একটি শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করবেন এবং লন্ডনে ভারতীয় নাবিকদের একটি সম্মেলনে যোগ দেবেন। সম্মেলনে নির্ধারিত এই দিনটি "অল ইন্ডিয়ান সীমেন্স ডে" হিসাবে বিবেচতি হয়েছিল। তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে তিনি জোর দেবেন গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিটি বন্দরে যেন ভারতীয় নাবিকদের একজন প্রতিনিধি রাখা হয়। ২২.০৭.১৯৩৯ তারিখে তাহাসিল মিয়াঁর দায়িত্বে থাকা ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের লন্ডন আফিসে (ইন্ডিয়ান সোশ্যাল ক্ল্যাব, 179 হাই স্ট্রীট, পপুলার, লন্ডন E 14) অবস্থানরত স্থানে একটি "অল ইন্ডিয়া সীমেন্স ডে" পালন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মোহন চাঁদ রোড ময়দানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে আফতাব আলিকে যুক্তরাজ্যে তার আলোচনায় পূর্ণ সমর্থন দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে ব্রিটিশ জনসাধারণের সামনে ভারতীয় নাবিকদের মামলা রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য লন্ডন সম্মেলনে ধন্যবাদ জানানো হয়েছিল। একই সঙ্গে নাবিকদেরও দাবির প্রত্যাখ্যান করা হলে ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছিল।[৪৪]

"হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড" নামক পত্রিকায় জানানো হয়েছিল ভারতীয় নাবিকরা লন্ডনে আগমনকালে আফতাব আলিকে একটি উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়েছিল। এছাড়া এই পত্রিকা থেকে

জানা যায় আফতাব আলি ২২.০৭.১৯৩৯ এবং ২৩.০৭.১৯৩৯ তারিখ দুটিতে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলনে ভারতীয় নাবিকদের পূর্বোক্ত সনদ গ্রহণ করে নিম্ন মজুরি, অপর্যাপ্ত রেশন স্কেল, দুর্নীতি ও ঘুষ, সামাজিক কল্যাণের অভাব, ওভারটাইমের অপর্যাপ্ত বেতন, বার্ধক্য ভাতার অবলুপ্তিকরণ এসকল প্রতিকারমূলক আবেদনগুলি খারিজ করার জন্য অল ইন্ডিয়া সীমেন্স ফেডারেশন (AISF) জাহাজ মালিকদের কাছে আরও ভাল মজুরির ব্যবস্থা এবং কাজের শর্তগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বিবেচনা করার আবেদন জানিয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য কিছু প্রস্তাব পাশ করেছিল। এছাড়া ভারত সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ এবং গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যত্র ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন এবং প্রগতিশীল আন্দোলনকে ভারতীয় নাবিকদের সাথে অভিন্নকরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।[৪৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইউনিয়নের এক সভায় নাবিকরা যুদ্ধ শুরু করার জন্য হিটলারকে দোষারোপ করেছিল এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করে ব্রিটেনের হয়ে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন গোপন এজেন্ট জানিয়েছিলেন যে জার্মানদের দ্বারা ব্রিটিশ জাহাজ ডুবে যাওয়ার কারণে ভারতীয় নাবিকরা তাদের জাহাজে কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সেসময় ইউনিয়ন নাবিকদের দ্বিগুণ মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানানোর পরামর্শ দিয়েছিল। ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে, আফতাব আলি জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে যোগদানের পর জুরিখে ইন্টারন্যাশানাল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। এরপর ব্রিডলিংটনে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে অংশ নেওয়ার পর ভারতে ফিরে এসেছিলেন। তার আগমনের পরপরই অনুষ্ঠিত ইউনিয়নের একটি সভায় আফতাব আলি মিত্রশক্তি বিজয়ের জন্য আশা প্রকাশ করেছিলেন এবং ভারতীয় শ্রমিকদের নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের এই যুদ্ধকে সমর্থন করার কথা বলেছিলেন।[৪৬]

“Jahaji” পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মোহন চাঁদ রোড ময়দানে অনুষ্ঠিত ইউনিয়নের একটি সভায় আফতাব আলি বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধকালীন দাবির প্রশ্নে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে নিয়োগ কর্তাদের দ্বারা যেকোনো বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করবেন। ডিরেক্টর ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার্স ইউনিয়নের (IQMU) সংগঠকরা নাবিকদের যুদ্ধের

বিপদকে অতিরঞ্জিত করে গোপনে প্রচার চালিয়েছিল এবং নাবিকদের জাহাজের কাজ পরিত্যাগ করে বাড়িতে ফিরে যেতে প্ররোচিত করেছিল। এসময়ে ইউনিয়ন সমস্ত বন্দরে মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা অভিন্ন নীতি অনুসরণ, নিখোঁজ এবং মৃত নাবিকদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ত্রাণ, শত্রু জাহাজে আটক নাবিকদের প্রত্যাবাসনের দাবি উত্থাপন করেছিল। কলকাতায় নাবিক এবং শিপিং কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি সমঝোতা হওয়ার পরে যুদ্ধ পূর্ব মজুরিতে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ বোনাস হিসাবে আরও ২৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। এই মীমাংসা হওয়া সত্ত্বেও কিছু নাবিক তাদের মজুরি দ্বিগুণ করার জন্য ধর্মঘট শুরু করেছিল।[৪৭]

এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী নাবিকেরা ধীরে ধীরে অনেক জাহাজ দখল করতে শুরু করেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটের এই দ্বিতীয় ধাপে ব্যাপক সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই সময় অনেক ভারতীয় নাবিককে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আদেশ না মানার অভিযোগে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মেয়াদে জেলে পাঠানো হয়েছিল। জাহাজ মালিকেরা বিভিন্ন সময় সংগঠিত ধর্মঘটের জন্য মূলত ইউনিয়নকে দায়ী করেছিল। ১৯২০ এবং ৩০ -এর দশকে জাহাজ মালিকেরা নাবিকদের স্বল্প মজুরি প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা তুলে ধরেছিল তাই এসময় নাবিকদেরকে একটি সমঝোতায় আসার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু নাবিকরা সমঝোতায় না এসে রাজনৈতিক প্ররোচনার সাথে এর বিরোধিতা করেছিল।[৪৮] বাণিজ্য বোর্ড এসময় আশঙ্কা করেছিল যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নাবিকদের বিরুদ্ধে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপ ভারতে প্রভাব ফেলবে। এই ক্রু নাবিকদের সাথে আলোচনা কঠিন হয়ে পড়ায় এবং আফতাব আলি যুদ্ধকে সমর্থন করার প্রস্তাব পাশ করে নিজেকে AITUC -র প্রস্তাব থেকে সরিয়ে নেওয়ার ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আফতাব আলিকে AISF -এ নাবিকদের প্রতিনিধি হিসাবে অধিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার এবং জাহাজ মালিকদের এজেন্টরা AISF -এর সাথে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করে "War risk money" হিসাবে মজুরিতে আরও ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিল। আফতাব আলি ব্রিটিশ সরকারের শর্তে রাজি হয়ে লন্ডনে বসবাসরত সুরাত আলিকে এই বন্দোবস্ত সম্পর্কে অবহিত করে এবং তাকে সমস্ত ভারতীয় নাবিকদের সমুদ্রযাত্রায় এগিয়ে যেতে এবং অনুমোদিত কাজ বন্ধ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে বলেছিলেন।[৪৯] তবুও আলির আবেদন সত্ত্বেও ভারতীয় নাবিকদের ধর্মঘট থামেনি যা ১৯৪০ সালের মার্চের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৯৪০ সালের নভেম্বরে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) -এর ২২ তম বার্ষিক সম্মেলনে আফতাব আলির সভাপতিত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিকর দিক, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং একনায়কতন্ত্রের উত্থান শ্রমিক শ্রেণীর কাছে কতটা ভয়ঙ্কর তা শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের সভায় শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। শ্রমিকদের অন্যান্য সমস্যাগুলির থেকে যুদ্ধকালীন সমস্যাকে সবচেয়ে গুরুতর বলে মনে করা হয়েছিল। তিনি যুদ্ধের প্রতি উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন এটি দৈনন্দিন জীবনের একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফতাব আলি যুদ্ধের প্রতি উদ্বিগ্নের জন্য ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল মেরিনের সাথে নাবিকদের সংযোগসাধন করেছিলেন কারণ যুদ্ধ ঘোষণার পর তিনি নিজেকে যুদ্ধের জন্য উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন আমার সামনে কিছু থাকলে আমি সাত বছর অপেক্ষা করতাম না এবং হিটলারকে প্রথমে আক্রমণের অনুমতি দিতাম না কারণ আমি নিজেই তাকে ১৯৩৩ সালে আক্রমণ করতাম যে বছর সে মহান জার্মান শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে ক্ষমতায় এসেছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন অগণিত ব্রিটিশ, ফরাসি এবং অন্যান্য মহাদেশীয় ট্রেড ইউনিয়নিস্টরা ঠিক এই একই কাজ করত, যদি তারা আঘাত হানার জন্য সৌভাগ্যপূর্ণ সুযোগ পেত। তিনি উল্লেখ করেছিলেন আমাদের হাতে তলোয়ার না থাকায় (যা অবশ্যই হিটলারের উপযুক্ত ব্যবস্থা হত) আমরা কলম হাতে নিয়েছি এবং আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে আমাদের আন্তর্জাতিক সংস্থা, ইন্টারন্যাশানাল ট্রান্সপোর্ট-ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (ITF) -এর নেতা কমরেড এডো ফিমেন তার যোগ্য নির্দেশনায়, হিটলার এবং মুসোলিনিকে তীব্র ভাবে নিন্দা করেছিল এবং দীর্ঘ সাত বছর তাদের ফ্যাসিবাদের ধর্মকে মানবজাতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর জন্য অকল্যাণকর বিবেচনা করে বিশ্বের সামনে উন্মোচন করেছিল। তিনি আরও বলেন যে ITF এখনও শ্রমের এই চিরশত্রুদের সাথে আগের চেয়ে আরও জরালোভাবে যুদ্ধ করছে, যদিও ফরাসী এবং অন্যান্য মহাদেশীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির $^{১}/_{৪}$ ভাগ ধ্বংসের কারণে এটি হল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ডে তার আসন স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছিল।[৫০]

মুসোলিনি ইতালিতে ক্ষমতায় এসে ইতালীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং তাদের নেতাদের সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং এসব নেতাদের অজানা গন্তব্যে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিলেন কিংবা তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। এবিষয়টি সকলেরই জানা ছিল হিটলারও সেই একই কাজ করেছিলেন। ইউনিয়ন নেতারা কি একনায়ক ফ্যাসিশক্তির কাছেই থেমে

গেল! আফতাব আলি সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, কোথায় আজ মহান এবং অত্যন্ত উন্নত ইউরোপীয় ট্রেড ইউনিয়ন? কোথায় অস্ট্রিয়া, চেকো-স্লোভাকিয়া, স্পেন, পোল্যান্ড, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স এবং রুমানিয়ার সেই মহান শ্রমিক নেতারা যারা অগণিত ত্যাগের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশে শ্রমিক শ্রেণীর এই মহান সংগঠনগুলো গড়ে তুলেছিলেন? হিটলার এবং মুসোলিনিও কি সেসব দেশের সমসাময়িক ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের দেশ থেকে বিতারিত করে দিয়েছিলেন? যদি এই তথ্যগুলিকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে আলির এই বিষয়টিকে বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না কারণ এই যুদ্ধটিকে তিনি আজকের দিনে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং এর সফলতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন বিভ্রান্তকারি মানুষের দ্বারা কানে মিথ্যা কথা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাতে বিভ্রান্ত না হওয়ায় শ্রেয় কারণ এই যুদ্ধ একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং এতে ইউনিয়নের কোনো স্বার্থ নেই। যদিও এটা সত্য যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং টোরিরা যুদ্ধে জয়লাভের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে এবং তারা সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে জয়লাভের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, অবশ্য এই সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না যেসকল জনসাধারণের দ্বারা ব্রিটিশ শ্রমিকের উত্থান হয়েছিল তা প্রাক্তন সংগঠনের অনুপ্রেরণা থেকে এসেছিল কারণ আমাদের ব্রিটিশ কমরেডরা বুঝতে পেরেছিল যে হিটলার যুদ্ধে জয়ী হলে এই সকল শ্রমিক নেতাদের এবং সারা বিশ্বে তাদের সহকর্মীদের ভাগ্য কী হতে পারে।[৫১]

আফতাব আলি আরও বলেন যে কলকাতার কিছু শিপিং কোম্পানিগুলির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য তিনি এই যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইংল্যান্ডের জাহাজ মালিকদের সাথে একটি ন্যায্য মিমাংসার চেষ্টা করা হলে তারা আলোচনা করার নূন্যতম সৌজন্য বোধটুকুও দেখায়নি। তবে ISU -এর সদস্য ভুক্ত নাবিকরা তাদের জীবন ও জীবিকাকে নিশ্চিত করার জন্য অর্থ প্রদান করে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করলে জাহাজ মালিকরা ইউনিয়নের গুরুত্বকে মেনে নিয়ে মজুরিগত সমস্যাটি মিটিয়ে ফেলতে পারে।[৫২]

যুদ্ধকালীন সমস্যা এবং এর পরিচালিত দায়িত্ব নিস্পত্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত আফতাব আলির সঙ্গে AITUC -এর পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। TUC -এর অধিবেশনে যাওয়ার আগে আলিকে TUC থেকে যুদ্ধকে সমর্থন করার নীতি গ্রহণের জন্য ওকালতি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে TUC এবিষয়ে দূরত্ব বজায় রেখেছিল এবং এর আলোচনাকে

উপেক্ষা করে অনুপস্থিত ছিল। যুদ্ধকে সমর্থন করার নীতির জন্য কমবেশি অনেকেই TUC -তে রয়ে গিয়েছিল। তবে ইউনিয়নগুলিকে TUC -এর অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য আফতাব আলি বাধ্য করেন নি কারণ তিনি মনে করেন TUC -এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ইউনিয়নগুলি আরও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। তিনি আরও বলেন TUC এখন আর শুধুমাত্র একটি শ্রমিক সংগঠন নয়, এটি তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের জন্য রাজনীতিবিদদের একটি মিলনস্থল হয়ে উঠেছে। আরও একটি দুর্ভাগ্যজনক সত্য হল যে বিপুল সংখ্যক ইউনিয়ন যারা প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল এবং TUC -র আলোচনায় অংশ নিয়েছিল তাদের আদৌ কোনো অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় নি। মতপার্থক্য জনিত কারণে তিনি নিজে TUC -এর সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সবশেষে আফতাব আলি জানান যে নিজেদের স্বার্থে যুদ্ধকে সমর্থন করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। যদিও আফতাব আলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নাবিকদের সংগঠিত করে আন্দোলন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।[৫৩]

যুদ্ধ ঝুঁকির জন্য নাবিকদের যে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হত যুদ্ধ পরবর্তীকালে এই বর্ধিত বেতন কাঠামোটি হ্রাস করা হয়েছিল এরফলে ইউনিয়ন নাবিকদের বেতন স্থায়ীকরণের জন্য নতুন করে আন্দোলন শুরু করেছিল। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আফতাব আলি ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চ একটি লিফলেটে "War risk money" -র মূল বেতনটিকে যুদ্ধ ঝুঁকির বেতন বলে অভিহিত করেছিল এবং সেই সাম্প্রতিক বেতন বৃদ্ধিকে ইউনিয়ন "basic increase" বা সাধারণ বৃদ্ধি বলে বিবেচনা করেছিল। তবে মালিক পক্ষ যদি বেতন কাঠামো বন্ধ করতে উদ্যত হয় তবে ইউনিয়ন সাধারণ ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে তা প্রতিহত করবে। তিনি লিফলেটে উল্লেখ করেছিলেন জাহাজের মালিকরা কোন যুদ্ধ নয়, কোন যুদ্ধের ঝুঁকিও নয় এটি কেবল যুদ্ধ অজুহাত দেখিয়ে মজুরি হ্রাস করার চেষ্টা করেছিল।[৫৪] মালিক পক্ষ মজুরি হ্রাস করতে সফল হলে নাবিকেরা মাসিক এবং বার্ষিক কতটা পরিমাণ অর্থ থেকে বঞ্চিত হবে তার একটি তুলনামূলক তালিকা নিম্নে দেওয়া হল –

সারণি সংখ্যা – ৩

শিপিং মালিক পক্ষ "no war – no war risk money" –এর অজুহাত ব্যবহার করে মজুরি হ্রাস করতে সফল হলে নাবিকদের মাসিক এবং বার্ষিক বঞ্চিত অর্থের পরিমাণ

Ratings	Monthly	Yearly
1. Butlers (in charge)	Rs. 146	Rs. 1752
2. Butlers (Under Steward)	Rs. 141	Rs. 1692
3. Ch. Cook & Bakers (single)	Rs. 136	Rs. 1632
4. Ch. Cook & Bakers (Separately)	Rs. 126	Rs. 1512
5. Engine & Deck Serangs	Rs. 121	Rs. 1452
6. Quartermasters	Rs. 116	Rs. 1392
7. Butchers	Rs. 106	Rs. 1272
8. 2nd Cooks	Rs. 103	Rs. 1236
9. 1st Deck Tendals & Pantrymen	Rs. 101	Rs. 1212
10.1st Engine Tendals & Saloon Waiters Rs. 100		Rs. 1200
11.Saloon waiters	Rs. 90	Rs. 1080
12.Engine & Deck 2nd Tendals & Deck Cassabs Rs. 84		Rs. 1008
13.Engine 3rd Tendals, Cassabs, Donkeymen & 14.Deck Winchmen	Rs. 78	Rs. 936
15.Greasers	Rs. 75	Rs. 900
16.Engine & Deck Bhandaries	Rs. 60	Rs. 720
17.Sailors (Lascars)	to Rs.70	to Rs. 900
18.Firemen	Rs. 69	Rs. 828
19.Topaz	Rs. 66	Rs. 792
20.Coal Trimmers	Rs. 54	Rs. 648
21.Bhandary's Mates	Rs. 36	Rs. 432

সূত্রঃ Intelligence Branch ফাইলে Indian Seamen's Union, Calcutta, September, 1945 অংশ থেকে তালিকাটি গৃহীত।

০৫.০৫.১৯৪৫ তারিখে ইউনিয়ন একটি অনুষ্ঠিত সভায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, ভারত সরকার এবং শিপিং কোম্পানিগুলিকে জানিয়ে একটি রেজোলিউশন পাশ করেছিল। এই রেজোলিউশনে বলা হয় যে ইউনিয়ন কোন ভাবেই নাবিকদের বর্তমান মজুরি হ্রাস করার বিষয়টি মেনে নেবে না এবং কোন মীমাংসা ছাড়াই শিপিং কোম্পানিগুলি নাবিকদের বেতন হ্রাস কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সাধারণভাবে নাবিকরা কাজ বন্ধ করে দেবে ও ইন্টারন্যাশানাল ট্রান্সপোর্ট

ওয়ার্কার ফেডারেশন সীমেন্স ইউনিয়নের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে। এছাড়া অক্টোবর পর্যন্ত যুদ্ধকালীন মজুরি কমানোর বিষয়ে সমস্ত আলোচনা থেকে বিরত থাকবে। আফতাব আলী মনে করেছিলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ITF -কে নাবিকদের দ্বারা সমর্থন করা গেলে ITF মালিকদের মজুরি বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারবে। উপরোক্ত রেজোলিউশনকে কলকাতায় লাইনার্স কনফারেন্সে প্রেরণ করা হয় যেখানে আফতাব আলি বলেছিলেন যদি কোন মজুরি কাটা হয় তাহলে রেজলিউশনটিকে সকলেই ধর্মঘটের নোটিশ হিসাবে ধরে নেবে। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা মজুরি হ্রাসের আশঙ্কা বুঝে ইউনিয়ন চটজলদি প্রচার শুরু করেছিল এবং ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিয়েছিল। আফতাব আলি জাহাজ মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এটা রিপোর্ট করা হয়েছিল যে ইউনিয়ন সংগঠকরা নাবিকদের কাজ স্থগিত করার জন্য তাদের স্বাক্ষর নিয়েছিল। যুদ্ধ বোনাস প্রত্যাহার করার জন্য বোট, জাহাজ বা কোনো বন্দরে কিংবা মহাসমুদ্রের জাহাজে কর্মরত ইউনিয়ন সংগঠক নাবিকদের কাজ স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছিল। ইউনিয়ন ITF থেকে একটি অফিসিয়াল সার্কুলার জারি করেছিল এবং শিপিং কোম্পানিগুলির দ্বারা মূল বেতন ও যুদ্ধকালীন বেতন হ্রাসের বিরোধিতা করার জন্য অনুমোদিত সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলি আরও বলেছিলেন বিদেশী পোর্টে যখন ধর্মঘট শুরু হয় তখন ভারতীয় নাবিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার জন্য তাদের বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। ইউনিয়ন লন্ডনে সুরাত আলীর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেছিল যাতে বলা হয়েছিল জাহাজের মালিকরা যত শীঘ্র সম্ভব বোনাস কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেরিটাইম বোর্ড আগামী নভেম্বরে মেরিটাইম সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রস্তাবিত পদক্ষেপ স্থগিত করার জন্য যোগাযোগ করেছে। এই চিঠির বিষয়ে আলোচনা করে আফতাব আলি পরামর্শ দেন যে ধর্মঘটই তাদের একমাত্র পথ এবং এই ধরনের মজুরি কমানোর প্রথম পদক্ষেপে একটি ধর্মঘট কমিটি গঠন করা উচিত। তার নির্দেশে নাবিকদের ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত করার চিঠিটি ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হয়েছিল। চিঠিটিতে নাবিকদের অধিকারের বিষয়টি সচেতন করা হয়েছিল যা শিপিং মালিকদের বিরুদ্ধে নাবিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বেঙ্গল সেলুন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ITF -এর সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে ধর্মঘট শুরু করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতি নিয়েছিল আবার যারা বন্দরকেন্দ্রিক অস্থায়ী কর্মী ছিল তারাও কাজ বন্ধ করে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল।

এরকম পরিস্থিতিতে সরকার শিপিং কোম্পানিগুলিকে সহযোগিতা করলে বিশ্বের সমস্ত বন্দরে নাবিকেরা সাধারণ ধর্মঘট শুরু করেছিল।[৫৫]

আফতাব আলি নাবিকদের থাকার জন্য ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কলকাতায় বেশ কয়েকটি (lathi house) লাঠি ঘর চালু করেছিলেন, সিলেট জেলার নাবিকেরা অন্য নাবিকদের চেয়ে বেশ আক্রমণাত্মক এবং ধর্মঘটের ক্ষেত্রে উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছিল। স্থানীয় নাবিকদের সংগঠিত করতে এবং তাদের সমর্থনের জন্য তিনি সম্প্রতি বোম্বে গিয়েছিলেন এবং সেখানে স্থানীয় সংগঠকদের ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি Dinkar Desai এবং তাঁর নাবিক সংস্থার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। আফতাব আলি তাঁর বর্তমান বিবৃতিতে এবং বোম্বেতে তার দ্বারা সম্বোধন করা একটি প্রেস কনফারেন্সে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির উপর ইউনিয়নের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন।[৫৬]

বিংশ শতকে দুই বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী পরিস্থিতি শুধুমাত্র নাবিকদের জীবন মরণের প্রশ্ন হয়ে ওঠেনি এর পাশাপাশি যুদ্ধজনিত কারণে দৈনন্দিন মূল্যবৃদ্ধি তাদের কর্মজীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। পরিবার এবং প্রিয়জনেদের সঙ্গে নিয়ে জীবনের দৈনন্দিন ব্যয়ভার বহন করা তাদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এজন্য তারা যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের উপযুক্ত মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিদাওয়াগুলি উত্থাপন করেছিল, অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কলকাতা বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া বহু টর্পেডো জাহাজের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল যেখানে বাংলার অসংখ্য নাবিক আহত, নিহত এবং নিরুদ্দেশ হয়েছিল। জাহাজে এই অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলির জন্য নাবিকদের বেতন বর্ধিত করা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির একান্ত কাম্য ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নাবিকদের অভাব অভিযোগের বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করার ফলে শিপিং কোম্পানিগুলি এবং মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের শোষণ করার সুযোগগুলি অব্যহত থাকায় নাবিকেরা সংগঠিত হয়ে ধর্মঘট, সভা সমাবেশ এবং আন্দোলনের মধ্যদিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এর ফলস্বরূপ নাবিকদের দাবিদাওয়াগুলি অনেকাংশে পূরণ হতে দেখা গিয়েছিল যা তাদের জীবন এবং কর্মধারাকে অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যেতে সম্ভবপর হয়েছিল। তবে সভা সমাবেশ এবং আন্দোলনগুলিকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বাংলায় গড়ে ওঠা সীমেন্স ইউনিয়নগুলি বিশেষ ভূমিকা বহন করেছিল।

১.৫. বাংলার জাহাজী নাবিকদের পাশাপাশি কলকাতা বন্দরকেন্দ্রিক শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে সমাবেশ এবং ধর্মঘট:

বাংলার জাহাজী নাবিকদের কর্মস্থলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা বন্দর। ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী হওয়ার সুবাদে এই বন্দরের সঙ্গে বিশ্বের উন্নতধর দেশগুলির বন্দরের সরাসরি যোগ ছিল। এই বন্দরটি বোম্বে, মাদ্রাজ এবং সিঙ্গাপুরের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই এই বন্দরকে কেন্দ্র করে শিল্প নগরী হিসাবে শহর কলকাতার পত্তন ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ লাভ ঘটেছিল এবং এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে উপকূলীয় ও নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্যকে চালিত করেছিল। তবে এই ক্ষেত্রটিতে কর্মসঞ্চালনের জন্য বন্দর শ্রমিক, জাহাজ এবং বোটে কর্মী নাবিকেরা একমাত্র প্রধান অবলম্বন ছিল।[৫৭] অনিরুদ্ধ বোস ঊনবিংশ শতকের ছয়ের দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কলকাতা শহর বন্দর এবং হুগলী নদীকেন্দ্রিক কর্মীদের কর্মগত সমস্যা এবং তাদের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৫৮] কলকাতা বন্দরের গঠন সম্পর্কিত ইতিহাস নিয়ে নীলমণি মুখার্জী *"The Port of Calcutta, A short History"* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে কলকাতা বন্দরের বিকাশলাভ এবং ১৮৭০ সালের পঞ্চম আইনে কলকাতা পোর্ট কমিশনারের দ্বারা কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গঠনের ফলে কলকাতা বন্দরের পরিকাঠামোগত উন্নতিসাধন হতে দেখা গিয়েছিল।[৫৯]

এই বন্দর ধীরে ধীরে বাংলার নাবিকদের কর্মস্থল হয়ে উঠেছিল যার ফলে বন্দর সংলগ্ন এলাকাতে এদের চলাফেরা এবং বসতি স্থাপন করতে দেখা গিয়েছিল। নাবিকেরা মূলত বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে মেস বাড়ি ভাড়া করে কলকাতার বন্দর সংলগ্ন এলাকায় থাকতে শুরু করেছিল। এইসব লস্কর নাবিকদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে R. J. Minney তাঁর "*Night life of Calcutta*" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন কলকাতা বন্দরকে পর্যবেক্ষণ করতে গেলে ওয়াটগঞ্জ থেকে দেখতে হবে। এই ওয়াটগঞ্জ থেকে কলকাতা বন্দরের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় তা হল কলকাতা বন্দরের জেটি, নোঙরযুক্ত ঘাট, ব্যাস্ত স্ট্যান্ড রোড, স্টিমশিপ কোম্পানির উচ্চ কার্যালয়, পোর্ট হাউস এবং বহনকারী গরুর গাড়ি যা জাহাজের পণ্যগুলি এক পথ থেকে অন্য পথে নিয়ে যেত। কিন্তু এটি লক্ষ্য করা যায়নি যে লস্করেরা শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের সঙ্গে প্রায়শই আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকত। একটি সমুদ্রযাত্রা শেষ করার পর তাদের কর্মবিরতির সময় নাবিকরা কর্মমুক্তির আনন্দ উপভোগ করত। এই

সামুদ্রিক জীবন ব্যবসা–বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়াটগঞ্জে অদ্ভুতভাবে একটি ইন্ডিয়ান কফি হাউসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল যার বিবরণ ইউরোপীয় নাবিকদের কাছ থেকে জানা যায়। এছাড়া সুরার দোকানগুলিতে অনেক দেশীয় এবং বহু জাতির মানুষেরা মিশ্রিত হয়ে উৎশৃঙ্খলভাবে বিনোদনে নিযুক্ত থাকত। মিন্নি (Minney) নাবিকদের এই বিশৃঙ্খলা পরায়ন জীবনযাপন সম্পর্কে বেশকিছু রোমাঞ্চকর উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন আরবের চায়ের ঘরগুলি (Tea Room) যেন রূপকথার সেই বিস্ময়কর বই "দ্য আরাবিয়ান নাইটস" থেকে তুলে ধরা হয়েছে। কুলি ছাউনিগুলি এবং কুলি বাজারের জায়গায় খুব কালো দেহের এবং খালি পায়ের মানুষগুলি একটি কোলাহলপূর্ণ শয়তানের ন্যায় বিনোদনে নৃত্য করছে। জাপানীদের অবনমিত টুপি এবং গ্রীষ্মকালীন ভারী রঙিন কিমোনোস (Kimonoes) পোশাক পরিহিত নারীদের দেখতে অপরূপ সুন্দর দেখায় যেন সেটি Asahi Beer -এর রঙিন বিজ্ঞাপন থেকে বেরিয়ে এসেছে যা মূলত থিয়েটারেই দেখা মেলে। ওয়াটগঞ্জের যেকোনো রাতে আফিমের আস্তানা, জুয়ার নরক এবং সুন্দরী নারীদের আবাসন ঘিরে নাবিকেরা উন্মত্ত থাকত।[৬০] দীর্ঘ একটি সমুদ্রযাত্রার পর সেই গ্লানি কাটিয়ে ওঠার জন্য এই উৎশৃঙ্খল এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবন জাহাজ কর্মে নিযুক্ত লস্করদের মধ্যে দেখা গেছে ঠিকই, তবে ব্রিটিশ লেখনীর দ্বারা বর্ণগত এবং জাতিগত সংস্কৃতির বিষয়টি অনেকটা অতিরঞ্জিত করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি নিদর্শন বহন করেছে।

তবে নাবিক এবং বন্দর শ্রমিকদের কলকাতা বন্দরকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে কর্মগত দিকগুলি বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে। বিংশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতার বন্দর সংলগ্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বসতি সম্পন্ন অঞ্চলে বন্দর শ্রমিক এবং নাবিক শ্রমিকদের সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। এই নাবিক এবং বন্দর শ্রমিকরা পৃথক পৃথক ভাবে দাবিদাওয়া করলেও পরবর্তীকালে একত্রিত হয়ে তাদের অভিযোগগুলিকে শিপিং মালিকদের কাছে উত্থাপন করেছিল। ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের দ্বারা নাবিকদের ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে দাবিগুলি পূরণ হতে দেখা দিলে বন্দর শ্রমিকেরা সম্মিলিত হয়ে তাদের দাবিগুলি সুনিশ্চিত করে মালিক পক্ষের কাছে জানিয়েছিল। জাহাজ এবং কলকাতা বন্দরকেন্দ্রিক শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এই ইউনিয়নটি ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ মেরিন বিভাগের শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। আফতাব আলি এই ইউনিয়নের

শ্রমিকদের সংগঠিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[৬১] এই ইউনিয়নটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ইরা মিত্র কলকাতা ও খিদিরপুর ডক শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলনগুলি অনেকটাই বামপন্থী ঘেঁষা বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম দিকে আন্দোলনগুলি তেমন কিছু সাফল্যলাভ না করলেও পরবর্তী সময়গুলিতে শ্রমিকদের অধিক সংখ্যক অনুপ্রবেশ এবং ইউনিয়ন গঠনের ফলে তাদের দাবিদাওয়া মালিক পক্ষের কাছে উত্থাপন করা অনেকটা সহজসাধ্য হয়েছিল। ১৯২৮ সালের প্রথমদিকে বন্দর শ্রমিক এবং বহিরাগত কর্মীদের নিয়ে "পোর্ট ট্রাস্ট ও মেরিনার্স ইউনিয়ন" গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। এই ইউনিয়নের সভা সমাবেশগুলিতে বন্দর শ্রমিক ছাড়াও বঙ্গীয় কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমিক দলের ইউনিয়নের শ্রমিকেরাও যোগদান করেছিল যা কলকাতার বন্দর এবং নাবিক শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল।[৬২]

আফতাব আলির নেতৃত্বে কলকাতায় বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সক্রিয় ভূমিকাগ্রহণ করেছিল। এই সময় ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন আফতাব আলি এবং জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন ফয়েজ আহ্মেদ। এই ইউনিয়নটি ছিল একটি রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন এবং এর সদর দপ্তর ছিল কলকাতার ২৭ বি, সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড খিদিরপুরে। এই ইউনিয়নটি কলকাতা পোর্ট শ্রমিকদের সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। ইউনিয়নটিতে ১৯৪৩ সালের ৫ই জুন পোর্ট কমিশনারের অধীনস্থ মেরিন বিভাগের কর্মচারীগণের নানাবিধ অভাব-অভিযোগ ও চেয়ারম্যানের সাথে মিঃ আফতাব আলির সাক্ষাতের ফলাফল এবং আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এছাড়া মুরিং মাস্টার ও ডক মাস্টারের অধীনস্ত সমস্ত কর্মীবৃন্দদের আলোচনায় সংগঠিত হয়ে যোগদানের কথা বলা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর ISU মিটিং হলে পোর্ট শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে কিছু দাবি নিয়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা উল্লেখিত হয়েছিল। যেখানে বিমান আক্রমণে হতাহত সদস্যদের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং ক্ষতিপূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ করার কথা বলা হয়, এছাড়া ডকের ভিতরে উপযুক্ত আশ্রয়স্থল এবং ডকের বাইরে নিরাপদ বাসস্থানের দাবি জানানো হয়। বিমান আক্রমণে পোর্ট শ্রমিকদের সর্তকতার জন্য স্থানীয় ARP (Air Red Precautions) কর্তৃপক্ষের উপদেশ দেওয়ার কথা বলা হয়। পোর্ট শ্রমিকদের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ এবং সম্ভব হলে একটি ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করা হয়। পোর্ট

শ্রমিকদের খোরাকি সম্বন্ধে কিছু অভাব অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং প্রেসিডেন্টের মতানুসারে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করার কথা বলা হয়।[৬৩]

এই ইউনিয়ন কেবলমাত্র বন্দরকেন্দ্রিক জল পরিবহণ শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করেছিল। এই জল পরিবহণ শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরনের জলযানগুলিতে (হেভ-আপ বোট, নোঙর জাহাজ, হাসোর বোট, লঞ্চ, জেলি বোট, ডক লস্কর, টাগ বোট প্রভৃতি) মুরিং মাস্টার এবং ডক মাস্টারের অধীনে কর্মে লিপ্ত হয়েছিল।[৬৪]

জেটি কুলিরা তাদের দাবিদাওয়া উত্থাপন করলে মিঃ গডবোলে জেটি কুলিদের উদ্দেশ্যে বেশকিছু নির্দেশিকা জারি করেছিল।[৬৫] যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ-

১) মাসিক বেতন বৃদ্ধি করা যাবে না।

২) ওভারটাইমের জন্য বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে ২ টাকা প্রতি ঘণ্টায় বাড়ানোর কথা বলা হয়। এই বর্ধিত হারে প্রয়োজন পড়লে শ্রমিকদের কাজ করা উচিত বলে বিবেচিত হয়।

৩) যারা পোর্ট কমিশনারের কোয়ার্টারে বিনামূল্যে বসবাস করবে না তাদের প্রতি মাসে ১:৮:০ হারে গৃহভাতা দেওয়া হবে।

৪) ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্টের দ্বারা সমস্ত জেটি কুলিদের নিয়োগ এবং বরখাস্ত করা হবে।

৫) ছুটির সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে না। তবে প্রত্যেক হিন্দু কুলিকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ছুটির দিনগুলিতে বেতন ছাড়াও রবিবারের হিসাব ধরে ১২ টাকা ভাতা এবং প্রতিটি মুসলিম কুলিদেরও তাদের ধর্মীয় ছুটির দিনগুলিতে অনুরূপ ভাতা প্রদান করা হবে।

৬) এক বছরের কম কর্ম পরিষেবা প্রদানকারী জেটি কুলিদের ক্ষেত্রেঃ-

ক) এক বছরের কম কর্ম পরিষেবা প্রদানকারী কুলিদের চিকিৎসা পত্র ছাড়া কোনো পূর্ণ বা অর্ধবেতনের ছুটি প্রদান করা হবে না।

খ) মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের উপর ৭ দিনের পূর্ণ বেতনের ছুটি মঞ্জুর করা হবে।

৭) এক বছর বা তার অধিক কর্ম পরিষেবা প্রদানকারী জেটি কুলিদের ক্ষেত্রেঃ-

ক) একবছর বা তার অধিক কর্ম পরিষেবা প্রদানকারী জেটি শ্রমিকদের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ছাড়া বছরে ১৪ দিনের পূর্ণ বেতনের ছুটি দেওয়া হবে।

খ) মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের উপর ৭ দিনের পুরো বেতন ও ৭ দিনের অর্ধেক বেতনের ছুটি মঞ্জুর করা হবে।

এই দুটি নিয়মের পূর্ণ সুবিধা জেটি কুলিরা যাতে বাস্তবে পায় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হত।

৮) এছাড়াও বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের কথা বলা হয় যা জেটি কুলিদের দাবিগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

প্রায় ১,৫০০ জন জেটি শ্রমিক ১০ই ডিসেম্বর ধর্মঘটে যোগদান করেছিল। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শ্রমিকদের অনুকূলে আসায় তারা পুনরায় কাজ শুরু করবে ঠিক করেছিল কারণ কর্তৃপক্ষ তাদের বেশিরভাগ দাবি বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছিল। শ্রমিকেরা ঐ দিনে ১১.৩০ ঘটিকায় একটি ডেপুটেশনে কর্তৃপক্ষের জন্য অপেক্ষা করেছিল এবং সেখানে চেয়ারম্যানের নির্দেশে জেটি সুপারিন্টেনডেন্ট ডেপুটেশনকারীদের জানিয়েছিল যে কর্তৃপক্ষ সাধারণ বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নটি ছাড়া ধর্মঘটীদের সমস্ত দাবি বিবেচনা করতে প্রস্তুত। প্রতিনিধিরা পরামর্শ দেন যে সুপারিন্টেনডেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে হরতালকারীদের বৈঠকে যেতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিষয়টি তাদের অবগত করতে হবে। জেটি সুপারিন্টেনডেন্ট, সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ মৈত্র এবং শেড মাস্টার ওয়ালটনকে টাউন হলের বিপরীতে সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পাঠানো হয় সেখানে ১,৫০০ জনেরও বেশি কর্মী উপস্থিত ছিল। সেই উপস্থিত সভায় ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারি মিঃ ডি. পি. গডবোলে সভাপতিত্ব করেন এবং মিঃ মৈত্র সহকারী হিসাবে ছিলেন। সুপারিন্টেডেন্ট বন্দর কমিশনারদের চেয়ারম্যানের আদেশ জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে কর্তৃপক্ষ তাদের নিম্নলিখিত দাবিগুলি বিবেচনা করতে প্রস্তুতঃ- ১) যারা P. C. কোয়ার্টারে বসবাস করছে না তাদের গৃহভাতা প্রদান করা। ২) ওভারটাইমের বর্তমান হার বৃদ্ধি করা। ৩) প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করা। ৪) ঘুষ দেওয়া ও নেওয়ার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে দোষী সাব্যস্ত করে বরখাস্ত করা। ৫) বর্তমানের মতো অর্ধদিবসের বেতনের পরিবর্তে ছুটির দিনে পুরো দিনের বেতন মঞ্জুর

করা। ৬) এক বছরে ১৪ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করলে শ্রমিকরা নির্ধারিত দিনের বেশি যতদিন অনুপস্থিত থাকবে ততদিনের বেতন কর্তন করা।[৬৬] এরপর শ্রমিকরা পুনরায় কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা এও মীমাংসা করে যে কর্তৃপক্ষকে এগুলি ছাড়াও ধর্মঘটের সময়ের জন্য শ্রমিকদের সাধারণ মজুরি বৃদ্ধি এবং পূর্ণ মজুরির প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হবে। দুই মাসের মধ্যে কোন সন্তোষজনক ফলাফল না পাওয়া গেলে হারতালকারীরা কর্তৃপক্ষকে আর কোনো নোটিশ না দিয়ে সরাসরি ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।[৬৭] এভাবে বন্দরকেন্দ্রিক শ্রমিকেরা তাদের অভাব অভিযোগগুলি পূরণ করার দাবিতে আন্দোলন এবং ধর্মঘটের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

১.৬. উপসংহার:

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর বাংলায় ক্রমপর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে ওঠার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ধর্মঘট সংগঠিত করার স্পৃহা জেগে উঠেছিল। এই ধর্মঘট এবং আন্দোলনগুলি সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকতা এবং জোরালো রূপ ধারণ করে যা ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত চলেছিল। বিভিন্ন শ্রেণী শ্রমিকদের পাশাপাশি সীমেন্স ইউনিয়নের ছত্রতলে বাংলায় সংগঠিত জাহাজী শ্রমিকদের ধর্মঘটগুলি ছিল লক্ষ্যণীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মাত্রাতিরিক্ত ঔপনিবেশিক শোষণ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে এদের জীবনযাত্রা সংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে ইউরোপীয় এবং বাংলার নাবিকদের মধ্যে বর্ণগত বৈষম্যতার জন্য বেতনের বিভাজন, জাহাজে খাদ্য, দ্রব্য এবং বাসস্থান জনিত ফারাক দেখা গিয়েছিল। অন্য দিকে ঘাট-সারেং ও দালালদের শোষণ এবং বিশ্বযুদ্ধে হতাহত ক্ষতিগ্রস্ত নাবিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্য সীমেন্স ইউনিয়ন দ্বারা বহু আন্দোলন এবং সমাবেশ হতে দেখা গিয়েছিল। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠারত ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমানটি ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) নামে পরিচয় লাভ করে যা বাংলার নাবিকদের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। বাংলায় ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের (ISU) প্রথম সারির সাম্মানিক সদস্যদের মধ্যে মহম্মদ দাউদ ছিলেন অন্যতম। তার জীবনবৃত্তান্তের খুঁটিনাটির ইতিহাস সেভাবে পাওয়া যায়নি তবে তিনি কলকাতার আলিপুর কোর্টের একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি ক্যালকাটা ট্রামওয়ে এমপ্লয়িজ (Calcutta Tramways Employees), আঞ্জুমান-ই-খানসামা (Anjuman-i-Khansamas) ইউনিয়ন দুটির সহ-সভাপতি হিসাবে

দায়িত্ব সামলেছিলেন এবং বহু সক্রিয় অরাজনৈতিক শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তার নাবিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি জল পরিবহণ শ্রমিকদের জীবনে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। নাবিকদের দুর্দশার বিষয়গুলি পরিলক্ষিত করে তিনি নাবিক স্বার্থে তার বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে পরিচালিত করেছিলেন।[৬৮] এছাড়া এ. এইচ. জাহির আলা, আফতাব আলি, মহবুবুল হক, আব্দুল মতিন চৌধুরী, সৈয়দ মিন্নাত আলি, মানফুর খান, মুজাম্মিল আলি প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে আন্দোলন এবং ধর্মঘটগুলিকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির অর্থনৈতিক সংকট ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের উপর প্রভাব ফেলেছিল যদিও নাবিকদের বহু কিছু সমস্যার মধ্যেও ইউনিয়ন নাৎসি এবং ফ্যাসিস্ট শক্তির ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্বক তাণ্ডবলীলাকে অবদমিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগিতা থেকে নাবিকদের বিরত রাখেনি। তবে নাবিকদের বেতন বৃদ্ধি এবং যুদ্ধকালীন সুরক্ষার জন্য সর্বদা ঔপনিবেশিক শক্তিকে বারংবার নাড়া দিয়েছিল। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল নাবিকদের নিরাপত্তার জন্য শিপিং কোম্পানিগুলিকে নিরাপত্তা জনিত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই বিষয়গুলি গভর্নমেন্ট এবং শিপিং মালিক কর্তৃক কর্ণপাত না করার প্রত্যাখ্যান মূলক বার্তাগুলি নাবিকদের ধর্মঘটে অংশ নিতে বাধ্য করেছিল। ISU পরিচালিত সংগঠিত নাবিকদের ধর্মঘট এবং সংগ্রাম তাদের আশু সমস্যাগুলি অনেকাংশে কাটিয়ে তুলতে পেরেছিল অন্যদিক কলকাতা বন্দর শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা ছিল কারণ এই শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে ঠিকা শ্রমিক বা চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত ছিল। তারা একটা নির্দিষ্ট সময়কাল কাজ করে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। নাবিকদের দীর্ঘ সময়কালীন জাহাজে কর্মজীবনের শাসন এবং শোষণের গ্লানিকর ক্ষোভ জাহাজের পাঠাতনে সম্পাদিত হয়নি যা একটি নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রা পরিসমাপ্তি করে স্বদেশে ফিরে কলকাতা বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে শিপিং কোম্পানির বিরুদ্ধে ধর্মঘট এবং আন্দোলনগুলির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই নাবিকদের দ্বারা ধর্মঘট এবং সংগ্রামগুলি বন্দর শ্রমিকদের প্রভাবিত করেছিল এর ফলস্বরূপ কলকাতা বন্দরের শ্রমিকেরাও সংগঠিত হয়ে আন্দোলন করেছিল। কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে জেটি, কুলি এবং ওয়াটার-সাইড ওয়ার্কারেরা তাদের মজুরি বৃদ্ধি, গৃহভাতা (House allowance) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বিমান আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের দাবি জানিয়েছিল। বন্দরের শ্রমিকেরা

তাদের কর্ম দিবসের সংখ্যা খুবই কম থাকার জন্য এবং শ্রমিকদের অনুপস্থিতি জনিত কারণে অতিরিক্ত বেতন কাটার জন্য ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU), পোর্ট ট্রাস্ট মেরিনার্স এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার ইউনিয়ন (IQMU), ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন বন্দরকেন্দ্রিক শ্রমিক বা ওয়াটার-সাইড ওয়ার্কারদের দাবিদাওয়াগুলি শিপিং মালিক ও কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত করেছিল। যেখানে মালিক পক্ষ এই কর্মী নাবিকদের দাবিদাওয়াগুলির প্রতি কোনো কর্ণপাত করেনি। আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পুঁজিশক্তির পৃষ্ঠপোষক হওয়ার ফলে পুঁজি মালিকদের উপর শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করে গিয়েছিল। এই উপেক্ষাগুলিই ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের শ্রেণী চেতনা এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিষয়টির প্রতি অবগত হয়ে সীমেন্স ইউনিয়নের ছত্রতলে থেকে আন্দোলন, সমাবেশ এবং ধর্মঘট সংগঠিত করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল যারফলে পরবর্তী দিনগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নাবিকদের দাবিগুলির প্রতি অনেকটা নমনীয় হয়েছিল।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১। ইরফান হাবিব, *ভারতের অর্থনীতি, ১৮৫৮ - ১৯১৪,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৭, পৃ. ১৩৫।

২। Rajat Ray, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflicts of Interests in Calcutta City Politics, 1875 – 1939,* Calcutta, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979, p. 84.

৩। *Ibid.,* pp. 83 - 84.

৪। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০–২০০০,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৫১।

৫। G. Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870 – 1945,* New Delhi, Oxford University Press, p. 95.

৬। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, pp. App. – XIII, LXXXI, LXXXII.

৭। IB 123/23 (123/1923)

৮। IB 123/23 (123/1923)

৯। File No. ADMN – 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

১০। IB 123/23 (123/1923)

১১। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-I, p. 4.

১২। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-III, p. 50.

১৩। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-II, pp. 26-27.

১৪। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-III, pp. 50-51

১৫। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-III, p. 51.

১৬। File No. ADMN – 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

১৭। File No. ADMN – 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

১৮। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-II, p. 9.

১৯। File No. ADMN – 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

২০। Laura Tabili, *"We Ask for British Justice", Workers and racial difference in late imperial Britain,* New York, Cornell University Press, 1994, p. 44.

২১। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, Part-II, p. 9.

২২। *Ibid.,* p. 9.

২৩। *Ibid.,* pp. 9 - 10.

২৪। *Ibid.,* pp. 10 - 11.

২৫। *Ibid.,* pp. 11 – 13.

২৬। *Ibid.,* p. 13.

২৭। *Ibid.,* p. 14.

২৮। *Ibid.,* pp. 14-15.

২৯। *Ibid.,* p. 15.

৩০। *Ibid.,* pp. 15-16.

৩১। *Ibid.,* p. 16.

৩২। *Ibid.,* pp. 17-18.

৩৩। গণবাণী, ১১ই আগস্ট ১৯২৭, পৃ. ১।

৩৪। File No. ADMN – 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৩৫। Suchetana Chattopadhyay, *An Early Communist, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913 -1929,* New Delhi, Tulika Books, 2011, p. 258.

৩৬। স্বাধীনতা, ৩০শে নভেম্বের, ১৯৪৬।

৩৭। IB 75/27 (34/1934)

৩৮। IB 75/27 (34/1934)

৩৯। Rozina Visram, *Asians in Britain: 400 Years of History,* London, Pluto Press, 2002, pp. 235 – 253.

৪০। G. Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870 – 1945,* New Delhi, Oxford University Press, 2012, pp. 64 – 65.

৪১। IB 75/27 (34/1934)

৪২। IB 75/27 (34/1934)

৪৩। IB 75/27 (34/1934)

৪৪। IB 75/27 (34/1934)

৪৫। IB 75/27 (34/1934)

৪৬। IB 75/27 (34/1934)

৪৭। IB 75/27 (34/1934)

৪৮। Laura Tabili, *"We Ask for British Justice", Workers and racial difference in late imperial Britain,* New York, Cornell University Press, 1994, pp. 162 – 163.

৪৯। IB 75/27 (34/1934)

৫০। File No. ADMN – 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৫১। File No. ADMN – 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৫২। File No. ADMN – 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৫৩। File No. ADMN – 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union, KPT Library.

৫৪। IB 75/27 (34/1934)

৫৫। IB 75/27 (34/1934)

৫৬। IB 75/27 (34/1934)

৫৭। Aniruddha Bose, *Class Conflict and Modernization in India, The Raj and the Calcutta Waterfront (1860-1910)*, New York, Routledge, 2018, pp. 35-36.

৫৮। *Ibid.,* pp. 117-138.

৫৯। Nilmani Mukharjee, *The Port of Calcutta, A Short History*, Calcutta, The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968, p. 53.

৬০। R. J. Minney, *Night life of Calcutta*, Calcutta, The Muston Company by K. C. Neogi, Nababhakar press, 1922, pp. 57-58.

৬১। রঞ্জিত সেন (সম্পাদক), *বাংলার শ্রমশক্তি*, ইরা মিত্র, *কলকাতা ও খিদিরপুর ডকে শ্রমিক সংগঠনের প্রথম তিন দশক ১৯০৫-১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ*, কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৬৭।

৬২। *তদেব,* ৬৮।

৬৩। File No. ADMN – 6612/7, Bundle No. 76PT-1, 1943, Bengal Mariner's Union, KPT Library.

৬৪। File No. ADMN – 6612/7, Bundle No. 76PT-1, 1943, Bengal Mariner's Union, KPT Library.

৬৫। File No. ADMN – 6640/2, Bundle No. 60PT-5, 1927, Strike of docks and Jetty coolies & others, KPT Library.

৬৬। 'Forward' daily newspaper on 04.01.1928.

৬৭। 'Forward' daily newspaper on 04.01.1928.

৬৮। Rajat Ray, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflicts of Interests in Calcutta City Politics, 1875 – 1939,* Calcutta, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979, p. 96.

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলায় নদীকেন্দ্রিক ও উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন

১.১. ভূমিকা:

বহির্দেশীয় সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মসম্পাদনের সঙ্গে নদীকেন্দ্রিক ও উপকূল বাণিজ্যে ব্যবহৃত জলযানগুলিতেও বাংলার নাবিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই জলযানগুলিতে নাবিকদের কর্মজীবনের পাশাপাশি বাংলার নদীগুলির ভৌগলিক অবস্থানগত দিক, নদীগুলির প্রকৃতি, নদীর সঙ্গে সংযুক্ত খালপথ, কলকাতা বন্দর এবং আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদী ঘাটগুলিও বাংলার নাবিক জীবনের সঙ্গে আলোচনার খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। তবে বাংলায় অগণিত নদ-নদীর ভৌগলিক বিবরণটি খুবই আকর্ষণীয় যেটি বাংলার পৌরাণিক সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কালপর্বের নিরিখে এটি গবেষণা কার্যের মূল আলোচ্য বিষয় না হলেও পূর্বকালে বাংলার মানুষের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বয়ে আসা নদ-নদীগুলির মধ্যে বহু নদ-নদীই ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বাংলার (এখানে অবিভক্ত বাংলা হল পূর্ববঙ্গ যা বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ এবং এরই সঙ্গে বর্তমান অসম, বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের সামান্য কিছুটা অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল) মধ্যে বিচরণ করেছে। পার্বত্য অঞ্চলের বরফ গলা জলের নদীগুলি ছাড়াও বাংলায় বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্ট হয়ে বহু নদ-নদী উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমির দিকে জলের প্রবাহমানতার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বাংলায় প্রবাহমান নদীগুলির গতি প্রবাহকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় অনেক নদ-নদীই বাংলার পূর্ব এবং পশ্চিম অংশের ভৌগলিক সীমারেখা জনিত বিভাজনকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে চলেছে যা কখনো একে অপরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে, আবার কখনো বিভাজিত হয়ে স্থান ভেদে নাম পরিবর্তন করে জলপথকে সম্প্রসারিত করেছে। বাংলার উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল গঙ্গা নদীর প্রধান শাখা পদ্মা এবং অপ্রধান শাখা হুগলী। এছাড়া মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা, তোর্সা, বুড়িগঙ্গা, সুর্মা, কর্ণফুলী, কুশিয়ারা, মাথাভাঙ্গা, চিত্রা, ফেনী, কপোতাক্ষ, বংশী, মহানন্দা, আত্রাই, জলঙ্গী, দামোদর, রূপনারায়ন,

অজয়, জলঢাকা, সুবর্ণরেখা, ইছামতী, আদিগঙ্গা প্রভৃতি। এই অসংখ্য নদ-নদীগুলিকে নির্ভর করে বাংলায় যুগযুগ ধরে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য বিকশিত হতে দেখা গিয়েছিল। এই নদীগুলির প্রবাহমান ধারা নিম্নে বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়ার ফলে নদীপথ ধরে আদিকাল থেকে কমবেশি বহির্দেশীয় সমুদ্র বাণিজ্যও সংগঠিত হয়েছিল। 'মনসামঙ্গল' কাব্যেও বাংলার নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের চিত্র ফুটে উঠেছিল।[১] আদিযুগে বাংলায় নদী তীরবর্তী এবং সমুদ্র উপকূলবর্তীর অধিবাসীরা বাংলার নদীপথে ভেলা, ডিঙ্গি এবং পালযুক্ত নৌকার মতো জলযানগুলি ব্যবহার করত এবং এরা বংশ পরম্পরায় আদিকাল থেকে এই জলযানগুলির সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখেছিল যা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই, একথা চর্যাগীতিতেও উল্লেখ আছে।[২] বাংলার নদীপথে চলাচলকারী ভাসমান এই জলযানগুলি যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়েছিল। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা আদিযুগ থেকে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তিত হয়েছিল। আধুনিক সময়ে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন বাংলায় এই বাণিজ্যের চিত্রপটটি ছিল অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির। এসময় বাংলার নদীপথ ধরে উন্নত জলযানগুলি বহির্দেশীয় সমুদ্র বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল এবং এরই সঙ্গে নদী ও খালপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটতে দেখা গিয়েছিল। বাংলায় নদীগুলির ভৌগলিক অবস্থানগত দিক বহির্দেশীয় বাণিজ্যের সঙ্গে নদীকেন্দ্রিক অন্তর্বাণিজ্যের পারস্পারিক সংযোগসাধন ঘটিয়ে একটি আত্মিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। এভাবে নদীকেন্দ্রিক জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাগুলি বহির্দেশীয় সমুদ্রগামী জাহাজগুলির মধ্যে সম্পাদিত হতে দেখা গিয়েছিল। বহির্বাণিজ্যের পাশাপাশি অন্তর্বাণিজ্যে ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের কর্মসম্পাদনের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলায় নদীগুলির প্রবাহ পথের ধারে উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত খেতগুলিতে ধান, গম, পাট, আখ, নীল, যব, সরিষা প্রভৃতি কৃষিজ ফসলগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হত। এই সকল কৃষিজ ফসলগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক উৎকৃষ্ট ফসল হিসাবে পাট ছিল অন্যতম। তবে আঞ্চলিক চাহিদা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসকল কাঁচা পণ্যগুলি নদীপথের মধ্যদিয়ে স্টিমশিপ জাহাজ বা নৌকা মারফৎ বন্দর এবং ছোট ও বড় নগর লাগোয়া নদী ঘাটগুলিতে পৌঁছানো হত। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর বাংলায় নদীর ধারে বিশেষ করে হুগলী নদীর তীরে বহু শিল্প কারখানার আবির্ভাবের ফলে নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি লক্ষ্য করা

গিয়েছিল। বাংলায় কাঁচা পাটের ব্যাপক উৎপাদন ঘটলে বাংলার নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে পাটকলের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার অন্যদিকে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ করে আসাম (বর্তমান অসম) এবং দার্জিলিংয়ে উৎপাদিত চা বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে বহির্বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছিল। এই পণ্যগুলি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য নদীপথে কলকাতা বন্দরে আনা হত, এরপর এই পণ্যগুলিকে বন্দর থেকে রপ্তানির মধ্যদিয়ে বাজারজাত করা হত। এই বিষয়গুলির মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় বাংলার নদীপথগুলি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কীরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, নদী এবং উপকূলীয় বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য সম্ভার হিসাবে বিবেচিত ছিল। এছাড়া আফিম, তামাক প্রভৃতি নেশা জাতীয় পণ্যগুলি চোরা চালানের মাধ্যমে উপকূলীয় দেশগুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। যাইহোক, এসকল বাণিজ্যিক পণ্যসমূহের অন্তর্দেশীয় এবং বহির্দেশীয় বাজারে খুবই চাহিদা ছিল। নদীপথে পরিবহণের জন্য এই বাণিজ্যিক পণ্যগুলি অধিকাংশই বিদেশী পুঁজির দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা গিয়েছিল।[৩] এই পুঁজির উপর নির্ভরশীল মালিকানাধীন নদীকেন্দ্রিক স্টিমশিপ জাহাজগুলিতে বাংলার নাবিকদের কাজে যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল। বহির্বাণিজ্য কিংবা অন্তর্বাণিজ্যের যে ক্ষেত্রকে নিয়েই বলা হোক না কেন কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ খুব বিস্তৃত পরিসরে হওয়ার জন্য অধিকাংশ বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন এই বন্দরকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল।

কলকাতা বন্দরের ভৌগলিক অবস্থানগত দিক বাংলার নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যকে তরান্বিত করেছিল। ভাগীরথী নদীর মূল দুটি শাখা গঙ্গা (বাংলায় হুগলী নদী নামে পরিচিত) এবং পদ্মার বাংলায় প্রবাহমানতা এবং এর সঙ্গে এই নদী দুটির শাখা এবং উপনদীগুলির মধ্যদিয়ে বাণিজ্যিক জলযানগুলিকে জলপথে উন্মুক্ত যাত্রাপথ তৈরি করে দিয়েছিল। হুগলী নদীর তীরে কলকাতা বন্দর সমুদ্রমুখ থেকে উজানের দিকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে অবস্থান করার ফলে আভ্যন্তরীণ এবং বহির্দেশীয় বাণিজ্যকে একই সঙ্গে পরিচালিত করেছিল। হুগলী নদীর সঙ্গে নদী এবং খাল চ্যানেল পথগুলি কলকাতা বন্দরের সঙ্গে জলপথে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল। জলঙ্গী, মাথাভাঙা, দামোদর, রূপনারায়ণ, হলদি এবং রসুলপুর নদীর সঙ্গে হুগলী নদীর সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল।[৪] অন্যদিকে টালি নালা, সার্কুলার ক্যানেল, বেলেঘাটা খাল, কেস্টপুর খাল এবং ভাঙর ক্যানেলের মতো খাল চ্যানেল পথগুলি জলপথে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিল।

হুগলী নদীর সাথে এই নদী এবং খাল পথগুলির সংযোগ স্থাপন আভ্যন্তরীণ স্থানীয় বাণিজ্যকে প্রভাবিত করেছিল। আবার হুগলী নদীর নিম্নে প্রবাহমান জলধারাটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়ার ফলে সমুদ্র উপকূল বেয়ে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কলকাতা বন্দরের জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ অটুট রেখেছিল। এর পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে জলপথে বাণিজ্য চলতে দেখা গিয়েছিল, যদিও বাংলার মধ্যে কলকাতা বন্দরের উপর বাণিজ্যিক চাপ ছিল সর্বাধিক। বিশেষত কলকাতা বন্দরের ভৌগলিক অবস্থানগত দিক এবং ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা থেকে নিয়ে ১৯১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালীন যাবৎ কলকাতা ভারতের রাজধানী শহর হওয়ার সুবাদে এই বন্দরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই বন্দরে নদীপথের মধ্যদিয়ে স্টিমশিপ বোটের সাহায্যে কাঁচা পণ্যের সরবরাহ যেরূপ সহজলভ্য ছিল, অন্যদিকে বৃহৎ জাহাজগুলি নিম্নে নদীপথ ধরে সমুদ্রে প্রস্থানের মধ্যদিয়ে বহির্দেশীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে খুব সহজে পাড়ি দিতে পারত।

বাংলায় বহু নদ-নদীর অবস্থানের জন্য ঔপনিবেশিক সময়কালে নদীপথে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জন পরিবহণ ব্যবস্থা স্টিমশিপ জাহাজ ও স্টিমার বোটের মাধ্যমেই সম্পন্ন হত। ১৮৭০ সালে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গঠনের ফলে কলকাতা বন্দরের উন্নতিসাধন ঘটলে শুধুমাত্র বহির্দেশীয় বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটেনি এর পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপযোগী স্টিমার বোট এবং স্টিমশিপ জাহাজের মতো জলযানগুলি উপকূলীয় এবং নদী কেন্দ্রিক আন্তঃবাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। এই অন্তর্দেশীয় জাহাজগুলির মাধ্যমে বাণিজ্যিক শস্য হিসাবে আফিম, চা, পাট, তুলো এছাড়া শিল্পজাত পণ্য সামগ্রীগুলি নদীপথে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ করা হত। কলকাতা বন্দর মারফৎ সমগ্র বাংলা, বিহার এবং আসামের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এছাড়া নদীপথে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে লবণ সরবরাহ হতে দেখা গিয়েছিল।[৫] আমদানি রপ্তানিগত বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলায় কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে জলপথে বাণিজ্যের জন্য চলাচলরত জাহাজগুলি অধিকাংশ বিদেশী এবং কিছু দেশীয় মালিকানাধীন সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই জাহাজ কোম্পানিগুলি হল কলকাতা স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি, বেঙ্গল আসাম স্টিমশিপ কোম্পানি, ইষ্ট বেঙ্গল রিভার স্টিম সার্ভিস, রিভার স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি (R. S. N.), ইন্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন অ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি (I. G. N. & R. Co.), হোর মিলার কোম্পানি, এবং আরও কিছু অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যে ব্যবহৃত

জাহাজ কোম্পানিগুলি হল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি (B. I. S. N.), ইন্দো-চীন স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি, দ্য জাভা বেঙ্গল লাইন, ক্ল্যান লাইন স্টিমার্স, সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি, Osaka Syosen Kaisya, N. Y. K. LINE – Japan Mail Service প্রভৃতি।[৬] এসকল জাহাজ কোম্পানির তত্ত্বাবধানে নির্মিত স্টিমশিপ জাহাজগুলি বহির্বাণিজ্য এবং আন্তঃবাণিজ্যে ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন গ্রহণ করেছিল তবে নদীপথে চলাচলের জন্য অন্তর্দেশীয় স্টিমার বোট এবং ছোট স্টিমশিপ জাহাজগুলি উপযুক্ত ছিল। এই জলযানগুলি ছাড়াও নিজস্ব মালিকানাধীন পানসি এবং ডিঙি নৌকাগুলি বাংলার নদী ও খাল-বিল গুলিতে রীতিমত চলাচল করতে দেখা গিয়েছিল যদিও এগুলি ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝি ও মাল্লারা বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবস্থান করত আবার অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের এক গোষ্ঠী বেবাজিয়ারা এসকল ছোট ছোট জলযানগুলি মাছধরার কাজে ব্যবহার করত। বেবাজিয়াদের একপ্রকার লম্বাটে বড় নৌকাগুলির দ্বারা বরিশালের বিখ্যাত বালাম চাল চালান করা হত। বাংলায় নৌকাতে জীবনধারণের ক্ষেত্রে মাঝিদের ন্যায় 'বেবাজিয়া' সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[৭]

আধুনিক বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিস্কার হওয়ার ফলে ১৮৫০ সালের পরে এই প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলার বিভিন্নপ্রকার শিল্প-কারখানা, রেলওয়ে, ট্রামওয়েতে প্রয়োগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী এবং পণ্যবাহী স্টিমশিপ, স্টিমার বোটগুলিতেও প্রচলিত হতে দেখা গিয়েছিল। ফলস্বরূপ বাংলার নদীপথে পানসি, ডিঙি এবং নৌকার ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল, যদিও ব্যক্তিগত কাজে জলপথে পরিবহণ এবং মৎস্য শিকারে এই প্রকৃতির জলযানগুলি ব্যবহৃত হত। তবে জলপথে বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যবহার করে স্টিমশিপ জলযানগুলির ব্যবহার দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল যা ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারক এবং বাহক হিসাবে বিশেষ ভূমিকা বহন করেছিল। এই ব্যবসা- বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে পুঁজির উদ্ভাবন আর পুঁজির উপর ভিত্তি করে মালিকদের শিল্পের সম্প্রসারণ যা পুঁজিকে শক্তিশালী করেছিল। পুঁজি ভিত্তিক শিল্পগুলি শ্রমের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে শিল্প শ্রমিকদের চাহিদা লক্ষ্য করা গিয়েছিল অন্যদিকে জলপথে মালিকানাধীন উদ্ভাবনী জাহাজগুলিতে কর্মসম্পাদনের জন্য শ্রম সন্নিবেশ হতে দেখা গিয়েছিল। কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘাটগুলিতে শত শত হত দরিদ্র নাবিকেরা জাহাজে কাজ পাওয়ার অপেক্ষায় দন্ডায়মান থাকত। সেখানে জাহাজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নাবিকদের কাজের দক্ষতা পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারণ করে তাদের শংসাপত্র বা নলি প্রদান করা হত। এই

শংসাপত্রটি 'Continuous discharge certificate' (CDC) নামে পরিচিত ছিল।[৮] এখানে নাবিক হিসাবে জাহাজের কাজে যোগদান করার পূর্বে দীর্ঘদিনের নদীকেন্দ্রিক বোট স্টিমারের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার পর তারা দক্ষ নাবিক হিসাবে পুঁজি মালিকদের কাছে নিজেদের উপস্থাপিত করেছিল। এই বিপুল সহজলভ্য শ্রম সমাবেশ পরবর্তী দিনগুলিতে তাদের বেতন এবং কর্মের ক্ষেত্রে কুপ্রভাব ফলেছিল। এরফলে এই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক জলযানগুলিতে কর্মরত শ্রমিকেরা মজুরি হ্রাস, কর্মগত এবং বেতনগত বৈষম্যতার বিষয়গুলি প্রতিকার করার জন্য বাংলায় সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই সংগঠিত আন্দোলন এবং প্রতিবাদ শুধুমাত্র বহির্দেশীয় সমুদ্রগামী জাহাজ কর্মীদের মধ্যেই দেখা যায়নি একই সাথে নদী এবং উপকূলবর্তী স্টিমশিপ জাহাজ, স্টিমার এবং বোটগুলিতে কর্মরত নাবিকদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছিল। ঔপনিবেশিক সময়কালে জলপথে বাংলার নাবিকদের নদী ভিত্তিক কর্মজীবনের বিষয়টি নিয়ে বাংলার খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকেরাও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। তৎকালীন এই কবি সাহিত্যিকেরা বাংলার নাবিকদের জাহাজে সংগ্রামী জীবনযাপনের বিষয়টি নিয়ে শ্রেণী চেতনায় শ্রমের সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন যেটি বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল।

১.২ বাংলার নদীপথে জলযানগুলির যাত্রাপথের সঙ্গে সম্পর্কিত নাবিকদের কর্মজীবন:

বাংলার নাবিকদের জীবন জলযানগুলির পাশাপাশি নদীপথ, বন্দর, জেটি এবং নদী ঘাটাগুলির সাথেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। নাবিকদের জীবনের সঙ্গে সহাবস্থানকারী নদী, খাল ও উপসাগরীয় জলপথ এবং বন্দর বা নদী ঘাটা স্টেশনগুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বাংলার মধ্যে অধিকাংশ নদীগুলিই নিম্নপ্রবাহের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার কারণে ধীর গতি সম্পন্ন ছিল, যে কারণে নদীগুলিকে প্রায়শই দিক পরিবর্তন করে অবস্থান বদল করতে দেখা গিয়েছিল। নদী তীরবর্তী অংশে বসবাসকারী নাবিকেরা প্রায়শই নদীর ভূমিক্ষয়, বন্যা, জোয়ার ভাটা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে জীবনধারণ করেছিল। আবার অন্যদিকে বাংলায় নাবিকদের জীবন এবং জীবিকা নদীকেন্দ্রিক হওয়ায় নদীপথে মৎস্য শিকার, যাত্রী এবং পণ্য পরিবহণ প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম তাদেরকে নদীপথে অনেকটা দক্ষ ও অভিজ্ঞ সম্পন্ন করে তুলেছিল।[৯] ঔপনিবেশিক বাংলায় জলপথে যাত্রাপথকে সন্নিকটস্থ করার জন্য নদীর সঙ্গে সংযোগকারী খালপথগুলি কৃত্রিমভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। স্টিমশিপ জাহাজ, স্টিমার বোট এবং নিজস্ব মালিকানাধীন জলযানগুলিকে নদীপথে বিভিন্ন খাল এবং নদী মোহনার খাঁড়ি হয়ে

উপসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যদিয়ে স্থানীয় বাণিজ্য এবং যাত্রী পরিবহণে ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল। নদীপথের সঙ্গে সড়ক এবং রেলপথের বিভিন্ন স্টেশনগুলির সঙ্গে নদীঘাটের যোগাযোগের মাধ্যমে তিনটি ভিন্ন পরিবহণ পথের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধিত হয়েছিল। এইভাবে বাংলার নদীপথের সঙ্গে রেল এবং সড়কের মধ্যে সমন্বয় সাধন হওয়ার ফলে জলপথে জনপরিবহন এবং ব্যবসাবাণিজ্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। এছাড়া স্থানীয় পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যাত্রী পরিবহণ অনেকটা সুলভ এবং সহজ হওয়ায় নদীপথকে সচরাচর ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছিল। বাংলার নদীপথের মধ্যদিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত স্টিমশিপ জাহাজ এবং যাত্রী পরিবহণে প্যাসেঞ্জার স্টিমারগুলিতে বাংলার বহু নাবিকদের কর্মসংস্থানের একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলায় ঘাট এবং বন্দরের মধ্যদিয়ে এই সকল নাবিকরা নদীপথে চলাচলকারী এই জলযানগুলিতে নিয়োজিত হয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেছিল।

নদীপথ, নদী মোহনা এবং খাঁড়ির মধ্যদিয়ে বাংলার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক জলযানগুলিতে যাত্রা রোমাঞ্চকর এবং মনোমুগ্ধকর মনে হলেও এই যাত্রাগুলি ছিল ভয়ঙ্কর এবং বিপদ সংকুল। বাংলার নাবিকদের দ্বারা পরিচালিত জলযানগুলিকে প্রায়শই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পর্যবসিত হতে হত। সমুদ্রমুখের কাছাকাছি বড় মোহনাগুলিতে বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবল সামুদ্রিক বাতাস এবং জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে আভ্যন্তরীণ চ্যানেলপথগুলিতে ক্রমাগত পলি জমার ফলে দেশীয় স্টিমশিপ জাহাজগুলিকে সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখা গিয়েছিল। এজন্য পরবর্তীকালে আন্তঃবাণিজ্যের সুবিধার্থে বাংলার জলপথে জলযানগুলির যাত্রাপথকে সন্নিকটস্থ করার জন্য বাংলার নদী এবং খালগুলিকে সংস্করণ করে অসংখ্য কৃত্রিম খাল নির্মাণ করে জলপরিবহণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। The Calcutta and the Eastern Canals যা সার্কুলার বা পূর্ব খাল নামে পরিচিত ছিল। বৃত্তাকার এই খালপথটি নৌচলাচলের পথ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২৪ পরগণা, খুলনা, ফরিদপুর এবং বখরগঞ্জ জেলায় কয়েকটি কৃত্রিম খাল দ্বারা সংযুক্ত প্রাকৃতিক চ্যানেল পথটি পূর্ব বাংলা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী কলকাতায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বহন করেছিল। যাত্রাপথের ১,১২৭ মাইল সর্বমোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে ৪৭ মাইল পথ ছিল কৃত্রিম খালপথ। অন্যদিক বাকী অংশটি সুন্দরবনের জোয়ারের খাঁড়ি এলাকা যা হুগলী থেকে পূর্ব দিকে গঙ্গার ব-দ্বীপ জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং এটির সঙ্গে নদী ও মোহনার মধ্যে

আন্তঃযোগাযোগের সমন্বয় সাধন ঘটেছিল।[১০] খালপথগুলিতে যাতায়াত সহজতর এবং কম দূরবর্তী হলেও এখানে উচ্চহারে শুল্ক প্রদান করতে হত এজন্য স্টিমার বোটগুলি অনেক সময় সুন্দরবনের খাঁড়িপথ ধরে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছিল। নদীপথে এই বোটগুলিতে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন খুবই প্রতিকূল ছিল, বিশেষত খাঁড়িপথগুলি জোয়ার-ভাটা জনিত কারণে সংকীর্ণ এবং পলিযুক্ত হওয়ার ফলে বোট স্টিমারগুলি প্রায়শই আটকে পড়ত। আবার অন্যদিকে সরু জলপথগুলির ধারে সুন্দরবনের গাছগুলি ঝুঁকে থাকত, এখানে জল এবং ডাঙ্গার দূরত্ব খুব কম থাকায় সুন্দরবনের বাঘ এবং জলের মধ্যে কুমির দ্বারা বোট স্টিমারগুলি আক্রান্ত হতে দেখা গিয়েছিল, এখানে লস্করেরা তাদের জীবন ঝুঁকি নিয়ে স্টিমারের যাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল।[১১]

হুগলী নদীতে সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত ফেরিগুলি কলকাতা পোর্ট কমিশনারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের উত্তর দিকের সীমানা রয়েছে ঘুসুরিতে সেন্ট্রাল জুট মিলের একটু উপরে। যদিও দক্ষিণ সীমানাটি রাজগঞ্জের উত্তরের পাঁচপাড়া থেকে লরেন্স জুট মিলের ঠিক উত্তরে বাউরিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। যখন হাওড়া ব্রিজ খোলা হত তখন রেলওয়ে যাত্রীদের আর্মেনিয়ান ঘাট থেকে রেলওয়ে পন্টুনে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেতুর দুটি ব্যবহৃত স্টিমারের মাধ্যমে ফিরে আসা হত। ১৯০৭ সাল থেকে পোর্ট কমিশনাররা একটি সেতুর উপরিভাগে এবং একটি সেতুর নিম্নভাগে স্টিমার পরিষেবা চালু করেছিল। সেতুর নিম্নাংশে তিনটি স্টিমার নিয়মিতভাবে চাঁদপাল ঘাট এবং খিদিরপুর ডকের মধ্যে, হাওড়ার দিকে তেলকল ঘাট, রামকেষ্টপুর, শিবপুর এবং শালিমারের মধ্যে চলাচল করত। সেতুর উপরে কলকাতার বড়বাজার ঘাট ও আহিরীটোলা ঘাট এবং সঙ্গে হাওড়ার পাশে শালকিয়া বান্দা ঘাটের মধ্যে দুটি স্টিমার নিয়মিত চলাচল করত। এই পরিষেবাগুলি মূলত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়ায় স্টিমারগুলি শুধুমাত্র দিনের বেলায় চলাচল করত। জনসাধারণের পরিষেবায় ব্যবহৃত স্টিমারগুলির ধার্য ভাড়া ছিল খুবই স্বল্প পরিমাণ এক আনা থেকে এক চতুর্থাংশ আনা এজন্য এতে সাধারণ জনগণ খুবই উপকৃত হয়েছিল। এছাড়া চারটি স্টিমার যথাক্রমে তিনটি সেতুর নিচে এবং একটি সেতুর উপরে রীতিমতো সপ্তাহে প্রতিদিন কলকাতা থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলাগুলির মধ্যে চলাচল করত। (১) কলকাতা (চাঁদপাল ঘাট) থেকে রাজগঞ্জ, (২) কলকাতা (চাঁদপাল ঘাট) থেকে উলুবেড়িয়া, (৩) কলকাতা (আর্মেনিয়ান ঘাট) থেকে মেদিনীপুরের ঘাটাল, (৪) কলকাতা (আহিরিটোলা ঘাট) থেকে কালনা। এই

স্টিমারগুলির প্রথমটি ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যটি মেসার্স হোড় মিলার এন্ড কোম্পানির পরিচালনাধীন ছিল।[১২]

বাংলায় জলপথগুলিতে প্রচুর সংখ্যক ছোট আকৃতির দেশীয় বোট নৌকাগুলিতে যারা নিয়োজিত ছিল তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি বিভাজন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পানসি এবং ডিঙ্গি প্রকৃতির নৌকাতে কর্মরত লোকেরা অনেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মূলত মাঝি এবং মাল্লা হিসাবে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে বোট স্টিমার এবং জাহাজে কর্মরত নাবিকরা বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিল এরা বেশিরভাগই ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও বাংলায় নদীকেন্দ্রিক স্টিমশিপ জলযানগুলিতে উভয় সম্প্রদায়ের কর্মীদের মিলেমিশে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মুসলিম জাহাজ কর্মীগণ বা লস্করেরা জাহাজের কাজে ছিল অনেটাই কর্মদক্ষ এবং সাবলীল। এই সকল নাবিকেরা স্টিমশিপ জাহাজ এবং স্টিমার বোটগুলিতে দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর তাদের কর্ম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ঘটিয়ে বহির্দেশে যাত্রারত জাহাজগুলি কিংবা দেশীয় আভ্যন্তরীণ ছোট স্টিমশিপ জাহাজগুলিতে সারেঙ (Serang), মেটস্ (Mates) এবং মাস্টার (Master) হিসাবে তাদের কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। এই অন্তর্বাণিজ্যে ব্যবহৃত সমুদ্রগামী স্টিমশিপ জাহাজগুলিতে বাংলার নাবিকদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োজিত হতে দেখা গিয়েছিল। কলকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরে ১৯২৩-২৪ বার্ষিক প্রতিবেদনে কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে নাবিকদের নিয়োজিত হওয়ার বিষয়টি ছিল অনেকটা কষ্টসাধ্য। ঔপনিবেশিক বাংলায় অন্তর্বাণিজ্যে ৬৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৩ জন মাস্টার, মেটস্ এবং ইঞ্জিনিয়ারকে সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মের জন্য শাংসাপত্র প্রদান করা হয়েছিল। ১৯১৭ সালের স্টিম ভেসেল অ্যাক্টে ৩১৯ জনের মধ্যে ৬০ জন প্রার্থী যোগ্যতা অর্জনের শংসাপত্র পেয়েছিল। কলকাতা এবং চাঁদবলির মধ্যে চলাচলকারী স্টিম-টাগ এবং পোর্ট কমিশনারের জাহাজে সাতজন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে ২ জন পাশ করেছিল।[১৩]

তৎকালীন সময়কালে বাংলায় দেশীয় বোট স্টিমারগুলি সরকারি অনুমোদন নিয়ে জলপথে চলাচলের স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারত। অনুমোদন প্রাপ্ত বোট স্টিমারগুলিকে সকাল থেকে নিয়ে রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত চলাচল করতে দেখা গিয়েছিল। এর ভাড়া ছিল খুবই কম মাথাপিছু এক বা দুই পয়সা কিংবা যদি সম্পূর্ণ বোটটি ভাড়া করা হয় তবে যাত্রা প্রতি দুই থেকে তিন আনা ভাড়া বাবদ প্রদান করতে হত। বেলুড়, বালি এবং অন্যান্য স্থানীয় কিছু ঘাট

থেকে অফিসের কেরানি এবং অন্যান্য কর্মচারীরা একুট বড়ো আকৃতির বোটের মাধ্যমে কলকাতায় আসতো, এই বোট নৌকাগুলিকে *কুলহির-পানসি (kulhir-pansi)* বলা হত। বালি থেকে বড়বাজার ঘাট পর্যন্ত বোটে যাত্রার জন্য মাথাপিছু এক থেকে তিন আনা এবং পুরো নৌকার জন্য আট আনা থেকে এক টাকা ধার্য করা হত।[১৪] বাংলায় তীর্থ যাত্রার জন্য নদীপথে বোট নৌকাগুলিও চলাচল করতে দেখা গিয়েছিল। যার অন্যতম নিদর্শন হল গঙ্গাসাগরে তীর্থ যাত্রাকালীন সময়ে নৌকার কর্মীরা জলধিপতি বরুণের করুণা নিবেদন করার পর উচ্চস্বরে পীর গাজি মিঞা, পীর হাথিলী, পীর জহর, পীর মহম্মদ ও পীর বদরউদ্দীন এসকল জলের রক্ষাকর্তা পাঁচ পীরের নামযপ করত। এরপর নৌকার কর্মীদের সঙ্গে যাত্রীদেরও কণ্ঠ মিলিয়ে গঙ্গা মাঈকি...জয় এ জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রা করতে দেখা গিয়েছিল। গঙ্গাকে মাতৃরূপে বন্দনা করা এবং জয়ধ্বনি দেওয়ার উদ্দেশ্যগত দিক যা কিছুই থাক না কেন গঙ্গা নদী যুগ যুগ ধরে বাংলার বহু মানুষের জীবন এবং জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এজন্য উচ্চারিত এই শব্দ ধ্বনির ব্যবহার শুধুমাত্র নৌকা, জেটি এবং চলমান যানগুলিতে অবস্থানরত যাত্রীদের কণ্ঠেই নয়, এর পাশাপাশি এটি সমগ্র গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে আহরিত হতে দেখা গিয়েছিল।[১৫]

কলকাতা কেন্দ্রিক নদী ঘাটগুলি ছাড়াও পূর্ববঙ্গের নদীর ঘাটগুলিতে অসংখ্য স্টিমার বোট চলাচল করতে দেখা গিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের, খুলনা-নারায়ণগঞ্জ দৈনিক মেল স্টিমার পরিষেবা, খুলনাকে বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, টিপারা এবং ঢাকার সাথে সংযুক্ত করেছিল। অন্যদিকে মোরেলগঞ্জ থেকে সুন্দরবনের মধ্যদিয়ে বরিশাল, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং আসামের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগের জন্য দৈনিক ডেসপ্যাচ স্টিমার পরিষেবা চালু ছিল। পূর্বে খুলনা, বাগেরহাট ও মোরেলগঞ্জের মধ্যে একটি দৈনিক ফিডার স্টিমার চলাচল করত। কিন্তু আলাইপুর এবং মানভোগের মধ্যবর্তী আলাইপুর খালে পলি জমার ফলে সেদিকে যাত্রাপথ বন্ধ থাকলে আরও একটি বিকল্প পথ হিসাবে খুলনা যশোরের মাগুরার সাথে মাগুরা স্টিমার সার্ভিস এবং ফরিদপুর বোয়ালমারীর সাথে বোয়ালমারী স্টিমার সার্ভিসের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করেছিল। অন্যান্য স্টিমার সার্ভিস খুলনা থেকে যশোরের লোহাগাড়া পর্যন্ত এবং কাবাদক বরাবর কপিলমুনি থেকে যশোরের কোটচাঁদপুর পর্যন্ত গিয়ে ঝিঙ্গারগাছার রেলপথ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। পিরোজপুর এবং নজিপুরের মধ্যে চলাচলকারী আরেকটি প্রণালী কচুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্ষাকালে মাদারীপুর বিল রুট ধরে পাট সরবরাহের জন্য মাদারীপুর থেকে

খুলনা পর্যন্ত একটি স্টিমার সার্ভিস চালু করা হয়েছিল।[১৬] বাংলার নদীপথের যাত্রাপথগুলিতে মালবাহী বা যাত্রীবাহী স্টিমার এবং লঞ্চগুলির যাতায়াত বাংলার নাবিকদের কর্মজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল। এই নদীপথগুলিতে জলযানগুলির মধ্যে নাবিকদের দীর্ঘদিনের কর্মসম্পাদনের অভিজ্ঞতা যাত্রাপথে প্রতিকূল অবস্থার বিষয়গুলির প্রতি অবহিত করেছিল। এরফলে বাংলার নাবিকেরা নদীপথে যাত্রাকালীন সময়ে চলাচলরত স্টিমশিপগুলিকে দুর্গম ও বিপদসংকুল স্থানগুলির হাত থেকে রক্ষা করে সহজেই এড়িয়ে নিয়ে যেতে পারত।

হুগলী নদীর তীরে গড়ে ওঠা কলকাতা শিল্প নগরী পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী মানুষদের আকর্ষণীয় কর্মস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঔপনিবেশিক সময়ে কলকাতার উন্নত শহুরে জীবনযাত্রা এছাড়া বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল হওয়ার জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে বহু মানুষ এই শহরের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সময়ে বাংলার নদীপথের জলযানগুলিতে যাত্রার শুল্ক, স্থলপথে অন্যান্য যাত্রার শুল্কের তুলনায় পরিমাণে অনেকটা কম হওয়ার কারণে জলপথকে সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল। কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গের খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্টেশনগুলিতে জলপথে যাতায়াতের জন্য স্টিমার পরিষেবা চালু ছিল। এমনকি মেঘনা ব্রহ্মপুত্র নদী হয়ে জলপথে কলকাতা থেকে আসামে স্টিমশিপ জাহাজগুলি চলাচল করত। অন্যদিকে কলকাতা থেকে হুগলী নদী বেয়ে নিম্নে সুন্দরবন অতিক্রম করে সমুদ্র উপকূলের গা বেয়ে একদিকে করমণ্ডল উপকূলে উড়িষ্যার চাঁদবলি বন্দর এবং অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন বার্মার (বর্তমানে মিয়ানমার) রেঙ্গুন বন্দরের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতার বাবুঘাটে রেঙ্গুন প্যাসেঞ্জার শেড তার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত ছিল। এখানে যাতে রেঙ্গুনগামী স্টিমশিপ যাত্রীরা নিরাপদে বিশ্রাম নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটি জেটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, এই জেটি সহ প্যাসেঞ্জার শেডের সমগ্র অংশটি নিয়মিত পরিষ্কার রাখার জন্য কলকাতা পোর্ট কমিশনারের তত্ত্বাবধানে ৫ জন করে সর্বমোট ১০ জন ঝাড়ুদার নিযুক্ত ছিল এবং আবর্জনাগুলি পরিত্যক্ত স্থানে সরানোর জন্য ১ জন গোরুর গাড়ির চালক নিযুক্ত করা হয়েছিল।[১৭] নদীপথে যাত্রী পরিবহণে উপযুক্ত পরিষেবা প্রদান করার জন্য আঞ্চলিক ক্ষেত্রে জলপথে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য বন্দর, জেটি এবং ঘাটগুলিকে উন্নত পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। জলপথের যাত্রাকে বিকশিত করার জন্য সংখ্যাধিক্য উন্নত ফ্ল্যাট এবং বোট স্টিমারের প্রচলন হতে দেখা গিয়েছিল। স্টিমার বোটগুলিতে

কলকাতা বন্দর এবং হাওড়ার জেটিগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক পণ্যসম্ভার আমদানি রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে উঠানো নামানো হতে দেখা গিয়েছিল। হুগলী নদীর ধারে বর্তমানে যে ভগ্নপ্রায় মৃত এবং ধূসর পরিত্যক্ত ভবনগুলি রয়েছে স্বাধীনতার পূর্বে সেগুলি সারিবদ্ধ গোলাবাড়ি ছিল যেখানে বাণিজ্যিক পণ্যসম্ভার মজুত রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই বৃহৎ গোলাবাড়িগুলি হুগলী নদীর তীরে জেটির পিছনে হাওড়ার দিকে শালকিয়ার ঠিক সম্মুখে অবস্থিত ছিল। বরুণ দে -র বাল্য বন্ধুদয় সম্বিত চ্যাটার্জী এবং এর ছোট ভাই প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জীর বাবা হাওড়ার লবণগোলার মালিক হওয়ার সুবাদে গোলাবাড়ি থেকে লবণ খালাস করার পর পণ্যবাহী জলযানগুলিতে পাট বোঝায় করার বিষয়টি তাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এই ভবনগুলির পাশাপাশি অনেক চা ছাউনিও সেখানে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই চা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্য ছিল। এই বাণিজ্যিক দিকটি পরিচালিত হতে শ্রম সংস্থানের সৃষ্টি হয়েছিল যা নদীপথকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। এখানে জেটি, বন্দর এবং নদীতে চলাচলকারী স্টিমশিপ জাহাজগুলি নাবিকদের কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৮]

ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলার নদী এবং উপকূলবর্তী অংশে যে জলযানগুলি চলাচল করত সেখানে ৩০০ টনের কম নিবন্ধভুক্ত কিছু জাহাজ এবং ১০০ টনের কম নিবন্ধভুক্ত স্টিমশিপ ভেসেলে নিয়োজিত নাবিকরা Workmen's Compensation Act of 1923 -এর আওতাভুক্ত ছিল না, সেখানে মূলত ছোট আকৃতির জাহাজগুলি ক্ষুদ্র কোম্পানির মালিকদের নিজস্ব মালিকানায় পরিচালিত হত। I. G. S. N. C., R. S. N., Andrew Yule এবং আরও কিছু অন্যান্য বৃহৎ জাহাজ কোম্পানি রয়েছে যাদের প্রচুর পরিমাণে ছোট আকৃতির ডেসপ্যাচ স্টিমার, ফিডার স্টিমার, টাগ, লঞ্চ এবং ভেসেল ছিল। আবার কলকাতায় অনেক বড় কোম্পানির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যাদের মধ্যে R. S. N. কোম্পানি ছিল একটি। এই কোম্পানির অধীনে নিজস্ব মালিকানাধীন ১৩১ টি চলমান ফ্ল্যাট, ৩৫ টি রিসিভিং ফ্ল্যাট এবং ৪৯ টি স্থানীয় কার্গো বোট ছিল। এছাড়া আরও অন্যান্য কোম্পানি যেমন I. G. N., Andrew Yule এদের প্রায় ৫০০ টি ফ্ল্যাট এবং বোট ছিল। ফ্ল্যাটগুলি প্রায়শই লঞ্চের সাথে সংযুক্ত থাকত এবং ভারী ওজন বহন করার জন্য দুর্ঘটনার সম্মুখীন হত। লঞ্চের তুলনায় ফ্ল্যাটে বেশি দুর্ঘটনা ঘটত। এই বোট এবং ফ্ল্যাট জাহাজগুলিকে Workmen's Compensation Act -এর অন্তর্ভুক্তিকরণ করা একান্ত কাম্য বলে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের (ISU) কাউন্সিল বর্গ অভিমত প্রকাশ করেছিল।[১৯]

স্টিম, টাগ এবং টোয়িং বোটগুলি দীর্ঘদিন চলাফেরা করার ফলে জলপথে চলার জন্য প্রায় অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। ২০ শে সেপ্টম্বর ১৯৩৭ সালে মিঃ এ. ডি. গর্ডন (ঢাকা ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ), আর. ডাবলু গ্যারেউ (নারায়ণগঞ্জের সরকারী ডকের ইঞ্জিনিয়ার সুপারিটেন্টডেন্ট) এবং জি. এইচ. মান্নুচ (বাখরগঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব পুলিশ) এই তিনজন উচ্চ আধিকারিক মিলে পুরাতন ভাসমান জলযানগুলি সরকারি সহায়তায় মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।[২০] ডকইয়ার্ডে পড়ে থাকা S. L. Portia এবং P. L. সংস্থার দ্বারা নির্মিত ভগ্নপ্রায় টোয়িং বোটগুলির পক্ষে নদীর রুক্ষ আবহাওয়ায় চলাফেরা করা ছিল খুবই বিপজ্জনক। F. O. P. (Floating outpost and its Personnel) দ্বারা পরিবেষ্টিত এলাকায় লঞ্চগুলিকে রাখা হত এবং সেগুলিকে প্রতি বছর ডকইয়ার্ডের মধ্যে মেরামত করা হত। এই F. O. P. সংখ্যা ছিল ঢাকাতে ৪ টি, ময়মনসিংহে ১ টি, বরিশালে ৪ টি, ফরিদপুরে ২ টি, টিপারাতে ১ টি এবং ২৪ পরগণাতে ১ টি। ইঞ্জিনিয়ার সুপারিন্টেডেন্ট বোটগুলি মেরামতের জন্য একটি কার্যক্রমের অনুলিপি নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই বোট মেরামতের জন্য দুটি অতিরিক্ত সহ সর্বমোট ১৮ টি বোট প্রদান করা হয়েছিল। যখন একটি বোট মেরামত করে জলে ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হত তখন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তারা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দিত ডকইয়ার্ডে অন্য একটি লঞ্চ প্রেরণ করার জন্য। যখন কোনো ভগ্নপ্রায় পুরাতন বোটকে মেরামতের জন্য পাঠানো হত তখন ডকইয়ার্ডে সচল বোটটিকে তার কর্মস্থলে প্রেরণ করা হত। ভাসমান এই টাও বোটগুলিকে মেরামতের জন্য বার্ষিক ৪৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছিল, যদিও এটি সর্বদা প্রযোজ্য ছিল না। সংস্থায় নিয়োজিত কর্মীদের বেতন এবং কাজের সময়সীমার উপর নির্ভর করে বোটগুলির বার্ষিক মেরামত খরচ দ্বিগুণ থেকে চারগুন অধিক ধার্য করা হয়েছিল। P. L. সংস্থার অধীনে ৯ টি পোর্টয়া টাও বোট ছিল। শুধুমাত্র S. B. Portia বোটটির ৬৬ দিনের জন্য কয়লার খরচ ছিল ২০০০ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার সুপারিন্টেডেন্ট পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাথমিকভাবে কিছুটা অতিরিক্ত অনুদান দিয়ে প্রতিটি বোটকে সংস্করণ করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ বোটের রং করা অংশগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং ধাতব প্লেটগুলিকে পিচের পরিবর্তে ক্ষয় রোধকারী (anti-corrosive) উপাদান দিয়ে মেরামত করা হয়। যার ফলে ২ বছরের জন্য বোটের যন্ত্রাংশগুলি সুনিশ্চিত থাকে এবং পরবর্তীতে মেরামতের জন্য বছরের শেষে অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ অনেকটায় কমে যায়।[২১]

প্রাথমিকভাবে বোট পিছু খরচের পরিমাণ অতিরিক্ত ১০০ টাকা ধার্য করা হয়। প্রথম বছর ১,৮০০ টাকা সংযুক্ত করে বার্ষিক মেরামত খরচের সর্বমোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮০০ × ৪৫০ = ৮,১০০ + ১৮০০ = ৯,৯০০ টাকা। তবে দ্বিতীয় বছর খরচের পরিমাণ শূন্য থাকে। তৃতীয় বছর খরচ হয় ৮,১০০ টাকা এবং চতুর্থ বছর আবারও ব্যয়ের পরিমাণ শূন্য থাকে। চার বছরে সর্বমোট খরচ হয় ১৮,০০০ টাকা। ৩২,৪০০ টাকার পরিবর্তে ১৮,০০০ টাকায় সামগ্রিক কাজ মিটে যাওয়ার জন্য চার বছরে ১৪,৪০০ টাকা বা বার্ষিক ৩,৬০০ টাকা সঞ্চয় হয়েছিল। যার ফলে টোয়িং সংস্থাগুলির খরচ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। তবে S. L. Portia বোটের ক্ষেত্রে কয়লা বাবদ বার্ষিক প্রায় ১,০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। এই বিষয়গুলি বোট মেরামতের আর্থিক ফলাফল চিহ্নিত করেছিল ঠিকই তবে বোটের ব্যবহারিক পদ্ধতির কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেনি।[২২]

বাংলার নদীপথে চলাচলকারী জলযানগুলিতে দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বাংলার নাবিকেরা তাদের জীবন অতিবাহিত করেছিল। তারা অনেক সময় প্রতিকূল পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্টিমশিপগুলিকে বিপদসংকুল স্থানগুলির হাত থেকে রক্ষা করে নিজস্ব গন্তব্যে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় যেসকল স্টিমশিপগুলি নদীপথে চলাচল করত তা বেশিরভাগই ছিল বিদেশী কোম্পানির পরিচলনাধীন। এই জলযানগুলিতে প্রচুর সংখ্যক দেশীয় বাংলার নাবিক বা লস্কর নিয়োজিত হতে দেখা গিয়েছিল যদিও একই সঙ্গে ইউরোপীয় নাবিকরাও এখানে কাজকর্ম করত। তবে স্বল্প বেতনে শ্রমসুলভ চাহিদা মেটানোর জন্য একমাত্র উপকরণ হিসাবে লস্করদেরকেই সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়েছিল। এরা মূলত পূর্ববঙ্গের নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূখন্ডের বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে এসেছিল। এদের নদীকেন্দ্রিক জীবন, নদীর গতিপথ, নদীর গতি প্রকৃতি, বন্দর, নদীঘাটা এবং এরই সঙ্গে জলযানগুলি সম্পর্কে সূক্ষ্ম ধারণা ছিল। নদীকেন্দ্রিক জলযানগুলিতে কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলার নাবিকদের নৈপুণ্যতা এবং অভিজ্ঞতা থাকলেও এদেরকে বেতনগত এবং কর্মগত বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত হয়ে তারা ধর্মঘট এবং আন্দোলনের পথে ধাবিত হয়েছিল।

১.৩. বাংলার অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে কর্মরত নাবিকদের আশু অভাব-অভিযোগের ভিত্তিতে সংগঠিত ধর্মঘট, আন্দোলন ও সমাবেশ:

ঔপনিবেশিক বাংলায় নদীকেন্দ্রিক এবং উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ পরিবহণে ব্যবহৃত ইউরোপীয় কোম্পানির পরিচালনাধীন ফ্ল্যাট, স্টিমার, স্টিমশিপ বোটগুলিতে নিয়োজিত বাংলার নাবিকদের বহির্দেশীয় সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মরত নাবিকদের মতো সংগঠিত হয়ে আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছিল। ইউরোপীয় মালিকানাধীন জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানির জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের কর্মকালীন অভাব-অভিযোগগুলির ভিত্তিতে তাদের উত্থাপিত দাবিদাওয়াগুলিকে কোম্পানি ভ্রুক্ষেপ না করলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। তাদের মূল দাবিদাওয়াগুলি ছিল বেতন বৃদ্ধি, ক্ষতিপূরণ এবং ভাতা প্রদান। তবে এগুলি ছাড়াও কর্মকালীন সময়ে ছাঁটাই, বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতি অনৈতিক বিষয়গুলিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই অবকাঠামোগুলি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি শোষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলার নাবিকদের জীবনকে দুর্ভোগের মধ্যে পর্যবসিত করেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় কলকাতা বন্দর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বন্দর হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এজন্য এই বন্দরকে কেন্দ্র করে বহু ইউরোপীয় মালিকানাধীন বিদেশী কোম্পানির স্টিমশিপ জলযানগুলি শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার করে পুঁজিকে শক্তিশালী করেছিল। যদিও দেশীয় কিছু জাহাজ কোম্পানিগুলি ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও কর্মীদের ন্যায্য মজুরি দিয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। ১৯২২ সালের জুন মাসে জাহাজ কর্মীরা বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করলে সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত জাহাজ কর্মীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে মজুরি নিয়ে ISU -এর সঙ্গে আলোচনা করে ন্যায়সঙ্গত মজুরি বাড়িয়ে তার সুষ্ঠ সামাধান করেছিল। এই প্রেক্ষিতে ISU সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির দীর্ঘায়ু কামনা করেছিল।[২৩] অন্যদিকে ইউরোপীয় জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানিগুলি বাংলার ক্রু নাবিকদের আশু সমস্যাগুলি নিয়ে আপোসে বসে কোনোভাবে তার সমাধান করেনি। এজন্য এখানে বাংলার ক্রু নাবিকরা সংগঠিত হয়ে সভা ও সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলন এবং ধর্মঘটে নিজেদের সামিল করেছিল।

বাংলার কর্মরত নাবিক শ্রমিকদের উপর শোষণ এবং তাদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ অধিকাংশ বিদেশী কোম্পানির পরিচালিত অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে পরিলক্ষিত করা গিয়েছিল যা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি শোষণের একটি কৌশলগত দিক ছিল। অভ্যন্তরীণ জলযানে কর্মরত ক্রু নাবিকদের সঙ্গে সারেং, ড্রাইভার এবং সুখানীদের নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখা

গিয়েছিল। ফরিদপুরের চরমাগরিয়ার কাছে স্টিমার কোম্পানির একজন ইউরোপীয় কর্মচারী ইয়াকুব নামে বাংলার এক সুখানীকে বিনা কারণে লাঞ্ছিত করেছিল। এই সুখানী ইউনিয়নের দারস্থ হয়েছিল এবং স্টিমারের অন্য সকল ক্রুদের সত্য কথার উপর ভিত্তি করে সেই ইউরোপীয় কর্মচারীর সঙ্গে আইনি লড়াই করার কথা বলেছিল। এখানে কর্মীদের সমর্থন সুরক্ষিত করা এবং তাদের ন্যায্য দাবিগুলিকে মজবুত করা একটি শক্তিশালী ইউনিয়নের সহযোগিতা ছাড়া কখনই সম্ভবপর ছিল না।[২৪]

বাংলায় নদী এবং উপকূলবর্তী জলযানে বাংলার কর্মী নাবিকদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ ও বেতনগত অবকাঠামোর বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) এবং বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। যদিও এই ইউনিয়ন দুটি ছাড়াও আরও কিছু ছোট বড় বাংলার সীমেন্স ইউনিয়নের কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মূলত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যবহৃত জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের শোষণ, বৈষম্য প্রভৃতি অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বাংলায় সীমেন্স ইউনিয়নগুলি নাবিকদের স্বার্থের দিকটির প্রতি অনুধাবিত হয়ে নাবিকদের সংগঠিত করে ধর্মঘট পরিচালিত করেছিল। বাংলায় নদীকেন্দ্রিক স্টিমশিপ, ফ্ল্যাট, ভেসেল এবং স্টিমার বোটগুলিতে কর্মী নাবিকদের কলকাতা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি বন্দর ও নদী-ঘাট স্টেশনগুলিতে তাদের অভাব অভিযোগগুলির দাবি জানিয়ে ধর্মঘট করতে দেখা গিয়েছিল।

I. G. N. & R. CO. (India General Navigation and Railway Company) এবং R. S. N. CO. (River Steam Navigation Company) কোম্পানির অধীনে পরিচালিত অভ্যন্তরীণ স্টিমারে কর্মরত কর্মচারীদের মজুরি হ্রাসের ঘটনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন সংগঠনটি ১৯২০ সালের ২৯ এবং ৩১শে ডিসেম্বরে উপরিউক্ত কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্টদের এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ স্টিমার-কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিদের যৌথ সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্টিমার কর্মীদের জন্য নিম্নোক্ত মজুরির হার বৃদ্ধি এবং অন্যান্য বন্দোবস্তগুলি স্থির করেছিল:-

১। নতুন সারেং এবং ড্রাইভারদের প্রত্যেককে ১০ টাকা বর্ধিত বেতনে নিযুক্ত করতে হবে।

২। জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানির পরিষেবায় ইতিমধ্যে যে সকল ড্রাইভার এবং সারেংরা নিযুক্ত রয়েছে তাদের বিশেষ ভাতা সহ ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত বেতন দিতে হবে।

৩। প্রত্যেক লঞ্চ-সারেং, ড্রাইভার এবং ফ্ল্যাট-সারেংদের ৫ টাকা করে বেতন বাড়াতে হবে।

৪। ডেক-ক্রুরা নিম্নলিখিত হারে তাদের মজুরি পাবে যা নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া হল—

সারণি সংখ্যা – ৪

১৯২০ সালে শিপিং কোম্পানি এজেন্ট ও অভ্যন্তরীণ স্টিমার কর্মীদের যৌথ আলোচনায় ডেক-ক্রুদের নির্ধারিত বেতন হার

Rates fixed in the Settlement:-		**But owing to reductions since 1921, the existing rates of wages are:-**
(a) Tindal	… Rs. 31/- …	… Rs. 28/-
(b) Head Sukani	… ,, 29/- …	… ,, 25/-, 26/-, 29/-
(c) Upper Sukani	… ,, 26/- …	… ,, 24/-, 25/-, 26/-
(d) Kasseb	… ,, 21/- …	… ,, 20/-, 21/-
(e) Khalasie	… ,, 20/- …	… ,, 16/-, 18/-, 20/-
(f) Topaz	… ,, 20/- …	… ,, 20/-
(g) Cook	… ,, 20/- …	… ,, 18/-
(h) Manifest Clerk	… ,, 33/- …	… ,, 33/-

৫। ইঞ্জিন-ক্রুরা নিম্নোক্ত হারে তাদের মজুরি পাবে যা নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া হল –

সারণি সংখ্যা – ৫

১৯২০ সালে শিপিং কোম্পানি এজেন্ট ও অভ্যন্তরীণ স্টিমার কর্মীদের যৌথ আলোচনায় ইঞ্জিন-ক্রুদের নির্ধারিত বেতন হার

Rates fixed in the Settlement:-		**But owing to reductions since 1921, the existing rates of wages are:-**
(a) Tindal	… Rs. 31/-	… Rs. 31/-
(b) Kasseb	… Rs. 28/-	… ,, 25/-
(c) Fireman	… Rs. 27/-	… ,, 25/- but in Feeder Str. 21/-
(d) Lightman	… Rs. 31/-	… ,, 31/-

(e) (Coal-trimmer	… Rs. 20/-	… ,,	18/-, 20/-
(f) Cook	… Rs. 20/-	… ,,	18/-
(g) Greaser	… ….		(abolished)

১৯২১ সালের ধর্মঘটের পর অভ্যন্তরীণ জলযানে কর্মীদের মজুরির পরিমাণ উপরের তুলনামূলক বিবৃতিতে দেখানো হয়েছে, যদিও মজুরির পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস করা হয়েছিল এবং জয়েন্ট কোম্পানিগুলির প্রতিটি স্টিমারের ডেক এবং ইঞ্জিন উভয় বিভাগে ক্রুদের সংখ্যা ২ থেকে ৩ জন করে কমানো হয়েছিল।[২৫]

বাংলার নাবিকদের উপর শোষণ প্রক্রিয়া ১৯২১ সাল থেকে কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে এবং দিন দিন তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশেষে ১৯২৫ সালে বাংলার নাবিক ও কর্মীরা তাদের অভিযোগগুলি একত্রিত করে পুনরায় তাদের মৃতপ্রায় অ্যাসোসিয়েশনকে সংগঠিত করে, যা ধীরে ধীরে ট্রেড ইউনিয়নের কঠোর নীতি ও আদর্শের রূপধারণ করেছিল। বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক (এম. এ., বি. এল., এম. এল. সি.) ১১ই অক্টোবর, ১৯২৫ সালে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনী সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন। যেখানে তিনি 'দ্য বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন' -এর ভিত্তি স্থাপন করেন। আবার এই উদ্বোধনী সভাতেই জনাব মহম্মদ দাউদকে (এম. এ., বি. এল.) সভাপতি এবং এম. আব্দুল হককে (বি. এ.) সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এই ইউনিয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[২৬]

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ৬তম অধিবেশনে বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নকে AITUC সঙ্গে অধিভুক্ত করা হয়েছিল। যেখানে সভাপতি হিসাবে জনাব মহম্মদ দাউদ, সহ-সভাপতি মাহবুবুল হক এবং যুগ্ম-সম্পাদক আজিজুর রহমান বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯২৬ সালের ৯ ও ১০ই জানুয়ারী মাদ্রাজে AITUC -র অনুষ্ঠিত সভাতে বেঙ্গল মেরিনার্সদের অভিযোগের বিষয়ে একাধিক রেজোলিউশন গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে রেজোলিউশন নং ৪০ (ক) -টি নিম্নে দেওয়া হল –

> "This Congress condemns the actions of the I. G. N. & R. and the R. S. N. Companies in reducing the wages of their employees engaged in steamers, launches etc. in contravention of the settlement arrived at

between the said Companies and their employees' organization in the year 1920."

এখানে AITUC স্টিমার, লঞ্চ প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ I. G. N. & R. এবং R. S. N. কোম্পানির জলযানগুলিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করার পদক্ষেপকে নিন্দা করেছিল। এরফলে ১৯২০ সালে কোম্পানি এবং সংগঠনের কর্মচারীদের মধ্যে যে সমঝোতা ছিল তা লঙ্ঘিত হতে দেখা গিয়েছিল।[২৭]

ইউনিয়ন দ্বারা যৌথ কোম্পানিগুলির কাছে অভিযোগপত্র যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছিল। ইউনিয়ন ১৯২৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী AITUC কর্তৃক কর্মীদের মজুরি হ্রাস ইত্যাদির বিষয়ে ইতিমধ্যেই পাস করা রেজোলিউশন গ্রহণ করে এবং তাদের অনুলিপিগুলি যৌথ কোম্পানিগুলির কাছে তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি সরকারের কাছে প্রেরণ করেছিল। কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। কোম্পানি এবং সংগঠনের মধ্যে সমঝোতা লঙ্ঘিত হলে বাংলায় স্টিম বোট কর্মী নাবিকদের মজুরি উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। সারেং এবং ড্রাইভার যারা সরাসরি ক্রু নিয়োগ করত, তারা জয়েন্ট কোম্পানিগুলির কাছে কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য পৃথকভাবে আবেদন করতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যথায়, তারা দাখিল করেছিল যে তারা জাহাজের জন্য ক্রু নিয়োগ করতে পারবে না, কারণ কর্মীরা বিদ্যমান নিম্ন মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল না। এই স্বল্প বেতন তাদের জীবনের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য যথেষ্ট অপ্রতুল ছিল। কোনো প্রভাব ছাড়াই সারেং এবং ড্রাইভারদের দ্বারা এই স্বতন্ত্র আবেদনের উপস্থাপনা ১৯২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে, যখন সারেং এবং ড্রাইভারসহ কর্মীরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুরো বিষয়টি তাদের ইউনিয়নের কাছে উল্লেখ করেছিল। তাই ইউনিয়ন, ১৯২৬ সালের ১০ই অক্টোবর জনাব মহম্মদ দাউদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্টিমার কর্মীদের (বিশেষ করে ডেক এবং ইঞ্জিন-ক্রুদের) উল্লিখিত অভিযোগগুলি দূর করার জন্য কার্যকরী পরিষদকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছিল।[২৮]

এই বিষয়টি জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলির অবগতির জন্য ১৩-১০-১৯২৬ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। I. G. N. & R. এবং R. S. N. স্টিমার কোম্পানি দুটিতে ক্রু নিয়োগ প্রক্রিয়াটিতে সারেং এবং চালকদের অনেকটা ভূমিকা ছিল।

এখানে ক্রুরা বেশিরভাগই ছিল কৃষক শ্রেণীর অন্তর্গত। তারা প্রতি মাসে ১৭ কিংবা ১৮ টাকায় কাজ করতে অস্বীকার করে কারণ তারা ক্ষেত-শ্রমিক হিসাবে নিশ্চিন্তে ১/৮ থেকে ২ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারত। কিন্তু সারেং এবং ড্রাইভাররা ক্রু শ্রম দুস্প্রাপ্য এই বলে তাদের পোশাক এবং রাত্রিতে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পাশাপাশি দৈনিক খাবার ব্যবস্থা ও এরই সঙ্গে ক্রুদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির কাছে এক করুণাময় আবেদন করেছিল যাতে ক্রুদের নিয়োগে কোনো অসুবিধা না দেখা দেয়। ক্রু শ্রমিকরা এই সুযোগ সুবিধাগুলির প্রতি সারেং এবং ড্রাইভারদের কাছে আস্থাশীল হয়ে কাজে যোগদান করলে সেখানে কোম্পানির ভিন্নরকম কাজের শর্তগুলি তাদের আশাহত করেছিল। এদের যে কোনো অজুহাতে চাঁটাই করতে দেখা গিয়েছিল। ক্রুদের বেদনাদায়ক ভাবে কর্ম থেকে বরখাস্ত করার পর এই জলযানগুলিতে প্রয়োজনীয় কর্মীদের খুঁজে বের করে নিয়োগের জন্য কোম্পানি সারেং এবং ড্রাইভারদের দায়িত্ব দিলে তাদের পক্ষে ক্রু শ্রমিকদের সন্ধানের বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরফলে সারেং এবং ড্রাইভাররা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিল - "আমরা স্বীকার করি যে আমরা এই দুটি বড় কোম্পানির অযৌক্তিক আচরণে কিছুটা অবাক হয়েছি। কেন তারা ক্রু নিয়োগের ভার নিজের হাতে তুলে নেবে না, তা 'সারেং' ও 'ড্রাইভার' -দের হাতে ছেড়ে দেবে? কম মজুরির কারণে ক্রু শ্রমিক অনুপলব্ধ হলে, যারা নিয়োগের জন্য অভিযুক্ত তাদের কেন শাস্তি পেতে হবে? কোম্পানিগুলো কি চায় যে তাদের সারেং এবং ড্রাইভাররা চা বাগান কুলিদের নিয়োগ করে দালালের ভূমিকা পালন করুক? এমনকি যদি সারেং এবং ড্রাইভাররা এত নীচে নামতে ইচ্ছুক হয়, তবে কাজের শর্তগুলি ভিন্ন হবে। স্টিমারগুলিতে শ্রম ব্যবস্থা সভ্যতার স্থল থেকে বহু দূরে থাকা চা-বাগানের মতো চুক্তিভিত্তিক শ্রম দেওয়ার জন্য অনুপযুক্ত ছিল"।[২৯]

১৯২০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ নদীকেন্দ্রিক জলযানগুলিতে কর্মরত নাবিকদের কাজের সময়সীমার বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে কাজের সময়ের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি জানার জন্য কলকাতা পোর্ট কমিশনারকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৩৪২ নং চিঠির প্রেক্ষিতে কমিশনারকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অভ্যন্তরীণ জলযানে ক্রুদের কাজের সময় সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৬০ ঘণ্টা সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়ে এবং সেই সঙ্গে সময়ের অতিরিক্ত কাজে বর্ধিত হারে অর্থ দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে দৃষ্টি প্রদান করতে বলা হয়েছিল। লঞ্চের

ক্রুদের মতামত সরকারের কাছে প্রেরণ করার জন্য ৪ জন উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ সারেংকে (২ জন ডেক এবং ২ জন ইঞ্জিন-রুম) অফিসে পাঠানোর কথাও বলা হয়েছিল।[৩০]

অভ্যন্তরীণ জলযানে কাজের সময় সীমাবদ্ধতা নিয়ে লীগ অব নেশনসের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাধারণ সম্মেলনে কিছু সুপারিশ উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯২০ সালের ১৫ই জুন আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসের পরিচালকবর্গের দ্বারা জেনোয়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এবং তার আগের বছর নভেম্বরে ওয়াশিংটন সম্মেলনে নাবিকদের খসড়া সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সমুদ্রপথে পরিবহনসহ সমস্ত শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে কাজের সময়সীমা সীমিত করা এবং নির্ধারিত শর্তে অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহনের কাজ দিনে ৮ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছিল। জেনোয়া সম্মেলনে প্রাথমিক বিষয়সূচি হিসাবে বোর্ড জাহাজে কর্মীদের আবাসন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিয়মগুলি একটি সুপারিশ আকারে নির্ধারণ করে ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন ভার্সাই চুক্তি, ১৯১৯ সালের ১০ই সেপ্টম্বর সেন্ট জার্মেইন, ১৯১৯ সালের ২৭শে নভেম্বর নেউলি চুক্তি এবং ১৯১৯ সালের ৪ঠা জুন গ্রান্ড ট্রায়াননের চুক্তিতে শ্রম অংশটিকে জাতীয় আইন দ্বারা কার্যকর করার জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল।[৩১]

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ঘোষিত শান্তি চুক্তির শর্তগুলি সমস্ত শিল্প মালিকেরা যাতে গ্রহণ করে তা চেষ্টা করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিটি সদস্যদের, সম্মেলনে নির্ধারিত নিয়মগুলি অভ্যন্তরীণ জলযানে নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজের সীমিত সময় নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই কেন্দ্রীভূত জলযানগুলিতে নাবিকদের কাজের সময় দৈনিক ৮ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল, যদিও এটি গৃহীত হয়নি।[৩২] ১৯২১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৩৪২ নং চিঠির উত্তরে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সুপারিশের বিষয়ে কলকাতা পোর্ট কমিশনার জানিয়েছিলেন সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৬০ ঘণ্টার সীমার মধ্যে কর্মীদের কাজে নিযুক্ত করা হয়। কমিশনারদের পরিষেবায় নিয়োজিত অন্তর্বর্তী জলযানগুলিতে কর্মীদের সর্বোচ্চ কাজের সীমা খুব কমই অতিক্রম করা হয় এবং প্রতি মাসে ঘণ্টা হিসাবে কাজের সংখ্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কম ছিল। কাজের শর্ত নির্দিষ্ট কিছু জাহাজের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়েছিল, জোয়ারের সম্মুখীন চলা বড়ো ড্রেজারের মতো সার্ভিস ভেসেল যেমন টাগ, হেভ-আপ, হাউসার ও অ্যাঙ্কর বোটগুলি এবং সাময়িকভাবে জোয়ার মুখী জাহাজগুলি বিভিন্ন কাজে নিয়মিত সময়ের জন্য ব্যবহৃত ফেরী-স্টিমারগুলির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে কর্মীদের জন্য

ডাবল শিফ্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কাজের ভিত্তিতে দ্রুত একটি টাইম-টেবিল নির্ধারণ করা হয়েছিল, যদিও এটি কাজের জন্য যথেষ্ট অসুবিধাজনক এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমিশনাররা নাবিকদের জীবনযাত্রার বর্ধিত ব্যয়ের জন্য মজুরি বৃদ্ধি ঘটালেও মানবিক কারণে অতিরিক্ত ভাতা সহ অর্থপ্রদানের পক্ষপাতি ছিল না। আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসারের সঙ্গে দুজন ডেক এবং ইঞ্জিন-রুম প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারে বাংলার অভ্যন্তরীণ নাবিকদের কর্মের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি অবগতির মধ্যদিয়ে সুনিশ্চিত করা হয়েছিল।[৩৩]

কলকাতা পোর্ট কমিশনার এবং শিপিং অফিসের আধিকারিকদের দেওয়া রিপোর্টে বলা হয় অভ্যন্তরীণ জলযানে কর্মরত নাবিকদের কাজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে (ILO) অবগতির মাধ্যমে সুনিশ্চিত করলেও কার্যক্ষেত্রে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল তা ছিল প্রশ্নাতীত। কারণ ঐ একই জলযানে কর্মরত নাবিকদের অভাব-অভিযোগগুলি ১৯২০ সালের পর বহিঃপ্রকাশ হতে দেখা গিয়েছিল। বাংলায় নাবিকদের অভাব-অভিযোগগুলি নিয়ে সীমেন্স ইউনিয়নগুলি ক্রমশ সক্রিয় হয়েছিল, যারফলে বাংলার অভ্যন্তরীণ জলযানে কর্মীদেরও সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নটি ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট-ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের (ITF) সঙ্গে অধিভুক্ত হয়ে বিশ্ব-শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগগুলি উত্থাপন করেছিল যা অভ্যন্তরীণ স্টিমারগুলিতে কর্মরত নাবিকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। এরফলে বাংলার নদীতে চলাচলকারী অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে কর্মী শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগগুলিকে ITF নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল।[৩৪]

বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের জয়েন্ট সেক্রেটারি আজিজুর রহমানের গত দুই তিন মাসের প্রোপাগান্ডার ফলে ইতিমধ্যেই সোনাচরা, বরিশাল প্রভৃতি ওয়ার্কশপের প্রায় সমস্ত লোক এবং স্টিমার ক্লার্ক ও এজেন্সি স্টাফ থেকে প্রায় ৪০০ জন নতুন মেম্বার এই ইউনিয়নে যোগদান করেছিল। এদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে যতটা জানা গেছে তার মধ্যে নিম্নে কতকগুলি প্রকাশ করা হল।[৩৫]

(ক) I. G. N. & R. এবং R. S. N. কোম্পানির এজেন্সি স্টাফ বা সাব-এজেন্টদের অভাব অভিযোগ: [৩৬]

(১) এদের জন্য ফ্রি কোয়ার্টারের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না।

(২) বর্তমানে এদের জন্য যে মাইনে প্রদান করা হয় তা তাদের দায়িত্ব এবং কাজের হিসাবে খুবই স্বল্প।

(৩) এদের খাটুনির জন্য কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না, জয়েন্ট এজেন্টদের ইচ্ছা অনুযায়ী এদের প্রায়ই অতিরিক্ত সময়ের জন্য পরিশ্রম করতে হত। তবে তার জন্য ওভারটাইম এলাউন্সের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না।

(৪) এদের মাইনের কোনো নির্দিষ্ট গ্রেড ছিল না।

(৫) ছোট বড় সমস্ত স্টেশনগুলি এদের দায়িত্বে থাকলেও আয়ের সিকি অংশ জয়েন্ট এজেন্ট কমিশন স্বরূপ গ্রহণ করতেন, কিন্তু সাব-এজেন্টরা তার কিয়দ অংশ পেতেন না। জয়েন্ট এজেন্টদের বসবাসের জন্য বিনামূল্যে দ্বি-ত্রিতল অট্টালিকা দেওয়া হত, কিন্তু সাব-এজেন্টদের বসবাসের জন্য বিনামূল্যে কোনো কুঁড়ে ঘরেরও বন্দোবস্ত ছিল না।

(৬) জয়েন্ট এজেন্ট যা করবেন তার বিরুদ্ধে সাব-এজেন্টদের কোনো কৈফিয়ৎ বা আপিল গ্রহণ করা হত না।

(৭) Fundamentel বা Casual leave দেওয়ার ব্যাপারে কোনো নিয়ম মানা হত না।

(খ) স্টিমার ক্লার্কগণের অভাব অভিযোগ:[৩৭]

(১) এরা ২৫ টাকায় কর্মে নিযুক্ত হলেও এদের গ্রেড ছিল ৫০ টাকা, কিন্তু ৫০ টাকা অবধি পৌঁছাতে কাউকে দেখা যায়নি।

(২) পদ্মা-কালীগঞ্জ, খুলনা-বরিশাল, ঢাকা–নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব প্রভৃতি স্থানে এদের কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল না।

(৩) স্টিমার ক্লার্কদের ৩-৪ ঘণ্টা ট্রিপের মধ্যে ১০০০-১২০০ প্যাসেঞ্জারের টিকিট পরীক্ষা করা, ভয়েজ রিপোর্ট লেখা, লগ-বুক লেখা, ৫০০-৭০০ জনের চালান লেখা, প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারের টিকিটাদির আবশ্যক স্থলে Extra-fare ঠিক করে দেওয়া প্রভৃতি কাজ করতে হত।

(৪) উপরিউক্ত এতো কাজের দায়িত্ব থাকা সত্বেও এদের রান্না-বান্নার জন্য কোনো বাবুর্চি ছিল না। এইজন্য বাধ্য হয়ে এদের বাটলারের কাছ থেকে প্রতি বেলায় কিছু অর্থ প্রদান করে খোরাকী খেতে হত।

(৫) সারেং ড্রাইভারদের মতো জ্বলন্ত বয়লারের পাশেই এদের কেবিন ছিল। এই সমস্ত কেবিনে কোনো ফ্যানের বন্দোবস্ত না থাকায় সারেং এবং ড্রাইভারগণ ফ্যানের জন্য দরখাস্ত করেছিল।

এমত অবস্থায় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আশা করা হয় যে এখনো যারা ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হতে বাকী আছেন তারা সত্বর সদস্য হয়ে তাদের অভাব অভিযোগের বিষয়গুলি ইউনিয়ন অফিসে অতি শীঘ্রই জানান যাতে করে এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিকারের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিকার করা যায়।

(গ) বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের সদস্যগণের অভাব-অভিযোগ:

১৯২৭ সালের ২৮ শে সেপ্টম্বর থেকে জয়েন্ট কোম্পানির সঙ্গে ইউনিয়নের পরপর ৫ টি সাব-কমিটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারফলে জয়েন্ট কোম্পানি নাবিক সদস্যদের বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিল। এরফলে সদস্যগণের যৎসামান্য লাভ হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে ছোট খাটো ভুল ভ্রান্তির জন্য নাবিকদের উপর জরিমানা, বরখাস্ত এবং ছাঁটাই প্রভৃতি শাস্তি ধার্য করা হয়েছিল যারফলে এ কথা মনে হয় যে কোম্পানি বৃদ্ধি তলব বাবদ যে পরিমাণ টাকা প্রদান করেছিল তার তিনগুন টাকা এইভাবে ছলে বলে কৌশলে আদায় করার বন্দোবস্ত করেছিল। গত দুই তিন মাসের মধ্যে যে সমস্ত সার্কুলার বের হয়েছিল তাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৮] যাইহোক এই সমস্ত সদস্যদের যে সকল অভাব অভিযোগ ছিল তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল—

(১) রুদ্রা, দেবানা, সিংলা, সেন্ডুইন প্রভৃতি যে সমস্ত জাহাজে প্রায় ২০০ টন মাল বোঝায় করা হত এবং ঘাটে ঘাটে মাল রিসিভ ও ডেলিভারি করা হত, সেই সমস্ত জাহাজে কোনো টালি-সুখানী না থাকায় সারেং ও খালাসিদের দ্বারাই যাবতীয় কার্য পরিচালিত হত। তবে সারেং ও খালাসিদের মাইনে মাসে মাসে নানা অজুহাতে কেটে নেওয়া হত।

(২) জাহাজে সারেংদের চুরি ধরার উদ্দেশ্যে পিল্‌ফারিং ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা হয়েছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এরা স্টিমারের উপরে থাকতেন ততক্ষণ এরা লোকেদেরকে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করতেন। সবশেষে চুরির মতো কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটলে

এরা নানা অছিলায় রিপোর্ট তৈরি করতেন এবং সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সারেংদের জরিমানা ধার্য করতেন। এই অবস্থায় একথা প্রমাণিত যে এই সমস্ত ইনস্পেক্টররা শুধুমাত্র সারেংদের ব্যতিব্যস্ত করতেই নিযুক্ত হয়েছিলেন।

(৩) কোনো সারেং যখন ছুটিতে যেত তখন তার উপর অর্পিত অভিযোগের দাবি তার স্থলে নিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করা হত। অনেক লেখা লেখির পরেও এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

(৪) চিৎলা, ভেটুয়া, পলাশ প্রভৃতি স্টিমারগুলি দিন রাত্রি চলার জন্য তাতে সেকেন্ড সারেং এবং সেকেন্ড ড্রাইভার নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দিন রাত ডিউটির জন্য একজন মাত্র কয়লাওয়ালা ছিল। মাত্র একজন কয়লাওয়ালার পক্ষে দিন রাত ডিউটি করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার এইসব স্টিমারে খালাসির সংখ্যাও ছিল খুব কম। একজন ভাণ্ডারীকে ডেক্ ও ইঞ্জিন ক্রু প্রভৃতি নিয়ে প্রায় ২২-২৩ জন লোকের রান্না করতে হত যেটাও ছিল খুবই দুরুহ ব্যাপার।

(৫) এখন পর্যন্ত সমস্ত স্টিমারে সুখানীর জন্য টুলের ব্যবস্থা ছিল কেননা একসঙ্গে ছয় ঘণ্টা ডিউটি করতে তাদের মাঝে মধ্যে টুলে বসা আবশ্যক হয়ে পড়ে (রামা, বরুণা প্রভৃতি স্টিমারে এইরূপ ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই সমস্ত জলযানগুলিতে ডিউটির সময় ছিল ২ ঘণ্টা)। ইতিমধ্যে সোণাচরার মেরিন ইনস্পেক্টর মিস্টার মিনহাম এক সার্কুলার জারি করে বলেছিলেন যে গোয়ালন্দ এবং নারায়ণগঞ্জের আওতায় যত স্টিমার আছে সেগুলি থেকে বসবার জন্য ব্যবহৃত টুল তুলে নিতে হবে এবং কোনো সুখানী টুলে বসে ডিউটি করলে ১০ টাকা জরিমানা করা হবে। ফলস্বরূপ সুখানীরা দাবি করেছিল যদি টুলে বসে ডিউটি করার প্রথা বন্ধ করা হয় তবে রামা, বরুণা প্রভৃতি স্টিমারগুলির মতো দুই ঘণ্টা ডিউটির ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হবে।

(৬) ১৯২১ সালে রানিং ফ্ল্যাটগুলিতে ছাঁটাই ও অন্যান্য কারণ বসত কর্মী সংখ্যা কমে গেলেও পরবর্তী সময়ে তা পূরণ হয়নি। এদিকে কাজের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। কাজেই বর্তমানে রানিং ফ্ল্যাটের সারেংয়ের আওতায় যে সমস্ত ক্রু ছিল তা যথেষ্ট নয়। যে সমস্ত ফ্ল্যাট ২২,০০০ মণের উপর মাল বহন করে তাতে টালি সুখানী

ছিল মাত্র ২ জন এবং যে সমস্ত ফ্ল্যাট ২২,০০০ মণের নিচে মাল বহন করে তাতে মাত্র একজন টালি সুখানী ছিল। কোনো কোনো ঘাটে এই সুখানীদের মালের আমদানি রপ্তানি বুঝে ৩/৪ গ্যাংওয়ে খুলে শিপিং ল্যান্ডিং করতে হত। যা ছিল একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। রানিং ফ্ল্যাটগুলিতে খালাসিরা মূলত মালের স্টক দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকত। সুখানীরা তাদের কাছ থেকে অন্য কোনো সাহায্য পেত না। এই পর্বত প্রমাণ চাপের জন্য সারেংদের উপর প্রায়ই নানারকম অভিযোগ আসতো। ফলস্বরূপ অনেক সময় তাদের কম মাইনে প্রদান করা হত। আবার অনেক সারেংকে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

(৭) কোম্পানির বড় বড় ঘাটে যে সমস্ত রিসিভিং ফ্ল্যাট আছে তাদেরও অনেক অভাব অভিযোগের কথা শোনা গিয়েছিল। আসাম লাইনের ফ্ল্যাটগুলিতে খালাসি সংখ্যা ছিল মাত্র ৪/৫ জন। এদেরকে মাল রিসিভ এবং ডেলিভারি করতে হত। চাঁদপুরে যে সমস্ত রিসিভিং ফ্ল্যাট আছে তাতে যে সমস্ত সারেং কাজ করত তাদেরকে না অজুহাতে হয় সাসপেন্ড না হয় ডিস্‌মিস্‌ করা হত। কেন এরকম করা হত তা জানতে পারা যায়নি।

(৮) I. G. কোম্পানির বার্জ্জ বোটে মাঝির মাইনে ছিল ২৬ টাকা এবং খালাসির মাইনে ছিল ২০ টাকা। আবার R. S. N. কোম্পানির বার্জ্জ বোটে মাঝির মাইনে আগে ছিল ২৩ টাকা বর্তমানে হয়েছে ১৬ টাকা এবং খালাসির মাইনে ছিল ১৬ টাকা এখন যার পরিমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা। একইরকম কাজে দুই কোম্পানির দুরকম বেতনের হার নাবিকদের আশাহত করেছিল। তারা এই বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়ার জন্য কোম্পানিগুলিকে আবেদন জানিয়েছিল। R. S. N. কোম্পানির কলকাতায় M/c মার্কা অনেকগুলি বার্জ্জ ছিল। কোম্পানি এই বার্জ্জগুলি চালানোর ভার ঠিকাদারদের উপর দিয়েছিল। এই সমস্ত ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে বার্জ্জ মাঝিদের অনেক অভিযোগ ছিল। কিন্তু কোম্পানি সে ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত করেনি।

(৯) I. G. কোম্পানিতে ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত অনেক সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বদলি হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই নতুন নতুন বিধান প্রবর্তন করেছিল তাতে সারেংদের জরিমানা, মাইনে কমে যাওয়া, ছাঁটাই প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল এর আশু প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সারেংরা দাবি জানিয়েছিল।

(১০) পাঞ্জাব স্টিমারের রফিয়জ্জমা মাস্টার এক মাসের ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার সময় বেশকিছু ক্রুদের তার কাজের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে একজন মিস্টার হুইয়ের হুকুম না মানায় বেচারা রফিয়জ্জামাকে ৬ মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এই বিচার প্রহসন যে আরও কত জনের ভাগ্যে জুটেছিল তার কোনো হিসাব নেই।

(১১) I. G. N. & R. কোম্পানির ড্রাইভারগণ ইউনিয়নের সঙ্গে জয়েন্ট কোম্পানির ১৯২৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের বৈঠকে শর্ত মোতাবেক সম আকৃতির জাহাজে সম সংখ্যক ক্রু দেওয়ার জন্য ম্যানেজিং এজেন্টের নিকট আবেদন জানিয়েছিল। এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল তা জানবার জন্য ইউনিয়ন থেকে কোম্পানিকে একটি চিঠি লেখা হয়। এই চিঠিতে কোম্পানিকে এও জিজ্ঞাসা করা হয় যে সারেং বা ড্রাইভার তাদের অধীনস্ত ক্রুদের কাছ থেকে প্রতি মাসে কত টাকা বাদ দিতে পারে। এজন্য কোম্পানি কিছু ব্যবস্থাগ্রহণ করেছেন কিনা জানতে চাওয়া হয়। এছাড়া জয়েন্ট কোম্পানির স্টিমারগুলিতে ২২/২৩ জন কর্মীদের জন্য দুজন করে ভাণ্ডারী দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। কিন্তু কোম্পানি এতদিন পর্যন্ত এই চিঠির কোনো সদুত্তর দেয়নি।

অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে কর্মরত বাংলার নাবিকদের এই অভাব অভিযোগগুলির সেভাবে কোনো প্রতিকার না হওয়ার ফলে সীমেন্স ইউনিয়নের সহায়তায় এরা বন্দর এবং ঘাট স্টেশনগুলিতে প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্মঘট শুরু করেছিল। এই আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলি তাদের বেতনগত অবকাঠামো এবং কর্ম ও বর্ণগত বৈষম্যের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে স্টিমার ধর্মঘটগুলি সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে রজত রায় তার *"Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflicts of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939"* গ্রন্থে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ইনল্যান্ড স্টিমশিপ অ্যান্ড ফ্ল্যাট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে ২৬,০০০ জন সদস্য বিশিষ্ট স্টিমারের কর্মীরা স্টিমার কোম্পানির বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরু করেছিল। এই ইউনিয়নের সচিব, গাড়োয়ালি স্টিমারের সারেং আব্দুল মজিদ চৌধুরী স্টিমার ধর্মঘট সংগঠিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় চাঁদপুরে আটকে থাকা আসাম চা-বাগান কুলিদের সমর্থনে পূর্ববঙ্গে স্টিমার

ও রেলওয়ে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হলে এই প্রচন্ড সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে চাঁদপুরে স্টিমার ধর্মঘট সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল।[৩৯]

বাংলার অভ্যন্তরীণ স্টিমারে কর্মরত ক্রু নাবিক এবং এরই সঙ্গে সারেং ও ড্রাইভারদের অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দাবিগুলি পূরণ না হওয়ায় তারা জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নটি যেভাবে স্টিমারে কর্মরত বাংলার নাবিকদের অভাব-অভিযোগগুলি দূর করার জন্য স্টিমার কোম্পানিগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছিল ঠিক একইভাবে এদের দাবিগুলির প্রতি কোম্পানির উদাসীনতার জন্য এই স্টিমার কোম্পানির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ধর্মঘট পরিচালিত করার ক্ষেত্রে এই ইউনিয়নটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। তবে আরও কিছু স্থানীয় সীমেন্স ইউনিয়নের কথা জানতে পারা যায় যেগুলি নদীকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ জলযানে কর্মরত নাবিকদের স্বার্থে কাজ করেছিল। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা যায় কোম্পানিগুলি তাদের লভ্যাংশের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। ১৯২০ সাল নাগাদ এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ৩২,০০০ পাউন্ড বা ৪,৩২,০০০ টাকা। কোম্পানিগুলির কাছ থেকে চাহিদা পূরণের জন্য এটি একটি উপযুক্ত সময় হওয়ায় ইউনিয়ন অবিলম্বে কর্মীদের মজুরিতে ২৫% সাধারণ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিল। নাবিকদের দীর্ঘকাল স্বল্প মজুরির গ্লানি কাটানোর জন্য কোম্পানিগুলির মুনাফার দিকটি বিবেচনা করে বেতন বৃদ্ধির দাবি ছিল বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গত। শোষণের একটা সীমা আছে এবং কোম্পানিগুলো যদি সেই সীমা অতিক্রম করে তাহলে শ্রম সবসময় অসন্তুষ্ট থাকবে এটাই স্বাভাবিক।[৪০] পুঁজির উপর ভিত্তি করে মাত্রাতিরিক্ত শ্রম শোষণকে প্রতিহত করার জন্য স্টিমার কর্মীরা ধর্মঘটের দিকে ধাবিত হয়েছিল।

১৯৩০ সালের পর বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত বাংলার অভ্যন্তরীণ জলযানে ক্রু নাবিকেরা ইউনিয়নের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন এবং সভা সমাবেশগুলিতে যোগ দিয়ে ধর্মঘট চালিয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বিমলা মোহন গাঙ্গুলির সভাপতিত্বে ১৯৩১ সালের ২২শে আগস্ট নারায়ণগঞ্জে I. G. N. এবং R. S. N. কোম্পানির প্রায় ৪০০ জন কর্মচারীর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেরিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহম্মদ দাউদ সহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সভায় বক্তব্য রাখেন, যারা জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানিকে কর্মচারীদের অভিযোগ দূর করার পাশাপাশি তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান এবং এরই কিছু মাস পূর্বে ১৯৩১ সালের ২৮শে মে

বরিশালে এক অনুষ্ঠিত সভায় দাউদ ঘোষণা করেছিলেন স্টিমার কর্মীদের স্বার্থে ইউনিয়নের দাবিগুলি জয়েন্ট কোম্পানিগুলি না মানালে তিনি ধর্মঘট ঘোষণা করবেন।[৪১] বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন তাদের ১৯৩০-৩১ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের আওতায় আনার জন্য ১০০ টনের কম ওজনের জাহাজগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ করেছিল। এছাড়া অভ্যন্তরীণ স্টিমারগুলিতে কর্মীদের পরিষেবার বিষয়ে একটি সার্বজনীন তদন্ত করার কথা বলেছিল। ৩০শে অগস্ট ইউনিয়নের একটি সাধারণ সভায় প্রায় ২০০ জন লোক উপস্থিত হয়েছিল।[৪২] সেখানে তাদের অভিযোগের প্রতি জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানিগুলির উদাসীনতার জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করা হয় যেখানে ধর্মঘটকেই একমাত্র প্রতিকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের সভাপতি মহম্মদ দাউদ এবং অন্যান্য পদাধিকারীরা ১৯৩১ সালের ২৮শে সেপ্টম্বর বরিশালে, ২৭শে সেপ্টম্বর খুলনায়, ২৯শে সেপ্টম্বর নারায়ণগঞ্জে এবং ১লা অক্টোবর গোয়ালন্দে অভ্যন্তরীণ স্টিমার কর্মচারীদের সভায় বক্তৃতা দেন। সেখানে কর্মচারীদের অভিযোগগুলি বিভিন্ন স্থানে সঞ্চারিত করে তিনি জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানিগুলির এই অভিযোগগুলির প্রতি উদাসীনতার তীব্র নিন্দা করেন এবং খুলনায় সরকারকে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াটির উপর তদন্ত করতে বলেন। তবে খুলনায় গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে ঐক্যমত কম থাকায় ১৮ই অক্টোবর একটি সাধারণ ধর্মঘট শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যদিও এই ধর্মঘটটি পূজার আগে ৩০শে সেপ্টম্বর বরিশাল এবং গোয়ালন্দতে সংগঠিত হয়েছিল।[৪৩] বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৩রা এপ্রিল ১৯৩২ সালের অনুষ্ঠিত এক সভায় জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানিগুলির ড্রাইভার ও সারেংদের মজুরি এবং সমস্ত স্টিমারে কর্মরত কর্মীদের বেতনের পরিমাণ হ্রাস করার নির্দেশিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তৃতা রাখা হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জের কোম্পানির সহকারী জয়েন্ট এজেন্টের ফ্ল্যাটে আয়োজিত একটি নৈশভোজে কয়েকজন ইউনিয়ন কর্মকর্তা ও সারেংদের প্রতি অবমাননাকর আচরণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[৪৪]

১৫ জুন ১৯৪৬ সালে নারায়ণগঞ্জে বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে মিস্টার ফয়েজ আহ্মেদ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই সভায় অভ্যন্তরীণ স্টিমারে কর্মরত সমস্ত কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে রেশন এবং বিনামূল্যে ইউনিফর্মের দাবি জানানো হয়। বৈঠকে আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে স্টিমার কোম্পানিগুলি

সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে দাবি না মানলে নাবিকরা ধর্মঘট করবে। ধর্মঘটকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৫০,০০০ টাকার 'ফাইটিং ফান্ড' নামক একটি তহবিল চালু করা হয়েছিল যেটি কর্মীদের কাছ থেকেই সংগৃহীত করা হয়েছিল।[৪৫]

ডজানী জাহাজী নাবিকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে ২৬শে জুলাই ১৯৪৬ সালে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিষয়টি ১লা আগস্ট ১৯৪৬ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। হোর মিলার কোম্পানির অধিনস্ত জাহাজী কারখানার শ্রমিক ও বোট কর্মীদের আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। ইউনিয়নের এই সভাটি অবনী মোহন মুখার্জীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহ্‌মেদ -এর দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। ফয়েজ আহ্‌মেদ ইউনিয়নের বক্তৃতায় কোম্পানি শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, পেনশন, ভাতা এবং ঘুষখোরী বন্ধ করার জন্য বলেছিলেন কিন্তু কোম্পানি নানা অজুহাতে এগুলি পুনর্বহাল রেখেছিল এবং এটি ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে আপোসে মীমাংসাও করেনি। জলপথে জনসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধার দিকটি বিবেচনা করে এতদিন ধর্মঘট সংগঠিত হয়নি। তবে এগুলি কোম্পানি সমাধান না করলে ধর্মঘট সংগঠিত হবে এবং এরজন্য কোম্পানিই দায়ী থাকবে। এর সঙ্গে অন্যান্য নেতারা কোম্পানির জুলুম ও অবিচারের কথা উল্লেখ করে নাবিকদের সঙ্গে অন্যসকল শ্রমিকদের ইউনিয়নের ছত্রতলে ঐক্যবদ্ধ করে সাংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প নিয়েছিল।[৪৬]

বাংলার অভ্যন্তরীণ নদীকেন্দ্রিক জলযানগুলিতে নাবিকদের দীর্ঘদিন ধরে ইউনিয়ন দ্বারা পরিচালিত সভা, সমাবেশ এবং আন্দোলনগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। পুঁজির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা বহন করেছিল এবং স্টিমার কোম্পানির কর্মীদের আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলি কর্মজীবনের ক্ষেত্রে তাদের অধিকারের জায়গাটি সম্পর্কে সচেতন করেছিল। নাবিকদের এই সংগ্রাম এবং আন্দোলনগুলি প্রভাবিত করতে ইউনিয়ন দ্বারা সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রটির বাইরেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিখে চাহিদার ভিত্তিতে ন্যায্য দাবিদাওয়াগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক এবং কবি, সাহিত্যিকদের লেখনীগুলি শ্রম চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছিল।

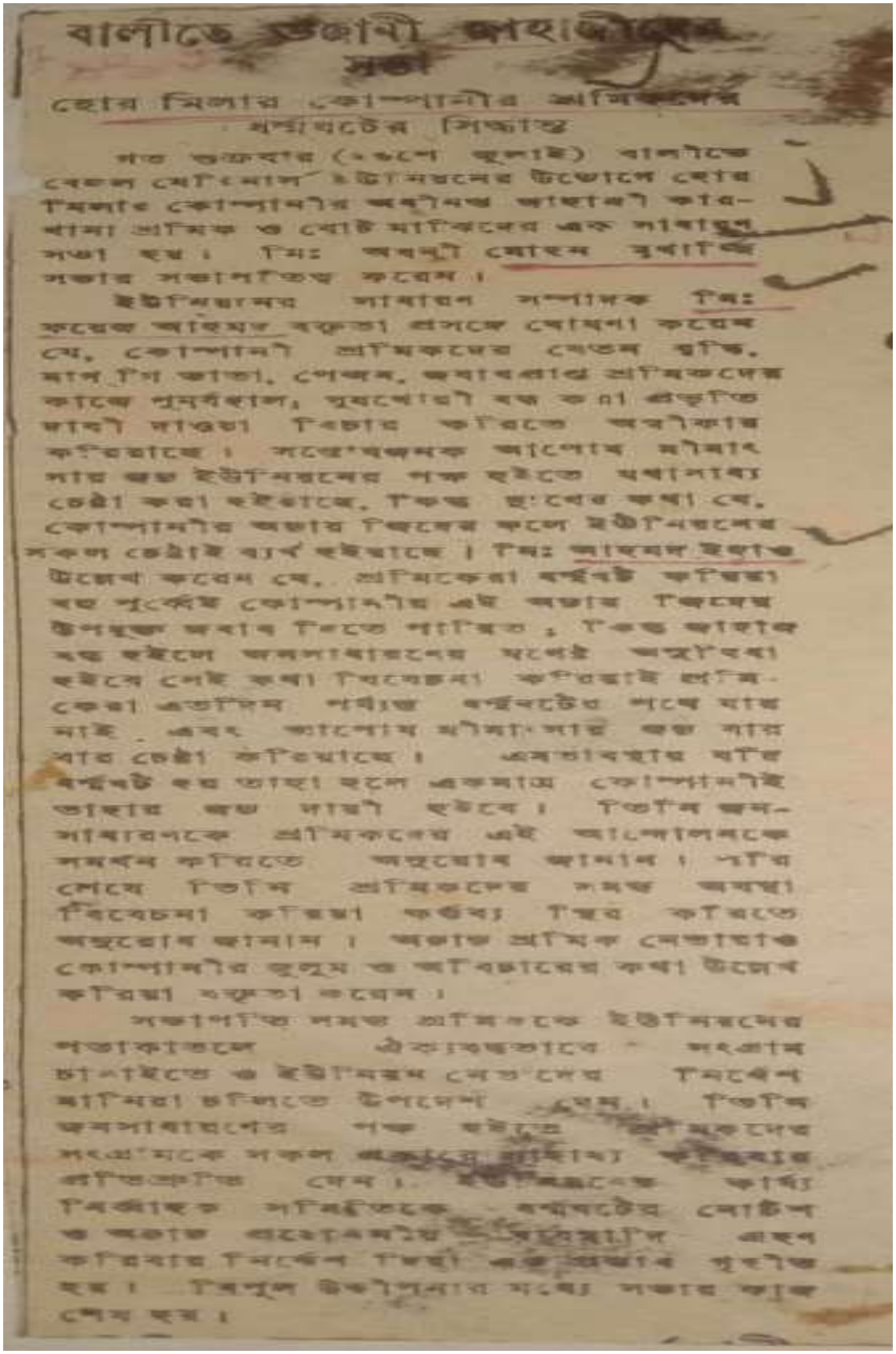

বালীতে ডজানী জাহাজীদের সভা

হোর মিলার কোম্পানীর শ্রমিকদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত

১লা আগস্ট ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত আজাদ পত্রিকায় বালীতে ডজানী জাহাজ কর্মী শ্রমিকদের ধর্মঘটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১.৪. বাংলার নাবিক জীবন সম্পর্কিত শ্রম চেতনায় কবি এবং সাহিত্যিকদের লেখনীগুলির সাহিত্যে প্রতিফলিত রূপ নিদর্শন:

শ্রম চর্চার ক্ষেত্র শুধুমাত্র ঐতিহাসিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, শ্রেণী চেতনায় শ্রমকে অঙ্গীভূত করার ক্ষেত্রে বাংলার বিভিন্ন লেখক এবং কবি–সাহিত্যিকদেরও অগ্রণী ভূমিকাগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে নজরুলের 'সাম্যবাদী' (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থের 'কুলি-মজুর' কবিতার দুটি পঙক্তি তুলে ধরা হল-

"চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?"

উপরিউক্ত কবিতার লাইন দুটিতে কবি, শ্রমিকদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে তাদের জীবনের দুরাবস্থার বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।[৪৭] ঔপনিবেশিক বাংলায় কবি সাহিত্যিকদের বিভিন্ন লেখাগুলিতে শ্রমিকদের প্রতি দরদ-ভরা ভালোবাসা ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছিল। নদীমাতৃক বাংলার জলপথে চলাচলরত জলযানগুলিতে বাংলার ক্রু নাবিকদের কর্মজীবন এবং তাদের সাংগ্রামের দিকটি কবিতা এবং সাহিত্যের রচনাশৈলীতে ধরা পড়েছে। এখানে শ্রেণী শোষণ, বৈষম্য ও সামাজিক অসংগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই বিষয়গুলিকে নিয়ে কবি এবং সাহিত্যিকদের শ্রেণী চেতনায় মার্কসীয় ভাবনাগত দিকগুলি কারুশৈলী লেখনীগুলি রূপায়িত হয়েছিল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে থাকাকালীন সময়ে বোটের সঙ্গে মানুষের কী অদ্ভুত সম্পর্ক সেই বিষয়টি তাঁর 'সোনার তরী' (১৩০০ বঙ্গাব্দ) কবিতায় তুলে ধরেছেন। 'সোনার তরী'[৪৮] কবিতাটিতে কৃষকদের মেঘ-বাদলার সময় বোট নিয়ে ধান কাটার বিষয়টি কবি সামাজিক প্রেক্ষাপটে ফুটিয়ে তুলেছেন। পূর্ববঙ্গে নদীর চরে যে ধান রোপণ করা হত তাকে বলা হত জলি ধান। নদীতে বন্যার ফলে জলস্তর বৃদ্ধি পেলে ধানগুলিও বেড়ে উঠত। এই ধানগুলি কাটার সময় হলে চাষিরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছোট বোট বা ডিঙি নৌকার মাধ্যমে সেই ফসল কেটে ঘরে তুলত। এইভাবে কবি মানুষের জীবনের থেকে তার কর্মের গুরুত্বকে অন্তর্নিহিত তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিফলিত করেছেন। যদিও এই তত্ত্বটি নিয়ে আধুনিককালের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার শেষ নেয়। তবে কবি ভাবনায় অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যাই থাকুক না কেন, পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবনের সঙ্গে নদীকেন্দ্রিক বোট বা

নৌকার যে ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল সেই বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রবি ঠাকুরের এই 'সোনার তরী' কবিতাটি ছাড়াও তাঁর 'জাপান যাত্রী' (১৯১৯)[৪৯] ভ্রমণ বৃত্তান্তটিতে জাহাজ সামুদ্রিক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে জাহাজকে সুরক্ষিত করার জন্য নাবিকদের কী যে কসরত করতে হত তার বর্ণনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)[৫০] গল্পে ফটিক মৃত্যুকালীন সময়ে কলকাতায় স্টিমার পথে আসা এবং এখানে খালাসিদের কাছি ফেলে জলের গভীরতা মাপার বিষয়টি অতল গভীরে মৃত্যুযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। স্টিমারের খালাসিদের কর্মসম্পাদনের সময় যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' (১৯১০)[৫১] উপন্যাসে। 'ওরা কাজ করে' (১৯৪১)[৫২], 'নৌকাডুবি' (১৯০৬)[৫৩] এছাড়া রবি ঠাকুরের আরও কিছু কবিতা ও লেখনীগুলিতে বাংলার নাবিকদের জীবনকেন্দ্রিক ভাবনাগুলি দর্শিত হয়েছে।

নাবিকদের নিয়ে বাংলার কবি এবং সাহিত্যিকদের লেখালেখির শেষ নেয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয় পর্ব, ১৯১৮)[৫৪] উপন্যাসে এক ডাক্তারকে খালাসিদের অত্যাচারে প্রতিবাদী হতে দেখা গিয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত'[৫৫] (১ম খন্ড) উপন্যাস, 'অভিযাত্রিক' (১৯৪০)[৫৬], স্মৃতি রেখা (১৯৪১)[৫৭], মরণের ডঙ্কা বাজে (১৯৪০)[৫৮], 'হীরামাণিক জ্বলে' (১৯৪৬)[৫৯], অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কোট্‌রা' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)[৬০], জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা কাব্যগ্রন্থের সাতটি তারার তিমির অংশে 'নাবিক'[৬১], এবং 'নাবিকী'[৬২] কবিতা, প্রমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামী বন্দর'[৬৩], 'জাহাজের ডাক'[৬৪] প্রভৃতি লেখনীগুলিতে বাংলার নাবিক জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'পরিব্রাজক'[৬৫] নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তে জাহাজের ইঞ্জিন রুমের কর্মী নাবিকদের আগুনের তাপে কষ্টকর জীবন সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলির দ্বন্দ্বমধুর অংশে 'নোনাজল' (১৯৫৩)[৬৬] গল্পে সমীরুদ্দীর, জাহাজের বয়লারে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের উপার্জিত অর্থ তার ভাইকে প্রেরণ করলে সেই অর্থ তাঁর ভাই কীভাবে অপব্যয় করেছিল সেই ঘটনা জাহাজের সারেংকে শুনিয়েছিল।

রূপদর্শী ছদ্মনামে লেখা 'রূপদর্শীর নক্‌শা' গ্রন্থটিতে বাংলার নাবিকরা কীভাবে প্রান্তিক গ্রাম বাংলা থেকে কলকাতা বন্দরে এসেছিল এবং বিভিন্ন ঘাটগুলিতে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে জাহাজের নাবিক হিসাবে যোগদান করেছিল সেই বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জাহাজ কর্মের ভিন্ন ভিন্ন পদগুলি এবং পদগুলিতে কী দায়িত্ব পালন করতে হয় সে সম্পর্কেও উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থে নাবিকদের সঙ্গে জাহাজের কী সম্পর্ক সেটি এক

নাবিকের কণ্ঠে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন 'জলের সাথে মাছের যেরূপ সম্পর্ক সেরূপ দরিয়ার সঙ্গে নাবিকদেরও একই সম্পর্ক'।[৬৭] এভাবে আমরা দেখতে পায় স্বদেশে পরিবার পরিজন ছেড়ে জাহাজে কষ্টকর জীবন থেকে অব্যাহতি চাইলেও জাহাজের টানে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নাবিকেরা এই কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেসকল গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন তার মধ্যে 'নদীপথে' (আষাঢ়, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), গ্রন্থটি ছিল অন্যতম। লেখক বাংলা এবং আসামের নদীতে স্টিমারে পরিভ্রমণ কালে নদী, যাত্রাপথ এবং এরই সঙ্গে বাংলার নাবিকদের অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে জীবনধারণ ও কর্মসম্পাদনের বিষয়টি খুব গভীরভাবে পরিলক্ষিত করেছিলেন। এই গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন নদীঘাট স্টেশনের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন জগন্নাথ ঘাট, গোয়ালন্দ ঘাট, চাঁদপুরি ঘাট, ফুলছড়ি ঘাট প্রভৃতি। আবার নদীতে চলচলরত বিভিন্ন স্টিমারগুলির কথা (যেমন মিঙ্গিন, গুর্খা, দোয়ারি, মূলতানি) এই গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি। অভ্যন্তরীণ নদীকেন্দ্রিক এই স্টিমারগুলিতে বাংলার নাবিকদের সঙ্গে উচ্চপদস্থ সারেং, মাস্টার, মেট্স এবং ড্রাইভারদের কাজকর্ম করতে দেখা গিয়েছিল। এই সকল কর্মীরা ঔপনিবেশিক বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে শোষিত এবং বর্ণগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। নোয়াখালীর এক সারেং যার স্টিমারে ২৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও তার মাইনে ১৮০ টাকা ছিল। এই সারেং তার মাইনে কম হওয়ার একমাত্র কারণ হিসাবে তার গায়ের চামড়া এবং জাতি স্বত্বাকেই দায়ি করেছে। তার কথা মতো চামড়ার রং কালো হওয়ার কারণে তার বেতনের পরিমাণ ছিল এতো কম তবে চামড়া সাদা হলে ১৮০ টাকার পরিবর্তে বেতনের পরিমাণ হত ৫০০ টাকা।[৬৮] স্টিমারের খালাসি এবং কর্মীরা জাহাজে কাজের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় রীতিনীতিগুলি জাহাজের মধ্যেই পালন করত। এই জাহাজের খালাসিরা সমস্ত দিন উপবাসে থেকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার পর সূর্যাস্ত গেলে একসঙ্গে নামাজ পড়ত এবং রোজার সময় এক থালায় দু-তিনজন করে খাওয়া-দাওয়া করত।[৬৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী সময়ে সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক সাহিত্যিক হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, জীবনী ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থগুলি সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। বাংলার নাবিকদের নিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সারেঙ' (১৩৫৪)[৭০] গল্পটিতে নাসিম চরিত্রের একটি কৃষক ছেলে পরিবার থেকে অবহেলিত হয়ে স্টিমারের কাজে যোগ দিয়েছিল। নাসিম কেবলমাত্র অন্নের

বিনিময়ে দীর্ঘদিন সারেঙয়ের ফাইফরমাশ করার পর সিঁড়ি ফেলার হুকুম পেয়েছিল। এই জাহাজের কাজে পদোন্নতি হওয়া যে কষ্টকর বিষয় তা লেখক এই গল্পটিতে নাসিম চরিত্রের মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সুন্দরবনের চিঠি' ছোটদের নিয়ে লেখা গল্পটিতে লেখক কলকাতা থেকে ছেড়ে যাওয়া স্টিমারগুলি সুন্দরবনের ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কীভাবে যাত্রা করত তার বিবরণ দিয়েছেন। এই গল্পে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল যেখানে ঘন জঙ্গল, সরু চ্যানেল পথ, এরই সঙ্গে বাঘ, কুমির এবং আরও কিছু হিংস্র জন্তুর সম্পর্কে জানা যায়। বনের সরু চ্যানেল পথে জলযানগুলিকে যাত্রা করার সময় এই বন্য জন্তুগুলির আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সতর্কতা নিয়ে চলাচল করতে হত। এই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জলযানগুলিকে নিরাপদে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নাবিক লস্করদের সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। যাত্রাকালে বাংলার বিভিন্ন ছোট বড়ো নদীঘাট স্টেশনের কথা জানা গেছে যেখানে স্টিমার এবং ফ্ল্যাটগুলিকে নোঙর করতে দেখা গিয়েছিল। এখানে জনার্দন, কৃষ্ণা প্রভৃতি স্টিমারের কথা জানতে পারি এর মধ্যে জনার্দন স্টিমারটি ছিল R. S. N. কোম্পানির। এই জলযানগুলিতে কর্মরত খালাসিরা পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান থেকে এসেছিল। বাংলার নাবিকদের নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সুন্দরবনের চিঠি' গ্রন্থে স্টিমার ভ্রমণের বিষয়টি লেখক স্মৃতিচারণায় সামাজিক প্রেক্ষাপটে নাবিকদের জীবনকে বহুলাংশে প্রতিফলিত করেছিল।[৭১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন বিরল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর নানাধরনের ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলি সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলার নদী, বন্দর এবং নদীতে চলাচলরত জলযানগুলিকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষের জীবন জীবিকা নির্ধারিত হয়েছিল। এই বিষয়টি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিমির-তীর্থ' (১৯৪৪)[৭২] উপন্যাস এবং 'ভাঙা বন্দর' (১৯৪৫)[৭৩] গল্পে ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বন্দরের সঙ্গে নাবিকের যে সম্পর্ক ও বন্দরকে কেন্দ্র করে জাহাজের আসা-যাওয়া এবং এরই সঙ্গে বন্দরের উপর নির্ভর করে বহু ছোট বড় ব্যবসায়িক পরিকাঠামোয় শিল্পের উদ্ভাবন, এভাবেই শহর কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার বিকাশ ঘটেছিল যার উল্লেখ পাওয়া যায় 'ভাঙা বন্দর' ছোট গল্পে। এর পাশাপাশি ঝালকাঠি বন্দরটির অবক্ষয় এবং ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়ার বিষয়টি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'ভাঙা বন্দর' ছোট গল্পে ফুটিয়ে

তুলেছেন। এই গ্রন্থ থেকে আরও জানতে পারা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ঔপনিবেশিক শোষণ এতটাই তীব্র ছিল যে ঝালকাঠির তেলমিলগুলি প্রায় বন্ধ হতে চলেছিল। এরফলে এই বন্দরের যে জৌলুস ছিল তা ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। ফ্ল্যাট ভর্তি মাল এসে নোঙর করত বিখ্যাত চীনেবাজারে, সেই চীনেবাজার সুনন্দা নদীগর্ভে চলে গিয়েছিল। এখানে যে দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকার সুপুরির ব্যবসা চলত তার লেশমাত্র আর দেখা যায় না। রাতের অন্ধকারে যে সকল বোটগুলি জোনাকি পোকার মতো ঝলমল করত সেগুলিও আর দেখা যেত না।[৭৪] এই বন্দরকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের জীবন জীবিকার যে ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল সেটি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শিকার হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

বাংলার নাবিকদের নিয়ে কবি এবং সাহিত্যিকদের লেখনীগুলি বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছিল। বাংলার কবি এবং সাহিত্যিকগণের লেখাগুলি শুধুমাত্র বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন গাছ-পালা, বনজঙ্গল, নদী-নালা, খাল-বিল এবং পুকুর-পুষ্করিণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তার পাশাপাশি এই প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রগুলি বাংলার মানবজীবনে কতটা গুরুত্ব এনেছিল সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীগুলিতে নদীর রূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে নদীর সাথে সম্পর্কিত মানুষের জীবন ও জীবিকার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে বাংলার নাবিকদের উপর পুঁজি শোষণ, শ্রেণীবৈষম্য এবং সামাজিক অসংগতির বিষয়টি সাহিত্যে মার্কসীয় চেতনার সংকলন ঘটিয়েছিল। ঔপনিবেশিক সময়কালে নদীকে কেন্দ্র করে বাংলার নাবিকদের অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে কর্মযোগ এবং তাদের সংগ্রামী জীবনের কথাগুলি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

১.৫. উপসংহার:

ঔপনিবেশিক বাংলার অভ্যন্তরীণ নদীকেন্দ্রিক জলযানগুলিকে কেন্দ্র করে বাংলার নাবিকদের সংগ্রামের ইতিহাসটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করেছিল। বাংলার অভ্যন্তরে নদ-নদীগুলি জালিকার ন্যায় বিছিয়ে থাকার জন্য জলপথে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ এবং সম্প্রসারণ ঘটেছিল। বাংলার নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য আদিকাল থেকে ছোট বড় ডিঙি, পান্‌সি নৌকার মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল তা চাঁদ সওদাগরের কাহিনী অবলম্বনে 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে এই জলযানগুলিকে বাংলার নদীবেষ্টিত অঞ্চলের অধিবাসীরা

ঔপনিবেশিক সময়কালেও নিজস্ব যাত্রা পরিবহণ এবং মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করত। তবে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর এই জলযানগুলির প্রচলন ছিল খুবই কম কারণ এগুলি ভারী পণ্য বহনে সক্ষম ছিল না। এসময় ইউরোপীয় এবং অন্যান্য বিদেশী কোম্পানির দ্বারা নির্মিত স্টিম ভেসেল, স্টিমার প্রভৃতি জলযানগুলি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছিল। এই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নদী এবং উপকূলবর্তী অংশে চলচলরত জলযানগুলিতে প্রচুর শ্রম চাহিদা দেখা গিয়েছিল। এখানে যে শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছিল এদের অধিকাংশই ছিল বাংলার খালাসি ক্রু নাবিক, এ সকল নাবিক পূর্ববঙ্গের মুসলিম পরিবার থেকে এসেছিল। যদিও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু পরিবারের মাঝি বা মাল্লাদের এই জলযানের কাজে নিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি ছিল তাদের স্বেচ্ছাধীন, তবে এদের পূর্ববঙ্গের খালাসি নাবিকদের ন্যায় এই জলযানের কাজে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সেরকম আগ্রহ দেখা যায়নি।

ঔপনিবেশিক বাংলায় ইউরোপীয় জয়েন্ট কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত I. G. N. & R., R. S. N. প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ জলযানগুলি মূলত নদীপথ ও উপকূলবর্তী বাণিজ্যে পণ্য পরিবহণ, যাত্রী পরিবহণ এবং ফেরী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এখানে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, ঢাকা এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা এবং কিছু নদীকেন্দ্রিক জেলার অধিবাসী যারা বংশ পরম্পরায় নিজেদের জাহাজের কাজে নিয়োজিত রেখেছিল, এসকল মুসলিম সম্প্রদায়ের অগণিত খালাসি নাবিকেরা এই অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল। বাংলার এই নাবিক শ্রমিকেরা জয়েন্ট কোম্পানির দ্বারা প্রতারিত হয়ে শোষিত হয়েছিল। এজন্য বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর এরা ইউনিয়নের সহায়তা নিয়ে তাদের অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে দাবিগুলি উত্থাপিত করেছিল। নাবিকদের এই দাবিগুলি কোম্পানি না মানতে চাইলে বাংলার বিভিন্ন নদীঘাট স্টেশনগুলিতে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ধর্মঘট দেখা গিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ জলযানে কর্মরত নাবিকেরা দীর্ঘদিন কষ্টকর পরিশ্রম করে ধাপে ধাপে তাদের পদোন্নতি ঘটিয়ে সারেং, মেট্স, মাস্টার এবং ড্রাইভার হিসাবে কর্মসম্পাদন করত। ক্রু নাবিকদের সঙ্গে এই সারেং, মাস্টার এবং ড্রাইভারদেরও ইউরোপীয় কোম্পানির কর্মচারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে দেখা গিয়েছিল। এই সকল কর্মীদের নানা অজুহাতে ছাঁটাই, জরিমানা, বেতন কর্তন প্রভৃতি অসংগতিপূর্ণ বিষয়গুলি দেখা দিলে বাংলার সীমেন্স ইউনিয়নগুলি স্টিমার কোম্পানির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা নিয়েছিল। *ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU)* এবং *বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নটি* অভ্যন্তরীণ জলযানে কর্মরত নাবিকদের স্বার্থে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

শ্রম ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার নাবিকদের নিয়ে কবি এবং সাহিত্যিকদের চেতনাশীল ভাবনাগুলি সাহিত্যে ফুটে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শ্রমিকদের উপর যে শোষণ প্রক্রিয়া চলেছিল সেখানে বাংলার নাবিকেরা শ্রমিক হিসাবে নিজেদের কীভাবে সম্পর্কিত করেছিল সে বিষয়টি সাহিত্যে গল্প, উপন্যাস এবং কবিতায় পরিস্ফুটিত হয়েছিল।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১। বিপ্রদাস পিপলাই -এর লেখা 'মনসামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে চাঁদসদাগর তার মধুকর ডিঙ্গা নিয়ে বাংলার নদীপথ ধরে সমুদ্রে নেমেছিলেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। এই ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থের লেখাটি রূপকথার হলেও ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, ভাটপাড়া, ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটি, রিষড়া, খড়দহ, কোন্নগর, বেতড়, কালীঘাট, বারুইপুর এবং গঙ্গাসাগর এই সকল উল্লেখিত হুগলী নদী তীরবর্তী স্থানগুলির সঙ্গে ঔপনিবেশিক বাংলার হুগলী নদীর চিহ্নিত স্থানগুলির অবস্থানগত অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। কাব্যগ্রন্থে লেখকের নদীপথের বর্ণনা আশ্চর্যজনকভাবে ভ্যান ডেন ব্রুকের মানচিত্রে উল্লেখিত নদীপথগুলির নির্দেশনার সঙ্গে সঠিক ইঙ্গিত বহন করে। Nilmani Mukherjee, *The Port of Calcutta, A Short History,* Calcutta, The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968, p. 3.

২। নৌকার ব্যবহার, নৌ-বন্দর, নৌ-ঘাট, নৌবাণিজ্য, নৌদণ্ডক প্রভৃতি শব্দগুলি বাংলায় জলপথে ব্যবসা–বাণিজ্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। তৎকালীন সময়ে বাংলায় বসবাসকারী অধিবাসীরা জলপথে ভেলা, ডিঙ্গা এবং নৌকার মাধ্যমে প্রায়শই যাতায়াত করত। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৫২।

৩। Rajat Kanta Roy (ed.), *Entrepreneurship and Industry in India, 1800-1947*, Amiya Kumar Bagchi, *European and Indian Entrepreneurship in India*, Calcutta, Oxford University Press, 1994, pp. 164-165.

৪। Nilmani Mukherjee, *The Port of Calcutta, A Short History,* Calcutta, The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968, pp. 2-3.

৫। Banerjee, P., *Calcutta and its Hinterland: A Study in Economic History of India, 1833-1900,* Calcutta, Progressive Publishers, 1975, pp. 24-30.

৬। File No. ADMN- 6841/1/I Bundle No. 74PT-5, 1941, Hooghly River Shipping Gazettee, KPT Library.

৭। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেবাজিয়াদের জীবন নৌকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল। এরা ধর্মে মুসলিম হলেও ধর্মের রীতিনীতির মধ্য থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিল। নদীতে মাছধরা, মদ খাওয়া, গ্রাম বাংলার পল্লীতে ভানুমতীর খেল দেখিয়ে এবং টোটকা ওষুধ বিক্রি

করে এরা জীবনধারণ করত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *তিমির-তীর্থ,* কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ফাল্গুন, ১৩৫৫, পৃ. ১১২।

৮। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History & Developments 1908 – 1924,* Calcutta, Publication date not known, p. App. – VII. XXXII. বাংলার নাবিকদের জাহাজ কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেই বিষয়গুলি নথিবদ্ধ রাখা হয়েছিল এবং তাদের জাহাজ কাজে যোগদানের সময় বিভিন্নপ্রকার কর্মদক্ষতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা নিরূপণ করে নিয়োজিত করা হয়েছিল। ১০,৪০০০ সংখ্যার অধিক নাবিককে জাহাজে কর্ম সুনিশ্চিত করে শংসাপত্র প্রদানের মধ্যদিয়ে শিপিং অফিসের মধ্যে তাদের নাম নথিভুক্ত রাখা হয়েছিল। রূপদর্শী, *রূপদর্শীর নক্‌শা,* মিত্রালয়, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ. ১৭। এই 'রূপদর্শীর নক্‌শা' গ্রন্থে কলকাতা বন্দরে বিভিন্ন ঘাটগুলিতে বাংলার নাবিকদের জাহাজে কাজের জন্য ভিড় জমাতে দেখা গিয়েছিল এবং এদের মধ্যে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের Continues discharge certificate প্রদান করা হয়েছিল।

৯। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বাল্যকালে স্কুল এবং বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করার জন্য নদীপথে বোট এবং স্টিমারের মাধ্যমেই যাতায়াত করত কারণ সন্দ্বীপের চারিপাশ জল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। নদীপথে নিত্যদিন চলাফেরা করার জন্য নাবিকদের কর্মজীবনটি জলপথে কীভাবে পরিচালিত হত তা তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। সন্দ্বীপের অধিবাসীদের তেমন কিছু জীবিকা না থাকার জন্য তারা দ্বীপ সাগরে গিয়ে বোট বা নৌকার কাজে যোগ দিয়েছিল। এই বিষয়গুলি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত এলাকার অধিবাসীরা প্রধান জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়ে জলযানগুলির উপর নির্ভরশীল হয়েই কর্মজীবন তৈরি করেছিল। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টী,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৬০, পৃ. ২৩।

১০। L. S. S. O'malley, *Bengal District Gazetteers, 24-Parganas*, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, 1914, p. 158.

১১। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *সুন্দরবনের চিঠি (৪ নং চিঠি, ২রা কার্তিক, ১৩৪৭),* কলকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩, পৃ. ২১। এই গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন ছোট বড় নদী নালা দ্বারা আবৃত সুন্দরবনের ঘন জঙ্গলে বসবাসকারী হিংস্র পশু এবং জলের মধ্যে কুমিরের কথা উল্লেখ করেছেন। এই নদীগুলিতে জোয়ার ভাটার ভয়ঙ্কর ঢেউ বড় নৌকাও ডুবিয়ে ফেলে। এই

প্রতিকূল অবস্থার বিষয়টি বোট স্টিমারে কর্মরত বাংলার নাবিকদের জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১২। L. S. S. O'malley and Monmohan Chakravarty, *Bengal District Gazetteers, Howrah,* Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1909, p. 124.

১৩। The Annual Reports by Port Officers, Calcutta and Chittagong, for the year 1923-24, Government of Bengal, Marine Department, Calcutta, March 1923, KPT Library.

১৪। L. S. S. O'malley and Monmohan Chakravarty, *Bengal District Gazetteers,* Howrah, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1909, p. 124.

১৫। শঙ্কু মহারাজ, *গঙ্গাসাগর,* অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৬৭, পৃ. ৬-৭।

১৬। L. S. S. O'malley, *Bengal District Gazetteers, Khulna,* The Bengal Secretariat Book Depot, 1908, pp. 131-132.

১৭। File No. ADMN- 6648 Bundle No. 54PT-30, 1921, Conserveny of the embayment South of the Rangoon Passengers Shed, KPT Library.

১৮। Barun de, *'The History of Kolkata Port and The Hooghly River and its Future', Kolkata Port Trust Lecture*, Kolkata, 2005.

বরুণ দে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৩৫ তম বার্ষিক অধিবেশনে কলকাতা পোর্টের ইতিহাস নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত সভাতে হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে নদীপথে বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি রপ্তানির বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেছিলেন। এখানে জেটি ও বন্দর শ্রমিকদের দ্বারা স্টিমশিপগুলিতে মালপত্র উঠানো নামানো হত। ঔপনিবেশিক বাংলায় হুগলী নদীর তীরে কলকাতা বন্দর এবং জেটি শ্রমিকদের পাশাপাশি নদীপথে চলাচলরত দেশীয় বাণিজ্যে ব্যবহৃত স্টিম বোটগুলিতে নাবিকদের কর্মসম্পাদনের বিষয়টিও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই উক্ত ভাষণটি http://kolkataporttrust.gov.in/kopt_lecture2005.pdf এই ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

১৯। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908-1924,* Calcutta, Publication date not known, pp. App. – X, LXVI, LXVII, LXVIII.

২০। WBSA. Commerce and Labour – Marine Dept. File No. 4s – 32 of 1938 Proceeding 55 to 59.

২১। WBSA. Commerce and Labour – Marine Dept. File No. 4s – 32 of 1938 Proceeding 55 to 59.

২২। WBSA. Commerce and Labour – Marine Dept. File No. 4s – 32 of 1938 Proceeding 55 to 59.

২৩। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908-1924,* Calcutta, Publication date not known, p. 75.

২৪। IB 614-27 (99/1927)

২৫। IB 614-27 (99/1927)

২৬। IB 614-27 (99/1927)

২৭। IB 614-27 (99/1927)

২৮। IB 614-27 (99/1927)

২৯। IB 614-27 (99/1927)

৩০। File No. ADMN- 6641/1, Bundle No. 54PT-13, 1921, International labour Conference, KPT Library.

৩১। File No. ADMN- 6641/1, Bundle No. 54PT-13, 1921, International labour Conference, KPT Library.

৩২। File No. ADMN- 6641/1, Bundle No. 54PT-13, 1921, International labour Conference, KPT Library.

৩৩। File No. ADMN- 6641/1, Bundle No. 54PT-13, 1921, International labour Conference, KPT Library.

৩৪। IB 614-27 (99/1927)

৩৫। IB 614-27 (99/1927)

৩৬। IB 614-27 (99/1927)

৩৭। IB 614-27 (99/1927)

৩৮। IB 614-27 (99/1927)

৩৯। Rajat Roy, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure groups and conflict of interests in Calcutta City Politics, 1875-1939,* Vikas publishing house Pvt LTD, Calcutta, 1979, p. 91.

৪০। IB 614-27 (99/1927)

৪১। IB 614-27 (99/1927)

৪২। IB 614-27 (99/1927)

৪৩। IB 614-27 (99/1927)

৪৪। IB 614-27 (99/1927)

৪৫। IB 614-27 (99/1927)

৪৬। আজাদ, ১লা আগস্ট, ১৯৪৬।

৪৭। কাজী নজরুল ইসলাম, *সাম্যবাদী, কুলি-মজুর,* প্রকাশকাল ১৩৩২ বঙ্গাব্দ/১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৯৪।

৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সোনার তরী, সোনার তরী (ফাল্গুন, ১২৯৮)* কলকাতা, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩০০ বঙ্গাব্দ/১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ, অন্তিম প্রকাশ ১৪১৯, পৃ. ১৭১।

৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপান-যাত্রী,* বীরভূম, শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রকাশ শ্রাবণ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ/১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭।

৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ, ছুটি (পৌষ, ১২৯৯),* কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০২।

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা,* ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ/১৯১০ খ্রিস্টাব্দ, শেষ প্রকাশ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২০১২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬৪।

৫২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা,* বিশ্বভারতী, বীরভূম, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ/১৯৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দ, শেষ প্রকাশ ১৯৬২ বঙ্গাব্দ/১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৮২৯-৮৩০।

৫৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৌকাডুবি,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯০৬, পৃ. ১০১-১০২।

৫৪। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব,* কলকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পাবলিকেশন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ/১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৩-৪৫।

৫৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অপু পথের পাঁচালী অপরাজিত, প্রথম খন্ড,* কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, প্রকাশ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ/১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০৩-২০৫।

৫৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অভিযাত্রিক,* কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ/১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৪।

৫৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতির রেখা,* কলকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রকাশ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ/১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬৪-৬৫।

৫৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মরণের ডঙ্কা বাজে,* কলকাতা, বি. এন. পাবলিশিং হাউস, ১৯৪০।

৫৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রমাঞ্চকর উপন্যাস, হীরা মানিক জ্বলে,* কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৪৬।

৬০। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *অবনীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, (কোট্‌রা),* কলকাতা, প্রকাশ ভবন, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৬/১৯৭৯, তৃতীয় প্রকাশ ১৪১০/২০০৩, পৃ. ২২৬-২২৮।

৬১। জীবনানন্দ দাশ, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, (সাতটি তারার তিমির, নাবিক, নাবিকী),* কলকাতা, নাভানা, ১৯৫৪, পৃ. ৮৮।

৬২। *তদেব,* পৃ. ৯৪-৯৫।

৬৩। প্রেমেন্দ্র মিত্র, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা, (বেনামী বন্দর),* কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ/১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫-৭।

৬৪। প্রেমেন্দ্র মিত্র, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা, (জাহাজের ডাক),* কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ/১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬০-৬১।

৬৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *পরিব্রাজক,* কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ/১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৬-৪৭।

৬৬। সৈয়দ মুজতবা আলী ও রঞ্জন মজুমদার, *দ্বন্দ্ব মধুর,* সৈয়দ মুজতবা আলী, *নোনাজল,* কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ/১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩-৪।

৬৭। রূপদর্শী, *রূপদর্শীর নক্‌শা,* কলকাতা, মিত্রালয়, ১৯৫২, পৃ. ১৮-১৯।

৬৮। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *নদীপথে,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ কাল ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ/১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৩।

৬৯। *তদেব,* পৃ. ১৮।

৭০। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *সারেঙ,* কলকাতা, দিগন্ত পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ/১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬-১৭

৭১। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *সুন্দরবনের চিঠি, ৪ নং চিঠি (৩রা কার্তিক, ১৩৪৭),* কলিকাতা, বিদ্যালয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ/১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৬-২৭।

৭২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *তিমির-তীর্থ,* কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রকাশ ১৩৫১ বঙ্গাব্দ/১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের পড়ে থাকা লেখাটি কবিবন্ধু গোপাল ভৌমিক উদ্ধার করে 'শারদীয়া দৈনিক কৃষক' (১৩৫১ বঙ্গাব্দে/১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত করেছিলেন। আবার কথাশিল্পী মনোজ বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্মূল্য বাজারেও বইটিকে সৌন্দর্যময় করে প্রকাশিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

৭৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *ভাঙা বন্দর,* কলকাতা, কমলা পালিশিং হাউস, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। এই গ্রন্থটি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। 'আনন্দ বাজার', 'যুগান্তর', 'বসুমতী', 'শনিবারের চিঠি' 'অলকা' প্রভৃতি পত্রিকায় এর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

৭৪। *তদেব,* পৃ. ১, ১৬, ১৭।

উপসংহার

বিংশ শতকের মধ্যভাগের পর শ্রমিক ইতিহাস নিয়ে যে গবেষণার ভিন্ন ভিন্ন কাজগুলি বিভিন্ন গবেষক ও ইতিহাসবিদগণের দ্বারা আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে তার সূত্রধরে শ্রমিক ইতিহাস চর্চা নতুন কাজের দিশা দেখিয়েছে যা নতুন প্রজন্মের গবেষকদের অনুসন্ধানের এক ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবেই ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলার পাট, বস্ত্র, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, চা-বাগিচা, কয়লা প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প ও কর্ম ক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ইতিহাসের গবেষণা কাজগুলির মধ্যদিয়ে এই গবেষণা চর্চা অভিনব তত্ত্বের দ্বারা পরিবেশিত হওয়ার উন্মুক্ত পরিসর পেয়েছে। আবার এই শিল্পক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্র করে বাংলায় ঔপনিবেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি কলকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যদিয়ে জলপথে চলাচলকারী জলযানগুলিতে বিপুল সংখ্যক নিয়োজিত শ্রমিকদের অবস্থানটি সূচিত করে শ্রমিক ইতিহাসে একটি নতুন গবেষণার দিক উন্মোচিত করেছে। বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই সকল শ্রমিক তথা নাবিকদের কর্মজীবন ও তাদের ঔপনিবেশিক শাসনে পুঁজি শোষণ বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস আমার গবেষণায় উন্মুক্ততার দাবি রাখে।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক শোষণের ভিত্তি স্থাপন ১৭৫৭ সালে বাংলায় পলাশী যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ঘটলেও এর যত দিন গড়িয়েছে ঔপনিবেশিক শোষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়েছে। যেমন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথমিক পর্বে কৃষি অর্থনীতির উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক শোষণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল যার ফলে ঊনবিংশ শতকে বিভিন্ন কৃষক, আদিবাসী বিদ্রোহগুলি সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। আবার ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ভারতে শিল্পায়নের রূপ নিলে শোষণের ক্ষেত্রটি বিভিন্ন শিল্প এবং কল-কারখানার শ্রমিকদের উপর আরোপিত হতে শুরু করে এবং এই শিল্প ও কল-কারখানাগুলিকে কেন্দ্র করে পুঁজি শোষণের উত্থানে ইউরোপীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী বা এজেন্সিগুলি শিল্প অর্থনীতিতে প্রভাব খাটিয়ে ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্প অর্থনীতির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বদা একটি নিগূঢ় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় থাকায়

ঔপনিবেশিক বাংলায় এই বিদেশী পুঁজির দ্বারা শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানি ও শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি হওয়ার মধ্যদিয়ে বাংলার ঔপনিবেশিক বাজার অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রটি হুগলী নদীপথের মাধ্যমে অন্তর্দেশীয় এবং বহির্দেশীয় বাণিজ্যে পরিচালিত হত। এই বাণিজ্যের উন্মুক্ত পথ হিসাবে কলকাতা বন্দরের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কলকাতা বন্দরের ভৌগলিক অনুকূল অবস্থান এবং ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী শহর (১৯১১ সাল পর্যন্ত) হিসাবে জায়গা করে নেওয়ায় ফলে ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট গঠন কলকাতা বন্দর পরিকাঠামোয় আধুনিকীকরণের মধ্যদিয়ে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় শিল্প অর্থনীতিতে যেরূপ বিদেশী পুঁজি গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার ছিল সেরূপ জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটিও বিদেশী শিপিং কোম্পানিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা গিয়েছিল। ব্রিটিশদের এই সাম্রাজ্যবাদী শাসনে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদেশী এই পুঁজি গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ঔপনিবেশিক শোষণের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল। এই বিষয়টি অমিয় কুমার বাগচী তাঁর *Private Investment in India 1900-1939* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।[১]

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের অবস্থানটি চোখে পড়ার মতো লক্ষণীয় ছিল। এখানে যোগদানকারী অধিকাংশ নাবিক পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) বিভিন্ন জেলাগুলির মুসলিম পরিবার থেকে এসেছিল। বাংলার নাবিকদের এই কর্মস্থলে আসার বিষয়টিতে তাদের জাতিসত্তায় বংশগত কর্মপটুতার ছাপ ধরা পড়ে। যদিও কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল সহ বাংলার (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) অন্যান্য জেলা থেকে নাবিকদের আত্মীয়তার সূত্রে জাহাজের কাজে কর্মসম্পাদন করতে দেখা গিয়েছিল। আমার গবেষণায় বাংলার এইসকল নাবিকদের কর্মজীবন এবং সংগ্রামের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উৎপীড়ন এবং অবকাঠামো মূলক শাসন ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত হওয়ার দিকটি ঔপনিবেশিক শাসনের একটি দীর্ঘ সময়কাল যাবৎ নির্লিপ্ত ছিল। তবে ১৮৯০ -এর দশকে কলকাতা শহরতলির মুসলিম জনগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রথম সংগঠিত হওয়ার প্রয়াস সীমেন্স ক্লাব গঠনের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল।[২] এরপর বিংশ শতকের প্রথম দশকে ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান নামক একটি অস্থায়ী সীমেন্স ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল যেটি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন নাম পরিবর্তন করে নানা বাধা বিপত্তি

কাটিয়ে ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) রূপে গড়ে উঠেছিল। ISU এবং পরবর্তীতে বাংলায় গড়ে ওঠা আরও কিছু সীমেন্স ইউনিয়নগুলি বাংলার নাবিকদের সংঘবদ্ধ করে নাবিক স্বার্থে ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এভাবে ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের সংগঠিত শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভের চিত্রটি আমার গবেষণায় প্রতিফলিত করা হয়েছে।

বাংলায় সীমেন্স ইউনিয়ন গঠনের সঙ্গে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাংলার নাবিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উপর চাপানো যুদ্ধের বিপুল অর্থনৈতিক ব্যয়ভার নাবিকদের উপযুক্ত বেতন এবং অন্যান্য কর্মকালীন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গুলি থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। এরপর ১৯১৯ সালে ILO প্রতিষ্ঠা লাভের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে আমূল পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ঔপনিবেশিক ভারতে ১৯২০ সালে AITUC প্রতিষ্ঠা পরবর্তী দিনগুলিতে বাংলার নাবিকদের সংঘবদ্ধ করেছিল। বাংলার নাবিকদের এই সংঘবদ্ধ হওয়ার রূপটি তাদের যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা, ক্ষতিপূরণ, ঘাট সারেংদের অবৈধ অর্থ আত্মসাৎ, স্বল্প বেতন হার প্রভৃতি নাবিক জীবনে আরোপিত অবকাঠামো গুলি সম্পর্কে সচেতন করেছিল। আবার ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলার নাবিকদের অবস্থাটি ছিল খুবই ভয়ঙ্কর। কর্মজীবনে নিরাপত্তা জনিত বিঘ্নতা এবং মাত্রাতিরিক্ত ঔপনিবেশিক শোষণের চাপ নাবিকদের সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত করেছিল। তাদের এই কর্মজীবনে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে জাতিগত ভেদাভেদ এবং বর্ণগত বৈষম্যতা ইউরোপীয় এবং বাংলার দেশীয় নাবিকদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন ঘটিয়েছিল। এই বিষয়গুলি বাংলার নাবিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে দিশা দেখিয়েছিল একইভাবে সভা-সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন এবং ধর্মঘট সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সূচিত করেছিল।

আমার এই গবেষণাটিতে বাংলার নাবিকদের বহির্দেশীয় অভিবাসনের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। চুক্তি ভঙ্গ করে জাহাজ থেকে পালিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশের উন্নত দেশগুলিতে বাংলার নাবিকেরা ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা গ্রহণ করে জীবনধারণ করেছিল। এই অভিবাসী

নাবিকেরা বহির্দেশে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেখানে তাদের নাগরিকত্ব লাভের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পেরেছিল। বাংলার নাবিকদের বহির্দেশীয় অভিবাসন গ্রহণের দিকটি ঔপনিবেশিক শোষণ এবং জাহাজ কর্মে আরোপিত কঠোর আইনগুলি থেকে মুক্তিলাভের জন্য মূল পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলার অভিবাসী নাবিকদের প্রসঙ্গটি আনতে গেলে দেখা যায় বাংলার অভ্যন্তরীণ জলযানের সূত্রধরে বহির্দেশীয় সমুদ্রগামী জাহাজের সঙ্গে নাবিকদের কর্মযোগের বিষয়টি ক্ষুদ্র স্তরীয় স্থানান্তর থেকে বৃহদায়তন স্থানান্তরের জায়গায় পরিণত হয়েছিল। নাবিকদের নিত্য নৈমিত্তিক নদীকেন্দ্রিক জীবনের কথাগুলি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* এই জীবনী মূলক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।[৩] আবার বাংলার এই নাবিকদের নিয়ে কবি এবং সাহিত্যিকদের সাহিত্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখালেখি গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। এই সকল স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের নাবিক সম্পর্কিত লেখনীগুলির মাধ্যমে সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলার নাবিকদের জীবন সংগ্রামের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকদের নিয়ে আমার গবেষণা বিষয়টিতে নাবিকদের কর্মজীবন ও সংগ্রামের বিভিন্ন দিকগুলি আলোকপাত করা হয়েছে যেটি ১৯২০ সাল থেকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটার সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় বাংলার নাবিকদের কর্মজীবনে বিভিন্নপ্রকার অবকাঠামোর মধ্যে ঔপনিবেশিক পুঁজি শোষণে শ্রেণী কাঠামোয় নাবিকদের অবস্থানটি তুলে ধরা হয়েছে। তবে ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তী সময়ে বাংলার নাবিকদের অবস্থানটি কেমন ছিল তা আমার গবেষণায় প্রশ্ন রাখে।[৪] তারা কি ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করতে পেরেছিল? আর তারা যদি স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করতেই পারে তবে সেখানে পুঁজির অবস্থানটিই বা কিরূপ ছিল? আবার অন্যদিক জাহাজের কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে বসবাসরত বাংলার নাবিকদের উৎশৃঙ্খল জীবনের চিত্রটি মিন্নির *Night life of Calcutta* গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়।[৫] যেখানে তাদের অবাধ মদ্যপান ও নারীসঙ্গ জনিত কারণে বিভিন্নধরনের যৌন রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গিয়েছিল এই বিষয়টিতে ঔপনিবেশিক সরকার তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সচেতনতায় কি ভূমিকা নিয়েছিল তা আমার গবেষণার ক্ষেত্রটিতে প্রশ্ন জাগায়। এই বিষয়গুলি

আমার গবেষণার সূত্রধরে পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার নাবিকদের নিয়ে নতুন গবেষণা ভাবনার দিকগুলি চিহ্নিত করবে।

এই গবেষণার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর বাংলায় হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে যে শিল্প এবং কল-কারখানা গড়ে উঠেছিলে তার মূলে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই বন্দরকে কেন্দ্র করে যে ঔপনিবেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠিত হয়েছিল সেখানে বন্দর থেকে চলাচলরত জাহাজগুলিতে কর্মসম্পাদনে বাংলার নাবিকদের অবস্থানটি ছিল লক্ষণীয়। এসকল নাবিকেরা মূলত বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলির (নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, কলকাতা প্রভৃতি) মুসলিম পরিবার থেকে এসেছিল, তবে এখানে জাহাজের কাজে বংশগত কর্মসূত্রে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের নাবিকদেরও চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলার এই নাবিকেরা জাহাজে 'লস্কর', 'খালাসি', 'সুখানী' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। তবে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মরত বাংলার অধিকাংশ নাবিকেরাই 'লস্কর' হিসাবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিল। এখানে 'লস্কর' শব্দের বিভিন্ন অপভ্রংশগুলি বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকদের 'লস্কর' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাহাজ কর্মে এই নাবিকদের নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল প্রকৃতির ঘাট-সারেংদের প্রভাব ছিল। এরা নাবিকদের জাহাজে কাজ পাইয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ঘুষ হিসাবে মোটা অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করত, এছাড়া কর্মকালীন দাদন হিসাবে অন্যান্য অর্থ গ্রহণ করে নাবিকদের শোষণ করেছিল। বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শিপিং কোম্পানিগুলি আহত ও নিহত অথবা নিরুদ্দেশ হওয়া নাবিকদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ক্ষতিপূরণের জন্য কোনোপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ঔপনিবেশিক শাসনকালে জাহাজে কর্মরত বাংলার এই নাবিকেরা ইউরোপীয় নাবিকদের দ্বারা জাতি বর্ণগত বৈষম্যের শিকার হয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিল।

এই বিষয়গুলি বাংলার নাবিকদের সংগঠিত করে তোলার ক্ষেত্রে একটি দিক উন্মোচিত করেছিল। ১৯১৯ সালে ILO এবং ১৯২০ সালে AITUC –এর প্রতিষ্ঠালাভ হওয়ার যুগান্তকারী ঘটনা দুটি বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। আবার এসময় ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি

শ্রমিকদের এক ছত্রতলে নিয়ে এসেছিল। ১৯২০ সালের পর বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনগুলি মূলত ট্রেড ইউনিয়নগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এই ট্রেড ইউনিয়নের হাত ধরে আন্দোলন, ধর্মঘট সংগঠিত করে শ্রমিকদের একতাবদ্ধ করতে পেরেছিল। ১৯০৮ সালে কলকাতায় প্রাদুর্ভূত *ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান* নামক ইউনিয়নটি ভাঙন গড়নের মধ্যদিয়ে ১৯২০ সালে *ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU)* রূপে বাংলার নাবিক স্বার্থে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। এই ISU সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণ ১৯২০ সালে জেনেভাতে ILO অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ISU এবং এর পাশাপাশি ১৯২০ -র পরবর্তী সময়ে বাংলায় গড়ে ওঠা আরও কিছু সীমেন্স ইউনিয়ন (বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন, ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার ইউনিয়ন প্রভৃতি) বাংলার নাবিকদের উপর ইউরোপীয় শিপিং কোম্পানি, দেশীয় মধ্যস্বত্বভোগী দালাল ঘাট-সারেংদের শোষণ থেকে প্রতিকারের জন্য সভা-সমাবেশ, আন্দোলন এবং ধর্মঘট পরিচালিত করেছিল। এরই মধ্যে দুই বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ বাংলার নাবিকদের জীবন ও কর্মপন্থা ভিন্ন পথে পরিচালিত করে তাদের দেশান্তরিত করেছিল। এসময় ঔপনিবেশিক শোষণ এতটাই তীব্র ছিল যে সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মরত বাংলার বহু নাবিক বহির্দেশে যাত্রাকালে জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে হোটেল, রেস্তরাঁ, ফেরী, গাড়ির কারখানা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীবিকা গ্রহণ করে সেখানে জীবন অতিবাহিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বহিঃসমুদ্রে ব্রিটিশ জাহাজগুলি শত্রুপক্ষের জাহাজের দ্বারা আক্রান্তের ফলে বাংলার বহু নাবিক আহত, নিহত ও নিরুদ্দেশ হয়েছিল। বাংলার সীমেন্স ইউনিয়নগুলি নাবিকদের ক্ষতিপূরণ এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাহাজে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আন্দোলন করেছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকেরা সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মসম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নদী ও উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ফেরী, জন পরিবহণ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত জলযানগুলিতে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিল। এখানে চলাচলকারী জলযানগুলি অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয় কোম্পানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জলযানগুলিতে কর্মরত বাংলার নাবিকদের ঔপনিবেশিক শোষণ আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে ফেলেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এখানে মূলত উচ্চপদগুলি ইউরোপীয় নাবিকদের উপর বহাল ছিল। বাংলার নাবিকদের সাধারণ ক্রু নাবিক থেকে সারেং পদে উন্নীত হতে ঊর্ধ্বতন অফিসারদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। ইউরোপীয়

নাবিকদের দ্বারা বর্ণগত বৈষম্য জনিত ভেদাভেদ, স্বল্প মজুরি, জাহাজে কর্মকালে নানা অব্যবস্থাগুলিকে সঙ্গে নিয়েই বাংলার নাবিকেরা জীবনধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। নাবিকদের এই কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকদের বিভিন্নধরনের সাহিত্যকেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ লেখনীগুলি শ্রমিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোকপাত করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকদের সংগঠিত আন্দোলন ও সংগ্রামগুলি কেবলমাত্র তাদের কর্মস্থলে শ্রমের উপর ভিত্তি করেই উপবিষ্ট হয়নি। এখানে নাবিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে দলগত রাজনৈতিক ভাবাবেগ অন্তর্নিহিত ছিল তাই এদের সংগ্রামী আন্দোলনগুলি ঔপনিবেশিক শাসনকে অবসানের দিকে ধাবিত করেছিল। বাংলার নাবিকদের সংগঠিত রূপে তাদের সংগ্রামী চেতনার আত্মপ্রকাশ ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল যা আমার গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয়।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১। Amiya Kumar Bagchi, *Private Investment in India 1900 – 1939*, Cambridge University Press, New York, 1972.

২। Suchetana Chattopadhyay, *An Early Communiest, Muzaffar Ahamed in Calcutta 1913 – 1929*, Tulika Books, New Delhi, 2011, p. 56.

৩। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ২৩।

৪। File No. ADMN – 6612/13, Bundle No. 80PT-8/A, 1947, The Maritime Union of India, KPT Library.

৫। R. J. Minney, *Night Life of Calcutta*, The Muston Company by K. C. Neogi, Nababhakar Press, Calcutta, 1922, pp. 57-58.

নির্বাচিত গবেষণা উপাদান ও তথ্যসূত্র

I. প্রাথমিক উপাদান:

A. অপ্রকাশিত সরকারী নথিপত্র (Unpublished Official Records):

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal State Archives, Kolkata, West Bengal)

গোয়েন্দা শাখার নথিপত্র (IB Files):

- File No. 123/23 (123/1923) List of labour unions & association in Bengal, Indian Seamen's Union.
- File No. 75/27 (34/1927) Indian Seamen's Union & its branches.
- File No. 328/27 (129/1927) Enquires regarding individuals endeaveuring to go abourd in the role of Seamen.
- File No. 429/27 (175/1927) Deportation of Indians from abroad.
- File No. 26E/29 (18/1929) Notes and reports about the residents of Hooghly, who sought passports for going abroad.
- File No. 26D/29 (60/1929) Application for Passport from resident of Calcutta.
- File No. 26A/1931 (28/31) List of Persons who have been granted passports for their journey to Europe & USA during 1931.
- File No. 614-27 (99/1927) Bengal Mariner's Union.
- File No. 117/27 (2/1927) List of publication prohibited entry into India under The Sea Customs Act.

মেরিন শাখা, বাণিজ্য এবং শ্রম বিভাগ (Commerce and Labour Department, Marine Branch):

- File No. 4s – 32 of 1938 Proceeding 55 to 59. Repair: Method of refitting police Floating Craft and arrangement made for towing them to and from the Government Dockyard, Narayangunge, and to their respective stations.

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, ঐতিহ্যবাহী মেরিটাইম আর্কাইভ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ (Kolkata Port Trust, Maritime Archives and Heritage Centre, Kolkata, West Bengal):

প্রশাসন বিভাগ (Administration Department):

- File No. 171/3, Bundle No. 725, 1920 Supply of labour for night work at jetties.
- File No. 2843/313 GENL, Bundle No. 53PT-24, 1920, Strike of Workshop labours.
- File No. 6641/1, Bundle No. 54PT-13, 1921, International labour Conference.
- File No. 2843/310, GENL/V(BUNCH), Bundle No. 59PT-19, 1926, Gratuity granted to J Khatoon Widow of Nobi Box later fitter attached to workshop labour.
- File No. 6612/13, Bundle No. 80PT-8/A, 1947, The Maritime Union of India.
- File No. 7001. Bundle No. 61PT-6, 1928, Payment of detention money and of the coast of radio message during strike in the Port.
- File No. 7068, Bundle No. 60PT-19A, 1927, Indian Seamen's Union.
- File No. 6612/7, Bundle No. 76PT-1, 1943, Bengal Mariner's Union.
- File No. 3019/95 GENL, Bundle No. 701, 1919. Jamaluddy, Lascar of No. 12 heave-up boat for compensatory allowance.
- File No. 6640, Bundle No. 54PT-7, 1921, Strikes in Bengal.
- File No. 6640/1, Bundle No. 55PT-19, 1922, Strike of Stevedores Coolies.
- File No. 6640/2, Bundle No. 60PT-5, 1927, Strike of docks and Jetty coolies & others.
- File No. 6640/4, Bundle No. 62PT-4, 1929, Lighting strikes and forfeiture of wages.
- File No. 6710, Bundle No. 54PT-7, 1921, Hooghly River training scheme for reclamation of land.
- File No. 6648, Bundle No. 54PT-30, 1921, Conserveny of the embayment South of the Rangoon Passengers Shed.
- File No. 6841/1/I Bundle No. 74PT-5, 1941, Hooghly River Shipping Gazettee.

B. প্রকাশিত সরকারী নথিপত্র (Published Official Records):

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, ঐতিহ্যবাহী মেরিটাইম আর্কাইভ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ (Kolkata Port Trust, Maritime Archives and Heritage Centre, Kolkata, West Bengal):

- The Indian Seamen's Union (Established 1908), Trade Union, Registered under the Indian Trade Unions Act, 1926, Register No. 12 (Affiliated with the International Transport workers' Federation, Amsterdam, Holland and All-India Trade Union Congress), Constitution & Rules, Printed by P. L. Dey at the Kidderpore Press, and Published by Aftab Ally, General Secretary, Indian Seamen's Union, Kidderpore, Calcutta.
- National Union of Dockers, ESTD. – 1929, Trade Union, Registered Under the Indian Trade Unions Act, 1926, Register No. 17, Constitution & Rules, Printed by P. L. Dey at the Kidderpore Press, and Published by S. I. Yatzdani, General Secretary, National Union of Dockers, Kidderpore, Calcutta.

জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ (National Library, Kolkata, West Bengal):

- Regulations relating to the Examinations of Masters and Mates in the Mercantile Marine for Colonial and Home-Trade Certificates of Competency, Issued by the Government of Bengal, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot., 1911.

C. প্রকাশিত সরকারী কার্যবিবরণী ও রিপোর্ট (Published Official Proceedings and Reports):

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, ঐতিহ্যবাহী মেরিটাইম আর্কাইভ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ (Kolkata Port Trust, Maritime Archives and Heritage Centre Kolkata, West Bengal):

- Protection of workmen engaged in loading or unloading ships, Extract from the Proceedings of Port Commissioners' 2104th Meeting, held on the 14th August 1933.

- The Indian Seamen's Union Annual General Meeting 1929, Proceedings and Reports Presented to the Chairman, Calcutta Port Commissioners write compliments of the Indian Seamen's Union, Aftab Ally, General Secretary 18.09.1929.
- The Annual Reports by the Port Officers, Calcutta and Chittagong, for the year 1923-24, Government of Bengal, Marine Department, Calcutta, 2nd March, 1923.
- Annual Reports of the Port Officers, Calcutta and Chittagong, for the year 1926-27, Government of Bengal, Marine Department, Supplement to the Calcutta Gazette, 1st September, 1927.
- Jetty Monthly Labour, Extract from the Proceedings of the Port Commissioners' 1991st Meeting, held on the 30th January 1928.
- International Labour Conference, Extract from Proceedings of the Port Commissioners' 1802nd Meeting, held on the 4th April 1921.
- The Indian Seamen's Union, Presidential address of Mr. Aftab Ali, M. L. A., delivered at the 22nd Annual General Meeting of the Union held Registered office (27B, Circular Garden Road, Kidderpore, Calcutta) on Sunday the 3rd November, 1940 at 4 p. m.
- Annual Report of the Port Officer's Department for the Year 1924-25, Calcutta, Government of India Press, 1925.
- Government of Bengal, Marine Department, Annual Report of the Port officer's Department Chittagong for the Year 1924-25, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1925.
- Government of Bengal, Marine Department, Calcutta the 4th December 1923, the Annual Report of the Port Officer's, Calcutta and Chittagong, for the Year 1922-23.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal State Archives, Kolkata, West Bengal):

- R. N. P., Confidential No. 23 of 1923, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Week ending Saturday, 9th June 1923.

D. ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (District Gazetteers):

- O'malley, L. S. S., Bengal Districts Gazetteers 24-Parganas, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot., 1914.
- Jack, J. C., Bengal Districts Gazetteers Bakarganj, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot., 1918.
- O'malley, L. S. S., Eastern Bengal Districts Gazetteers Chittagong, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot., 1908.
- O'malley, L. S. S. and Chakravarti, Monmohan, Bengal Districts Gazetteers Howrah, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot., 1909.
- Allen, B. C., Eastern Bengal Districts Gazetteers Dacca, Allahabad, The Pioneer Press, 1912.
- O'malley, L. S. S. and Chakravarty, Monmohan, Bengal Districts Gazetteers Hooghly, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot., 1912.
- Webster, J. E., Eastern Bengal and Assam District Gazetteers Noakhali, Allahbad, The Pioneer Press, 1911.
- Webster, J. E., Eastern Bengal District Gazetteers Tippera, Allahbad, The Pioneer Press, 1910.

E. গবেষণা সম্পর্কিত মূল আকরগ্রন্থ:

ইংরেজি বই:

- Daud, Mahammed, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924*, Calcutta, publication date not known.

F. গবেষণা সম্পর্কিত অন্যান্য আকরগ্রন্থ:

ইংরেজি বই:

- Mukherjee, Nilmani, *The Port of Calcutta, A Short History,* Calcutta, The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968.

G. আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ (Autobiographies):

ইংরেজি বই:

- Hardinge, Lord, *My Indian Years, 1910-1916, The Reminiscences of Lord Hardinge of Penhurst*, London, Butler and Tanner Ltd., 1948.

বাংলা বই:

- আহ্‌মদ, মুজফ্‌ফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* কোলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৬০।

H. সাময়িক পত্রপত্রিকা ও দৈনিক সংবাদপত্র:

ইংরাজি পত্রিকা:

- *Englishman*
- *Forward*
- *Hindusthan Standard*
- *Morning News*
- *Nationalist*
- *The Bengalee*
- *Times*
- *The Statsman*

বাংলা পত্রিকা:

- *অমৃতবাজার পত্রিকা*
- *আজাদ*
- *আনন্দবাজার পত্রিকা*
- *গণবাণী*
- *বসুমতি*
- *স্বাধীনতা*

II. গবেষণা সম্বন্ধিত সাহিত্যিক উপাদান:

ইংরেজি বই:

- Minney, R. J., *Night life of Calcutta*, Calcutta, Nababhakar Press, 1922.

বাংলা বই:

- আলী, সৈয়দ মুজতবা ও রঞ্জন, *দ্বন্দ্ব মধুর,* আলী, সৈয়দ মুজতবা, *নোনাজল,* কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ/১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ।
- আলী, সৈয়দ মুজতবা, *মুসাফির,* কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৩৭২।
- ইসলাম, কাজী নজরুল, *সাম্যবাদী, কুলি-মজুর,* প্রকাশকাল ১৩৩২ বঙ্গাব্দ/১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ।
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *ভাঙা বন্দর,* কলিকাতা, কমলা পাব্‌লিশিং হাউস, ভাদ্র ১৩৫২।
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, তিমির-তীর্থ, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ, ১৩৫১।
- গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ, *সুন্দরবনের চিঠি,* কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল, ১৯৬৩।
- গুপ্ত, শ্রীঅতুলচন্দ্র, *নদীপথে,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আষাঢ়, ১৩৪৪।
- ঘোষ, গৌরকিশোর, *সাগিনা মাহাতো,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬০।
- চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, *শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব,* কলকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পাবলিকেশন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ/১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।
- দাশ, জীবনানন্দ, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সাতটি তারার তিমির, নাবিক ও নাবিকী,* কলকাতা, নাভানা, ১৯৫৪।
- ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, *অবনীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, (কোট্‌রা),* কলকাতা, প্রকাশ ভবন, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ/১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ, তৃতীয় প্রকাশ ১৪১০ বঙ্গাব্দ/ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।
- ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, *কলিকাতায় চলাফেরা, সেকালে আর একালে,* কোলকাতা, কল্পন, ১৯৮৮।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ, ছুটি,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গোরা,* ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা, জানুয়ারি, ২০১২।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জাপান-যাত্রী,* বীরভূম, শান্তিনিকেতন প্রেস, শ্রাবণ, ১৩২৬।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *নৌকাডুবি,* বীরভূম, শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৯০৬।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *পথের সঞ্চয়, সমুদ্রপাড়ি,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ভাদ্র, ১৩৪৬, "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩১৯।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সঞ্চয়িতা,* বীরভূম, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ/১৯৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দ, শেষ প্রকাশ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ/১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সোনার তরী,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩০০, 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণ আশ্বিন ১৩০৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপু পথের পাঁচালী অপরাজিত, প্রথম খন্ড,* কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৬৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অভিযাত্রিক,* কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ/১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা,* কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬৩।
- বিবেকান্দ, স্বামী, *পরিব্রাজক,* কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ/১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ।
- মহারাজ, শঙ্কু, *গঙ্গাসাগর,* কলিকাতা, অমর সাহিত্য প্রকাশন, ভাদ্র ১৩৬৭।
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা, বেনামী বন্দর,* কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ/১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা, জাহাজের ডাক,* কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ/১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।
- রূপদর্শী, *রূপদর্শীর নক্‌শা,* কলকাতা মিত্রালয়, কলকাতা, ১৯৫২।
- সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার, *সারেঙ,* কলিকাতা, দিগন্ত পাব্‌লিশার্স লিমিটেড, অগ্রহায়ন, ১৩৫৪।

III. গৌণ উপাদান:

ইংরাজি বই:

- Ahmed, Rafiuddin, *The Bengal Muslims 1871-1906, A Quest for Identity*, Delhi, Oxford University Press, 1981.
- Ahmed, Rehana and Mukherjee, Sumita, (eds.), *South Asian Resistances in Britain 1858-1947*, New Delhi, Bloomsbury, 2011.
- Ahuja, Ravi, (ed.), *Working Lives & Worker Militancy, The Politics of Labour in Colonial India,* New Delhi, Tulika Books, 2013.
- Bagchi, Amiya Kumar, *Workers and the Historians' Burden*, K.N. Panikkar, Terence J. Byres and Patnaik, Utsa (eds.), *The Making of History: Essays presented to Irfan Habib*, New Delhi, Tulika Books, 2000.
- Bagchi, Amiya Kumar, *Capital and Labour Redefined, India and the Third World*, Delhi, Tulika Books, 2002.
- Bagchi, Amiya Kumar, *Private Investment in India, 1900-1939, Cambridge*, Cambridge University Press, 1972.
- Balachandran, Gopalan, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945*, New Delhi, Oxford University Press, 2012.
- Bald, Vivek, *Bengali Harlem and the Lost Histories of South Asian America*, Cambridge, Harvard University Press, 2013.
- Bandyopadhyay, Sekhar (ed.), *Nationalist Movement in India, A Reader*, Delhi, Oxford University Press, 2009.
- Banerjee, Dr. Prajanananda, *Calcutta and its Hinterland, - A Study in economic history of India 1833-1900*, Calcutta, Progressive Publishers, 1975.
- Barman, Rup Kumar, *River, Society and Culture, Environmental Perspectives on the Rivers of Assam and Bengal*, Delhi, Primus Books, 2023.
- Basu, Nirban, *The Working Class Movement, A Study of Jute Mills of Bengal 1937-47*, Calcutta, K.P. Bagchi & Company, 1994.
- Basu, Subho, *Does Class Matter?, Colonial Capital and Workers' Resistance in Bengal, 1890-1937*, New Delhi, Oxford University Press, 2004.

- Behal, P. Rana, and Linden, Marcel Van der, *India's Labouring Poor, Historical Studies, c.1600 – c.2000,* New Delhi, Cambridge University Press, 2007.
- Beaudoin, Steven M. (ed.), *The Industrial Revolution,* New York, Houghton Mifflin Company, 2003,
- Bhattacharya, Sabyasachi and Behal, P., (eds.*) The Vernacularization of Labour Politics,* Delhi, Tulika Books, 2016.
- Bhowmik, Sharit K., *Industry, Labour and Society,* New Delhi, Orient Blackswan Private Limited, 2012.
- Bloch, Marc, *Feudal Society, Volume I, The Growth of Ties of Dependence*, London and New York, Routledge, 1962.
- Bloch, Marc (Translated from the French by L. A. Manyon), *Feudal Society, Volume II, Social Classes and Political Organization,* London, Routledge, 1962.
- Bose, Aniruddha, *Class Conflict and Modernization in India, The Raj and the Calcutta Waterfornt (1860-1910),* New York, Routledge, 2018.
- Bose, Sanat Kumar, *Capital and Labour in the Indian Tea Industry,* Bombay, All-India Trade Union Congress, 1954.
- Chakrabarty, Dipesh, *Rethinking Working-Class History, Bengal 1890 to 1940,* Princeton, Princeton University Press, 2000.
- Chakravorty, Dr. Upendra Narayan, *Indian Nationalism and the First World War, 1914-18, Recent Political and Economic History of India,* Calcutta, Progressive Publishers, 1997.
- Chattopadhyay, Suchetana, *An Early Communist, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913-1929,* New Delhi, Tulika Books, 2000.
- Chattopadhyay, Suchetana, *Voices of Komagata Maru, Imperial Surveillance and Workers from Punjab in Bengal,* New Delhi, Tulika Books, 2018.
- Chandavarkar, Rajnarayan, *Imperial Power and Popular Politics, Class, Resistance and the State in India, c. 1850-1950,* Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
- Chaudhuri, Sukanta (ed.), *Calcutta, The Living City, Volume I: The Past*, Calcutta, Oxford University Press, 1990.

- Chaudhuri, Sukanta (ed.), *Calcutta, The Living City, Volume II: The Present and Future*, Calcutta, Oxford University Press, 1990.
- Das Gupta, Ranajit, *Labour and Working Class in Eastern India Studies in Colonial History*, Calcutta, K.P. Bagchi & Company, 1994.
- Das, Suranjan, *Communal Riots in Bengal 1905-1947*, Delhi, Oxford University Press, 1991.
- Deasi, A. R., *Labour Movement in India, Documents: 1918 – 1920*, Bombay, Popular Prokasoni, 1988.
- Deasi, A. R., *Social Background of Indian Nationalism*, Bombay, Popular Press, 1948.
- Dutta, R. Palme, *India To-Day*, London, Victor Gollancz LTD, 1940.
- Fink, Leon, *Sweatshops at Sea, Merchant Seamen in the World's first globalized Industry, From 1812 to the Present*, USA, The University of North Carolina Press, 2003.
- Fischer, Michael H., *Counterflows to Colonialism, Indian Travellers and Settlers in Britain 1600-1857*, Delhi, Permanent Black, 2004.
- Gardner, Katy, *Age, Narrative and Migration, The Life Course and Life Histories of Bengali Elders in London*, New York, Berg, 2002.
- George, Jose, Kumar, Manoj, and Ojha, Dharmendra, (eds.), *Working Class Movement in India in the Wake of Globalization*, Delhi, Manohar, 2012.
- Guha, Ranajit (ed.), *Subaltern Studies I, Writing on South Asian History and Society*, Delhi, Oxford University Press, 1982.
- Haan, Arjan de, *How the Aid Industry Works, An Introduction to International Development*, USA, Kumarian Press, 2009.
- Habib, Irfan, *The National Movement, Studies in Ideology and History*, New Delhi, Tulika Books, 2011.
- Habib, Irfan, *The National Movement, Origins and Early Phase, to 1918*, Delhi, Tulika Books, 2017.
- Hasan, Mushirul (ed.), *Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India*, New Delhi, Manohar, 1981.
- Hobsbawam, E. J., *Labouring Men: Studies in the history of Labour*, New York, Anchor Books, 1964.
- Holub, Renate, *Antonio Gramsci, Beyond Marxism and Postmodernism*, New York, Routledge, 1992.

- Hossain, Ashfaque, *Colonial Globalization and its effects on South Asia, Eastern Bengal, Sylhet and Assam, 1874-1974,* New York, Routledge, 2023.
- Jaffer, Aaron, *Lascars and Indian Ocean Seafaring 1780-1860, Shipboard Life, Unrest and Mutiny,* Woodbridge, The Boydell Press, 2015.
- Jha, Shiva Chandra, *The Indian Trade Union Movement, An Account and in Interpretation,* Calcutta, K. L. Mukhopadhyay, 1970.
- Johnston, J., *Inland Navigation on the Gangetic rivers,* Calcutta, Thacker, Spink & Co. 1947.
- Joshi, Chitra, *Lost Worlds, Indian Labour and Its Forgotten Histories*, Delhi, Permanent Black, 2003.
- Kumar, Dharma, (ed.), *The Cambridge Economic History of India, Volume II, c. 1757-2003*, New Delhi, Orient Longman Private LTD, 2004.
- Lahiri, Shompa, *Indians in Britain, Anglo-Indian Encounters, Race and Identity 1880-1930*, New York, Routledge, 2013.
- Lieten, Georges Kristoffel, *Colonialism, Class and Nation, The Confornтation in Bombay Around 1930,* Calcutta, K P Bagchi & Company, 1984.
- M. Beaudoin, Steven (ed.), *The Industrial Revolution,* New York, Houghton Mifflin Company, 2003.
- Marx, Karl *Capital, Vol. I,* London, penguin Books, 1982.
- Marx, Karl, *Wage-Labour and Capital & Value, Price and Profit,* New York, International Publishers, 1935,
- Mookerjee, Radhakumud, *Indian Shipping, A History of the Sea-Borne Trade and Maritime activity of the Indians from the Earliest Times*, Calcutta, Longmans, Green and Co., 1912.
- Panikkar, KN, Byres, Terence J., Patnaik, Utsa (eds.), *The Making of History, Essays presented to Irfan Habib*, New Delhi, Tulika Books, 2000.
- Putney, Martha S., *Black Sailors, Afro-American Merchant Seamen and Whalemen prior to the Civil War*, New York, Greenwood Press, 1987.
- Ray, Rajat, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure groups and Conflict of Interest in Calcutta City Politics, 1875-1937*, Calcutta, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979.
- Roy, Rajat Kanta (ed.), *Enterpreneurship and Industry in India, 1800-1947,* Calcutta, Oxford Univerity Press, 1994.

- Roy, Anuradha and Waligora, Melitta, (eds.), *Kolkata in Space, Time, and Imagination, Vol. 1*, Chattopadhyay, Suchetana, *Impression of Ships, Calcutta during the 1910s*, Delhi, Primus Books, 2019.
- Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, New Delhi, People's Publishing House, 1973.
- Sarkar, Sumit, *Writing Social History*, New Delhi, Oxford University Press, 1997.
- Sen, Ranjit, *Birth of a Colonial City, Calcutta*, New York, Routledge, 2019.
- Sen, Samita, *Women and Labour in Late Colonial India, The Bengal Jute Industry*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Sen, Sukomal, *Working Class of India, History of Emergence and Movement 1830-1970*, Calcutta, K P Bagchi & Company, 1977.
- Siddharth, Guha Ray, *Calcutta Tramwaymen, A Study of Working Class History*, Calcutta, Progressive Publishers, 2007.
- Shah, Mohammad, *In Search of an Identity, Bengali Muslims 1880-1940*, Calcutta, K P Bagchi & Company, 1996.
- Stanziani, Alessandro, *Sailors, Slaves, and Immigrants, Bondage in the Indian Ocean World, 1750-1914*, New York, Palgrave Macmillan, 2014.
- Tabili, Laura, *"We Ask for British Justice", Workers and racial difference in late imperial Britain*, New York, Cornell University Press, 1994.
- Tambe, Ashwini and Fischer-Tine' Harald (eds.), *The Limits of British Colonial control in South Asia, Spaces of disorder in Indian Ocean region*, New York, Routledge, 2009.
- Thompson, E.P., *The Making of the English Working Class*, New Delhi, Penguin Books, 1980.
- Toynbee, Arnold, *The Industrial Revolution*, Boston, The Beacon Press, 1956.
- Visram, Rozina, *Asians in Britain, 400 Years of History*, Sterling, Pluto Press, 2002.

বাংলা বই:

- কর, শমিত, মার্কসের পর মার্কসবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১০, মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭।
- ঘোষ, পার্থ, *শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম, রাষ্ট্র ও বিপ্লব,* কোলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৩।
- চক্রবর্তী, দীপেশ এবং দাশগুপ্ত রণজিৎ, *উনিশ শতকের বাংলার শ্রমিক ইতিহাসের কয়েকটি দিক, দুটি পর্যালোচনা,* কোলকাতা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯।
- চন্দ্র, বিপান, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭ – ১৯৪৭,* কোলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৪।
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭।
- চৌধুরী সুশীল, *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য,* ভারত মহাসাগর অঞ্চল ১৫০০-১৮০০, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭।
- ত্রিপাঠী, অমলেশ, *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সংস্করণ ডিসেম্বর, ১৯৮৭, মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৫।
- দাশ, অসিতাভ, (রচনা ও ভাষান্তর), *রাসবিহারী বসুর জীবনকথা ও রচনাসংগ্রহ,* কলকাতা, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৯।
- দাস, গোকুলচন্দ্র, *বাংলার নৌকা, প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগ,* কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১১।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশান, আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* কোলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১২।
- বসু, নির্বাণ, (সম্পাদনা),*অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস,* কোলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৩।
- ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, (সম্পাদনা), *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮।

- মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দী,* কোলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০১।
- রায়, তীর্থংকর, *ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭।
- রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৩৫৬।
- রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দ্বিতীয় খন্ড,* কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৯।
- রায়, মনোরঞ্জন, *শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য প্রসঙ্গে,* কোলকাতা, নিশান প্রকাশনী, ১৯৬৫।
- রায়, রজতকান্ত, *পলাশীর ষড়যন্ত্রও সেকালের সমাজ,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৪, মুদ্রণ মার্চ ২০১৭।
- সরকার, চণ্ডী প্রসাদ, *বাঙালি মুসলমান ১৮৬৩ – ১৯৪৭,* কোলকাতা, মিত্রম্, ২০০৭।
- সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫ -১৯৪৭,* কোলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৩।
- সরকার, সুমিত, *মর্ডান টাইমস, ভারতের ১৮৮০-র দশক থেকে ১৯৫০ –এর দশক পরিবেশ, অর্থব্যবস্থা, সংস্কৃতি,* কোলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৯।
- সেন, রঞ্জিত (সম্পাদক), *বাংলার শ্রমশক্তি,* কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০০০।
- সেন, সুকোমল, *ফ্যাসিবাদ অতিত ও বর্তমান, ভারতের প্রসঙ্গসহ,* কোলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০১২।
- সেন, সুকোমল, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ – ২০০০,* কোলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০০৫।
- সেন, সুকোমল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা,* কোলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০১২।
- সুধাংশু, দাশগুপ্ত, *কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাতা থেকে,* কোলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৯২।

- হাবিব, ইরফান, *ভারতের অর্থনীতি, ১৮৫৮-১৯১৪,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৭।
- হাসান, মুশিরুল, *স্বাধীনতার পথ, ঔপনিবেশিক ভারতে বন্দিরা,* নয়া দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬।

VI. নির্বাচিত গবেষণা জার্নাল:

ইংরেজি

- Ahuja, Ravi, "Mobility and Containment: The Voyages of South Asian Seamen, c.1900 – 1960," *International Review of Social History*, Vol. 51, 2006, pp. - 111-141.
- URL: https://www.jstore.org/stable/26405453
- Balachandran, G., "Workers in the World Indian Seafarers, c. 1870s – 1940s", *Global Histories of Work,* edited by Andreas Eckert, 1st ed., De Gruyter, 2016, pp. 125-45.
- URL: https://www.jstore.org/stable/j.ctvbkjv3d.7
- Broeze, Frank, "Militancy and Pragmatism: An International Perspective on Maritime Labour, 1870-1914," *International Review of Social History*, vol. 36, no. 2, 1991, pp. 165-200.
- URL: https://www.jstore.org/stable/44582134
- Ewald, Janet J., "Crossers of the Sea: Slaves, Freedmen, and Other Migrants in the Northwestern Indian Ocean, c. 1750-1914." *The American Historical Review*, Vol. 105, no. 1, 2000, pp. 69-91.
- URL: https://doi.org/10.2307/2652435
- Fisher, Michael H., "Working across the Seas: Indian Maritime Labourers in India, Britain, and in Between, 1600-1857." International Review of Social History, Vol. 51, 2006, pp. 21-45.
- URL: http://www.jstor.org/stable/26405450
- Gardner, Katy, "Desh-Bidesh: Sylheti Images of Home and Away" *Man,* vol. 28, No. 1, 1993, pp. 1-15.
- URL: https://doi.org/10.2307/280443

- Goodall, Heather, "Port Politics: Indian Seamen, Australian Unions and Indonesian Independence, 1945-47," *Labour History*, No. 94, 2008, pp. 43-68.
- URL: https://www.jstore.org/stable/27516270
- Haupt, Paul, Askari, 'Soldier,' and Lascar, 'Sailor', Journal of the American Oriental Society, 1916, Vol. 36, pp. 417-418.
- URL: https://www.jstor.org/stable/592701
- Hossain, Ashfaque, The World of the Sylheti Seamen in the Age of Empire, from the late eighteenth century to 1947, *Journal of Global History, Vol. 9,* 2014, pp. 425-446.
- DOI: 10.1017/S1740022814000199,
- McKeown, Adam, "Global Migration, 1846-1940", *Journal of World History,* Vol. 15, No. 2, 2004, pp. 155-189.
- URL: https://www.jstore.org/stable/20068611
- Tabili, Laura, (1993), "Keeping the Natives under Control": Race Segregation and the Domestic Dimensions of Empire, 1920-1939", *International Labour and Working Class History, No. 44,* 1993, pp. 64-78.
- URL: https://www.jstore.org/stable/27672102
- Wani, Javed Iqbal, "Public order and the fear of the 'outsider': porosity of labour politics in late colonial India, *Labour History,* 62:5-6, 2021, pp. 704-720.
- DOI: 10.1080/0023656X.2021.1968360
- Weiss, Holger, "Reopening work among Colonial Seamen", *In A Global Radical Waterfront: The International Propaganda Committee of Transport Workers and the International of Seamen and Harbour Workers, 1921-1937,* Brill, 2021, pp. 161-179.
- URL: https://www.jstore.org/stable/10.1163/j.ctv1v7zbgk.12

V. গবেষণা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট (Website)

- http://kolkataporttrust.gov.in/kopt_lecture2005.pdf
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lascar_War_Memorial
- https://www.bl.uk/
- http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

VI. সাক্ষাৎকার

- সৈয়দ মাসুদ আলি – একজন বাংলার নাবিক বংশভূত ব্যক্তি, বর্তমানে কলকাতা তালতলার বাসিন্দা (কলকাতার তালতলায় ২৫.০৮.২০২৪ তারিখে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়)

VII. অপ্রকাশিত গবেষণা কার্য (Unpublished Thesis Dissertations)

- Khanam, Farhin, *Labour and Union Formation in late colonial Calcutta: A Case Study of the Indian Seamen's Union*, Jadavpur University, M. Phil Dissertation, 2014.

পরিশিষ্ট

মানচিত্র নং – ১

ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকদের ভৌগলিক অবস্থানটি সূচিত করতে জেলাভিত্তিক সামগ্রিক বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রটি দেখানো হল

মানচিত্র নং – ২

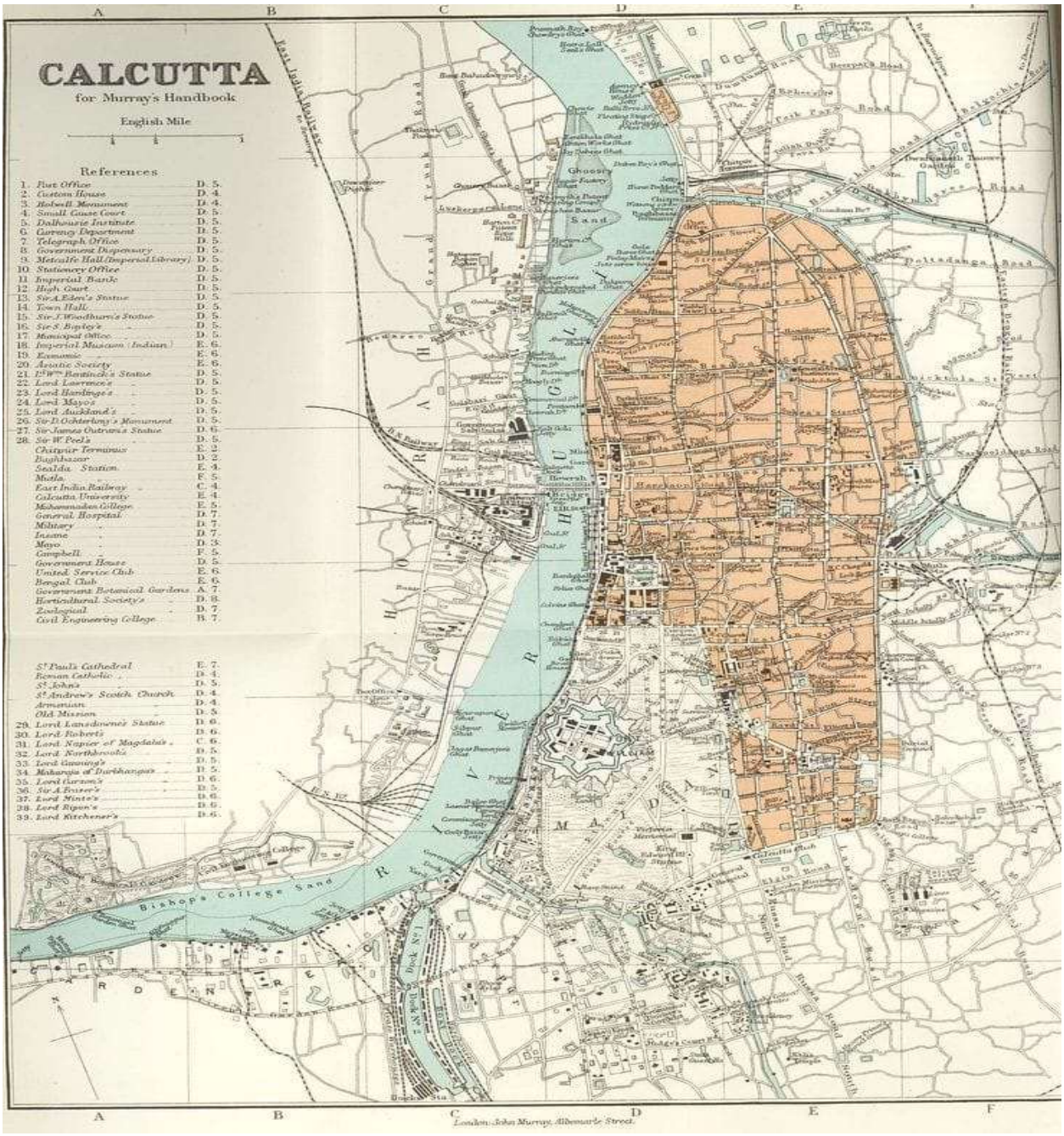

হুগলী নদীর তীরে কলকাতা বন্দর ও শহরতলির মানচিত্রটি তুলে ধরা হল যেখান থেকে বাংলার অধিকাংশ নাবিক জাহাজ কর্মে সংযোগ সাধনের উন্মুক্ত পরিসর পেয়েছিল

চিত্র নং – ১

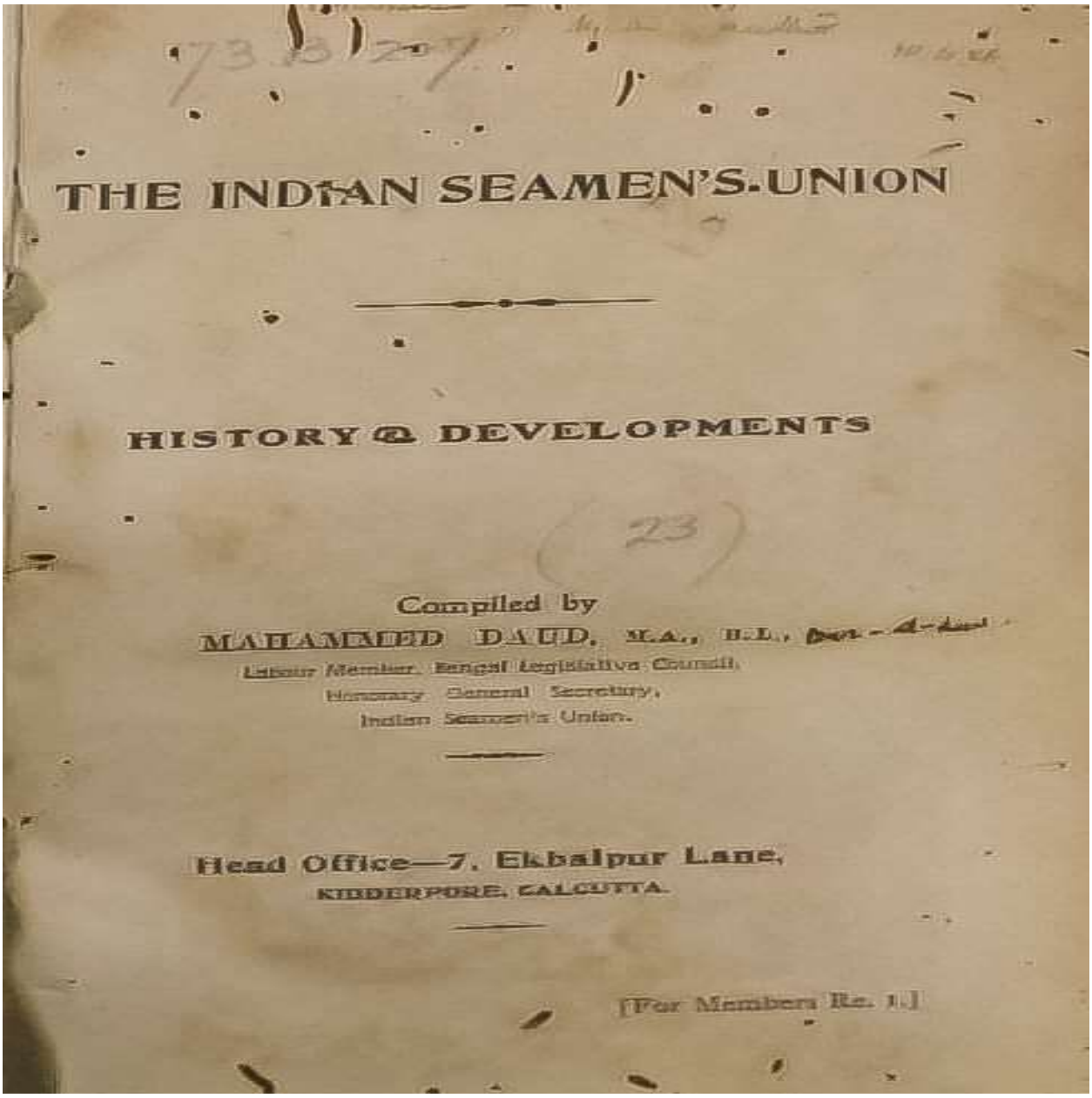
THE INDIAN SEAMEN'S UNION

HISTORY & DEVELOPMENTS

Compiled by

MAHAMMED DAUD, M.A., B.L.,

Labour Member, Bengal Legislative Council,
Honorary General Secretary,
Indian Seamen's Union.

Head Office—7, Ekbalpur Lane,
KIDDERPORE, CALCUTTA.

[For Members Re. 1.]

বাংলার নাবিক সম্পর্কিত মহম্মদ দাউদের লেখা Indian Seamen's Union, History and Developments নামক গ্রন্থের শিরোনাম পৃষ্ঠা

(সূত্রঃ National Library, Kolkata)

চিত্র নং – ২

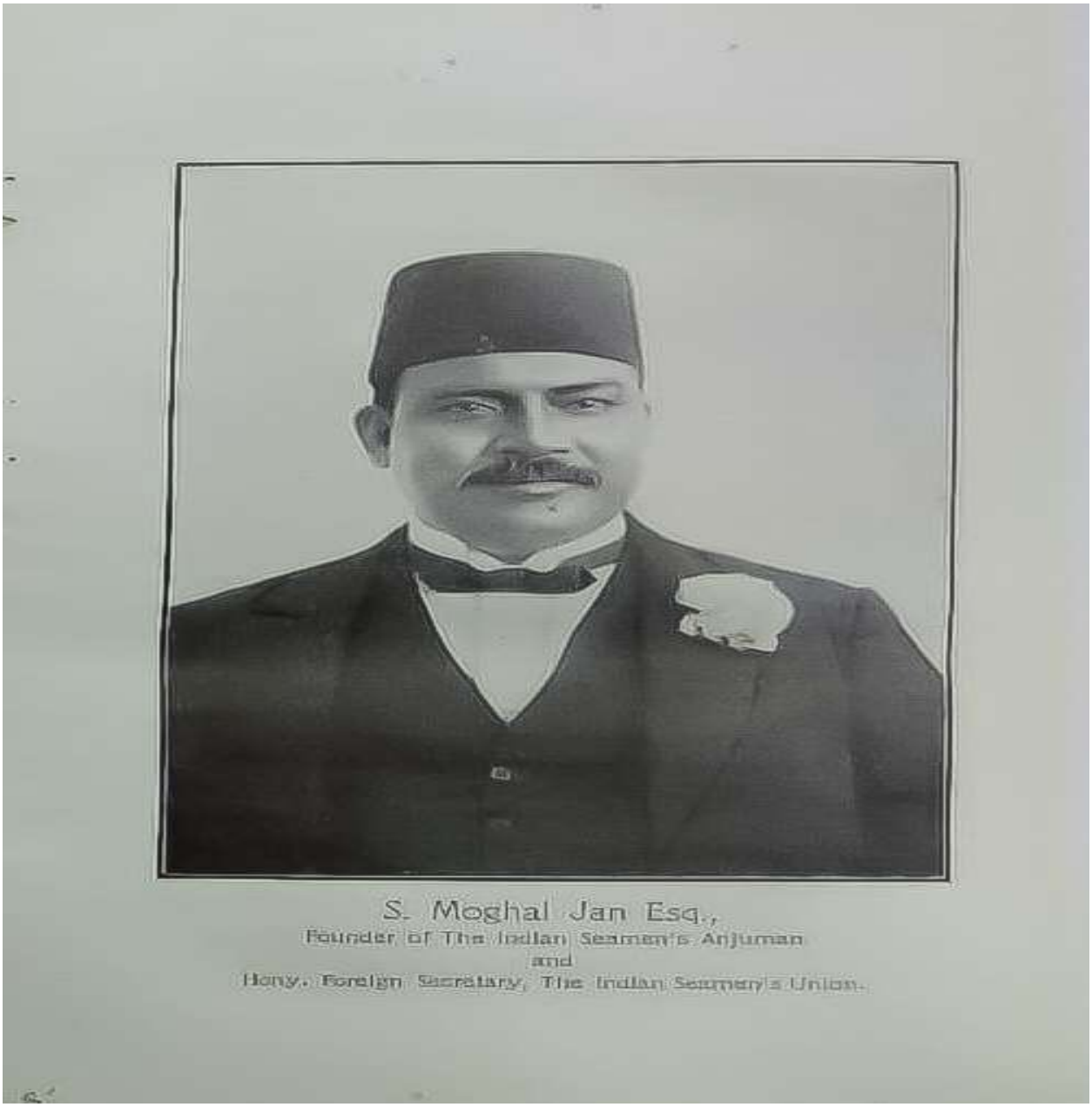

ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা এবং ফরেন সেক্রেটারি এস. মোঘল জান

(সূত্রঃ Mahammed Daud, The Indian Seamen's Union: History and Developments গ্রন্থ কর্তৃক সংগৃহীত)

চিত্র নং – ৩

আর. ব্রাউনফিল্ড ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য, যিনি ১৯১৮-১৯২২ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে দায়িত্বপালন করেছিলেন

(সূত্রঃ Mahammed Daud, The Indian Seamen's Union: History and Developments গ্রন্থ কর্তৃক সংগৃহীত)

চিত্র নং – ৪

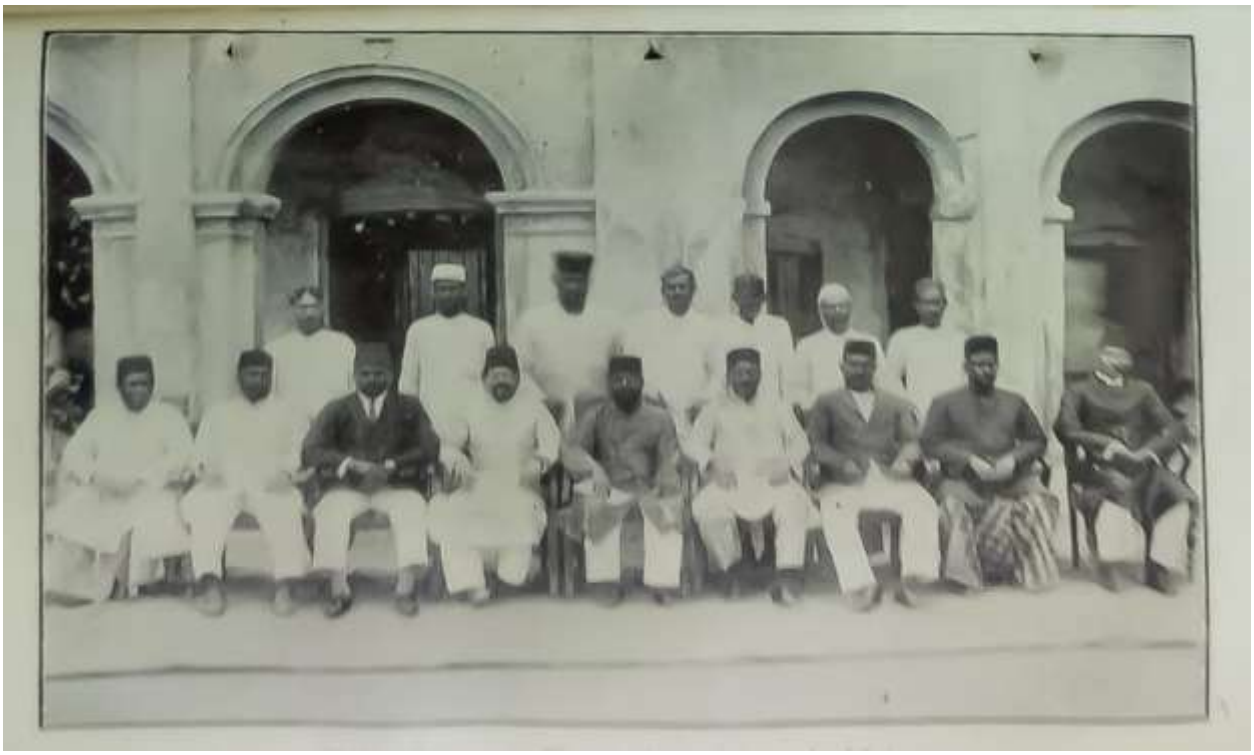

ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন -এর অফিস বেয়ারার সদস্যবৃন্দ

দাঁড়িয়ে থাকা সদস্য (বাম থেকে ডান দিকে) – বি. পি. বিট, আব্দুল ওয়াহেদ, মোবারক আলি, মহম্মদ ইউসুফ, আশিরুদ্দীন খান, আকরম আলি এবং এ. মজিদ

বসে থাকা সদস্য (বাম থেকে ডান দিকে) – চুন্নো মিয়াঁ, সৈয়দ মিন্নাত আলি, মহম্মদ দাউদ (M.A., B.L., M.L.C.), মহম্মদ মাহাবুবুল হক (M.A., B.L.), ডঃ এস. এ. রহমান, এস. মোঘল জান, মুজাম্মিল আলি, মহম্মদ ইব্রাহিম এবং এম. এ. রাজ্জাক (B.L.)

(সূত্র: Mahammed Daud, The Indian Seamen's Union: History and Developments গ্রন্থ কর্তৃক সংগৃহীত)

চিত্র নং – ৫

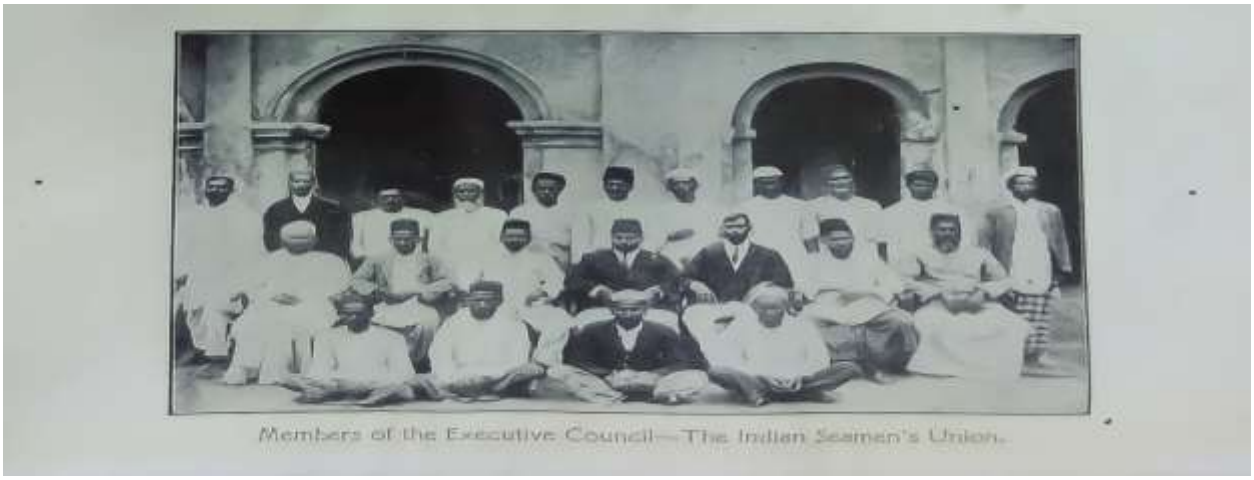

ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন -এর কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ

(সূত্রঃ Mahammed Daud, The Indian Seamen's Union: History and Developments গ্রন্থ কর্তৃক সংগৃহীত)

চিত্র নং – ৬

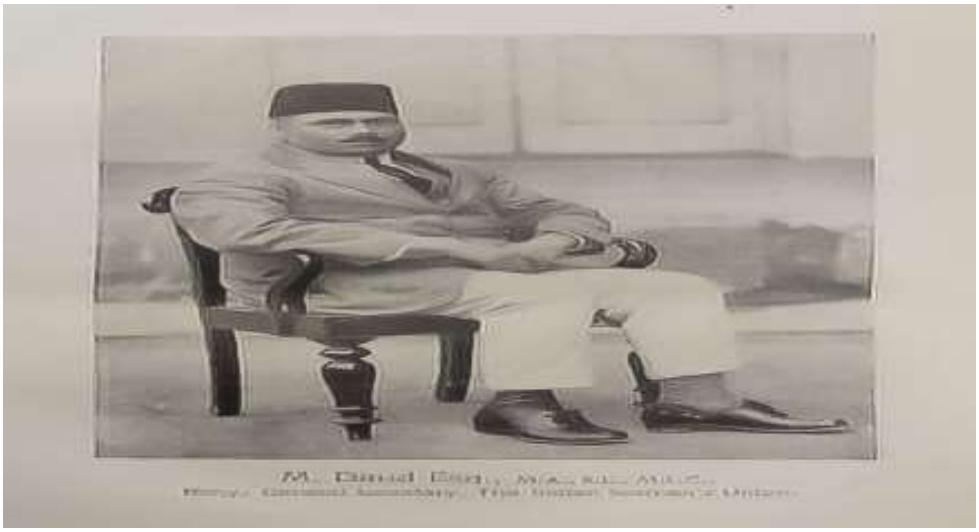

মহম্মদ দাউদ বাংলার নাবিক স্বার্থে হিতসাধনকারী একজন অন্যতম সদস্য যিনি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গুরুভার দায়িত্ব সামলেছিলেন

(সূত্রঃ Mahammed Daud, The Indian Seamen's Union: History and Developments গ্রন্থ কর্তৃক সংগৃহীত)

চিত্র নং – ৭

কে. আহমেদ ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন –এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য যিনি ১৯২৩ সালে সভাপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন

(সূত্রঃ Mahammed Daud, The Indian Seamen's Union: History and Developments গ্রন্থ কর্তৃক সংগৃহীত)

চিত্র নং – ৮

সৈয়দ মিন্নাত আলি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন –এর একজন কোষাধ্যক্ষ

(সূত্রঃ Mahammed Daud, The Indian Seamen's Union: History and Developments গ্রন্থ কর্তৃক সংগৃহীত)

চিত্র নং – ৯

ঔপনিবেশিক বাংলায় সীমেন্স ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বদানকারী একজন অভিবাসী নাবিক আফতাব আলি

(সূত্রঃ https://en.banglapedia.org/index.php/Ali,_Aftab)

চিত্র নং – ১০

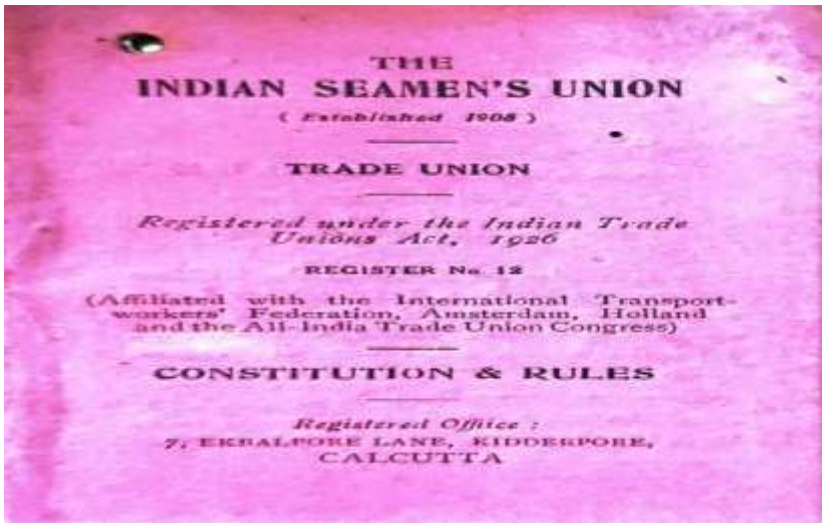
THE
INDIAN SEAMEN'S UNION
(Established 1908)

TRADE UNION

Registered under the Indian Trade Unions Act, 1926

REGISTER No. 12

(Affiliated with the International Transport-workers' Federation, Amsterdam, Holland and the All-India Trade Union Congress)

CONSTITUTION & RULES

Registered Office :
7, EKBALPORE LANE, KIDDERPORE,
CALCUTTA

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকৃত ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন –এর কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রুলস্ বইয়ের শিরোনাম পৃষ্ঠা

(সূত্রঃ KPT Library, Kolkata)

চিত্র নং – ১১

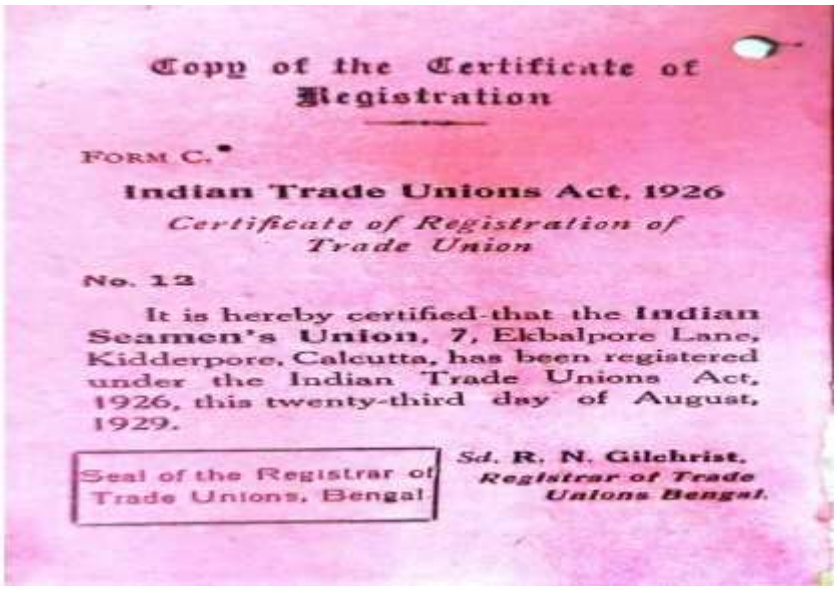

Copy of the Certificate of Registration

FORM C.

Indian Trade Unions Act, 1926

Certificate of Registration of Trade Union

No. 12

It is hereby certified-that the **Indian Seamen's Union**, 7, Ekbalpore Lane, Kidderpore, Calcutta, has been registered under the Indian Trade Unions Act, 1926, this twenty-third day of August, 1929.

Seal of the Registrar of Trade Unions, Bengal

Sd. **R. N. Gilchrist,**
Registrar of Trade Unions Bengal.

১৯২৬ -এর ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুযায়ী ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

(সূত্রঃ ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রুলস্ বই)

চিত্র নং – ১২

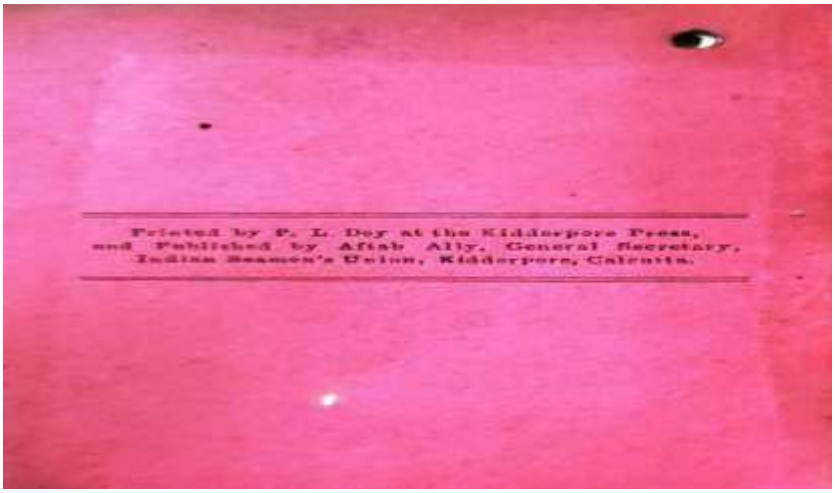

Printed by P. L. Dey at the Kidderpore Press, and Published by Afiab Ally, General Secretary, Indian Seamen's Union, Kidderpore, Calcutta.

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকৃত ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন –এর কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রুলস্ বইটি কলকাতার খিদিরপুর থেকে আফতাব আলির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল

চিত্র নং – ১৩

ঔপনিবেশিক বাংলার কলকাতায় ব্রিটিশদের দ্বারা নির্মিত সেলরস্ হোম ভবনটির ছবি

(সূত্রঃ British Library)

চিত্র নং – ১৪

রেঙ্গুন বন্দরে অবস্থানরত BISN কোম্পানির মেল স্টিমারের ছবি (c. ১৯২০s)

(সূত্রঃ British Library)

চিত্র নং – ১৫

হাওড়া ব্রিজ থেকে তোলা ছবিটিতে হুগলী নদীতে স্টিমশিপ স্টিমার ও বোটগুলির সঞ্চালন (c. ১৮৯০)

(সূত্রঃ British Library)

চিত্র নং – ১৭

ইডেন গার্ডেন থেকে হুগলী নদীর তীরে নোঙর করা পালতোলা জাহাজের দৃশ্য (c. ১৮৭২)

(সূত্রঃ British Library)

চিত্র নং – ১৮

কাস্টম হাউস ঘাটে হুগলী নদীর ভাটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা পালতোলা জাহাজগুলির দৃশ্য (c. 1860s)

(সূত্রঃ British Library)

চিত্র নং – ১৯

হুগলী নদী ও কলকাতা বন্দর (c. ১৯০৩)

(সূত্রঃ WIKIMEDIA COMMONS)

চিত্র নং – ২০

বিদ্যাসাগর সেতুর দক্ষিণ দিকে হুগলী নদীতে চলমান স্থানীয় জলযানগুলি কলকাতা বন্দরের পূর্বের ঐতিহ্যের ক্ষীয়মাণ ধারা অব্যাহত রেখেছে যা ছবিতে ধরা দিয়েছে

(ছবিটি আজহারুল মিদ্দা বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ২৯.০৮.২০১৯ তারিখে ক্যামেরা বন্দী করেছেন)

চিত্র নং – ২১

হুগলী নদীতে স্থানীয় ফেরী পরিবহণে স্টিমার যাত্রার দৃশ্য বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে

(ছবিটি আজহারুল মিদ্দা হাওড়া ঘাটে স্টিমার থেকে ১৭.০৩.২০২২ তারিখে ক্যামেরা বন্দী করেছেন)

চিত্র নং – ২২

হুগলী নদীর উপর হাওড়া ব্রিজের দুপাশে ঐতিহ্যময় ফেরী ও স্টিমার পরিবহণের দৃশ্য

(ছবিটি আজহারুল মিদ্দা হাওড়া ঘাটে স্টিমার থেকে ১৭.০৩.২০২২ তারিখে ক্যামেরা বন্দী করেছেন)

চিত্র নং – ২৩

এশিয়ার লস্করদের মধ্যে বাংলার লস্করের ছবিটিও ফ্রেম বন্দী (c. ১৮৭৩)

(সূত্রঃ British Library)

চিত্র নং – ২৪

গান্দা সিং একজন পাঞ্জাবী শিখ যিনি বাংলার হাওড়ার বাসিন্দা ছিলেন, তিনি গদর আন্দোলন এবং কোমাগাতামারুর ঘটনার এক দশক পরেও এই উপনিবেশ বিরোধী ঘটনাগুলির অনুসরণকারী ছিলেন

(সূত্রঃ West Bengal State Archives, Kolkata)

চিত্র নং – ২৫

আমেরিকা থেকে ভারতে বিতাড়িত হওয়া গান্দা সিং -এর ইমার্জেন্সি সার্টিফিকেট

(সূত্রঃ West Bengal State Archives, Kolkata)

সাক্ষাৎকার

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭) শিরোনামের গবেষণা কার্যটিতে ঔপনিবেশিক সময়কালীন বাংলার কলকাতা বন্দরে কর্মরত এক নাবিকের বংশধরের সাক্ষাৎকারঃ

সাক্ষাৎকারীর নামঃ সৈয়দ মাসুদ আলি

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আজহারুল মিদ্দা

তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৪

ঔপনিবেশিক বাংলায় কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে জাহাজের কাজে যোগদান করার জন্য বহু নাবিক বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে বন্দর সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে ভাড়া বাড়ী কিংবা আত্মীয়তার সূত্রধরে কলকাতায় থাকতে শুরু করেছিল। সেভাবেই সৈয়দ মাসুদ আলির বাবা সৈয়দ মাকসুদ আলি বর্ধমানের আনখোনা গ্রাম থেকে কলকাতা বন্দরে জাহাজের কাজে যোগ দিয়ে কলকাতার সারেং লেন –এ পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেছিলেন। সৈয়দ মাসুদ আলির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর বাবার জাহাজে নাবিক হিসাবে কর্মজীবনের বহু কিছু তথ্য তাঁর স্মৃতিচারণায় আমার কাছে তুলে ধরেছেন। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন তাঁর বাবা মাকসুদ আলি ১৯৩৭-৩৮ সাল নাগাদ কলকাতা বন্দরে জাহাজের কাজে যোগদান করেছিলেন এবং ১৯৭৩ সালে জাহাজে কর্মকালীন অবস্থায় মৃত্যু ঘটার মধ্যদিয়ে আনুমানিক দীর্ঘ ৩৫ কিংবা ৩৬ বছরের জাহাজে কর্মজীবনের ইতি টেনেছিলেন। তিনি কর্মজীবনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেইড, জার্মানির বার্থ, আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দর শহর, মোম্বাসা, আবিসিনিয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ, সুয়েজ ক্যানেল, পোর্ট সৈয়দ, ব্রিটেনের লন্ডন, আমেরিকা ইত্যাদি আরও অনেক দেশ এছাড়া তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি যেমন শ্রীলঙ্কা, জাপান, ফিলিপিন্স, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, হংকং, ভিয়েতনাম, চীন প্রভৃতি দেশে প্রায়শই জাহাজের কর্মসূত্রে গিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকা যাত্রাকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমেরিকার নরফোক জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। জাহাজে কর্মকালীন অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার জন্য কর্মরত জাহাজের সন্নিকটবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

আমার গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গে যোগসূত্র থাকায় সৈয়দ মাসুদ আলির সাথে সাক্ষাৎকারে আমি কিছু প্রশ্ন তাঁর কাছে উপস্থাপন করি। যেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল –

প্রশ্নঃ সৈয়দ মাসুদ আলিকে জিজ্ঞাসা করা হয় যিনি জাহাজে কাজ করতেন তিনি সম্পর্কে আপনার কে হন?

উত্তরঃ উত্তরে সৈয়দ মাসুদ আলি জানান জাহাজে কর্মরত সৈয়দ মাকসুদ আলি সম্পর্কে তাঁর বাবা হন।

প্রশ্নঃ আমি পরবর্তী প্রশ্ন তাঁর কাছে উত্থাপন করি যে কোন সময়কালে সৈয়দ মাকসুদ আলি জাহাজের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি মূলত কোন পদে জাহাজ কর্মে যুক্ত ছিলেন?

উত্তরঃ এই প্রশ্নের উত্তরে সৈয়দ মাসুদ আলি বলেন তাঁর বাবা অর্থাৎ সৈয়দ মাকসুদ আলি ১৯৩৭/৩৮ সময়কাল থেকে নিয়ে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত জাহাজের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯৭৩ সালেই জাহাজে কর্মকালীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি প্রথমে টিন্ডাল হিসাবে জাহাজের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর দক্ষতা এবং কর্ম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পদোন্নতি ঘটিয়ে সুখানী এবং কোয়ার্টার মাস্টার হিসাবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

প্রশ্নঃ এরপর ওনার কাছে আমি জানতে চাই সৈয়দ মাকসুদ আলি কোন কোন জাহাজের কাজে নিযুক্ত ছিলেন?

উত্তরঃ এর উত্তরে উনি জানান তাঁর বাবা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন (BISN), বিবি লাইন (Bibby Line), লিভার ব্রাদার্স (Liver Brothers), প্যাসিফিক ওসেন শিপিং কোম্পানি (Pacific Ocean Shipping Company) এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়া লাইন (British India Line) -এর MS Dunera নামক একটি স্কুল বয় জাহাজে যুক্ত ছিলেন।

প্রশ্নঃ পরের প্রশ্নতে সৈয়দ মাসুদ আলিকে আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁর বাবা জাহাজে কর্মকালীন সময়ে কোনো প্রতিকূল অবস্থার কথা কখনো পরিবারবর্গের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন?

উত্তরঃ উত্তরে জানতে পারি অনেকবারই তিনি জাহাজে কর্মরত অবস্থায় প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি, যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুপক্ষের আক্রমণের ভয়ে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন। এসময় তিনি আল্লাহ, নবী-রসুল, পীর-পয়গম্বর, অলি-আউলিয়াদের স্মরণ করে মনকে শান্ত করতেন এবং পুনরায় নতুন স্ফুরণ নিয়ে জাহাজের কাজে লিপ্ত হতেন। তবে দীর্ঘদিন জাহাজের মধ্যে কাজ করার ফলে একসময় সৈয়দ মাকসুদ আলি Sea-Sickness জনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন, সে কথাও আমার কাছে ব্যক্ত করেছেন তাঁর ছেলে সৈয়দ মাসুদ আলি। এই অসুস্থতার কারণে তাঁকে আমেরিকার নরফোক জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

প্রশ্নঃ এরপর তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় জাহাজে কর্মরত অবস্থায় তাঁর বাবা কি কখনো উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারীর দ্বারা হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন?

উত্তরঃ এই প্রশ্নের উত্তরে সৈয়দ মাসুদ আলি জানান অন্যান্য অনেক জাহাজে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অনেক অসাম্যমূলক আচরণে যুক্ত থাকলেও তাঁর বাবা যে জাহাজে কাজ করতেন সেখানে তাঁকে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দ্বারা হেনস্থার শিকার হতে হয়নি।

প্রশ্নঃ পরবর্তী প্রশ্নতে আমি সৈয়দ মাসুদ আলিকে জিজ্ঞাসা করি তাঁর বাবা জাহাজে কর্মরত অবস্থায় বেতন জনিত সমস্যা বা কর্মকালীন অসাম্যমূলক কোনো আচরণের বিরুদ্ধে কখনো জাহাজ কর্মীদের প্রতিবাদ করতে দেখেছিলেন? বা তিনি নিজে কখনো প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন?

উত্তরঃ উত্তরে জানতে পারি জাহাজে কর্মসম্পাদনের সময় বেতন জনিত সমস্যা এবং জাহাজে কর্মকালীন অসাম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রায়শই কলকাতার তালতলায় নাবিকদের সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছিল, যেখানে সৈয়দ মাকসুদ আলিও সামিল হয়েছিলেন। এছাড়া আরও একটি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে বাংলার ক্ষতিগ্রস্ত নাবিকদের যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা থেকে সৈয়দ মাকসুদ আলি সহ বাংলার নাবিকেরা বঞ্চিত হয়েছিল।

সৈয়দ মাসুদ আলির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আরও কিছু বিষয় ফুটে উঠেছে যেগুলি আমার গবেষণায় সমৃদ্ধি ঘটাতে অনেকটা প্রভাবিত করবে বলে আশা করা যায়। সৈয়দ মাকসুদ আলি যে জাহাজের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁর সার্ভিস বুক CDC (Continuous Discharge Certificate) –র (যেটি নলিও বলা হত) কথা সৈয়দ মাসুদ আলি উল্লেখ করেছেন। এই CDC নাম্বারটি তিনি আমাকে সাক্ষাৎকারের পরে পাঠিয়েছেন, যার সার্ভিস বুক নাম্বারটি হল CDC No. 15068 Registered. No. 084. এছাড়া আরও কিছু তথ্য জানতে পারি মাকসুদ আলির কাকা সৈয়দ হামিদ আলি জাহাজে সারেং হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তবে সৈয়দ হামিদ আলির নাম, তাঁর জাহাজে সারেং হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার কথা এবং কলকাতার সারেং লেনে বসবাস সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য জানা গেলেও এর বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

সাক্ষাৎকারীর স্বাক্ষর

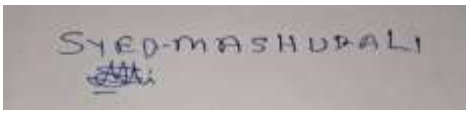

চিত্র নং – ২৬

কলকাতার তালতলার সারেং লেন –এর ছবি যা ঔপনিবেশিক বাংলার সারেং, সুখানী নাবিকদের আবাসনস্থল ছিল

(কলকাতার সারেং লেন -এর ছবিটি আজহারুল মিদ্দা ২৫.০৮.২০২৪ তারিখে ক্যামেরা বন্দী করেছেন)

চিত্র নং – ২৭

চিত্র নং – ২৮

চিত্র নং – ২৯

চিত্র নং – ৩০

কলকাতার তালতলার সারেং লেন এবং এর পাশাপাশি বাড়িগুলির ছবি

(কলকাতার সারেং লেন -এর ছবিগুলি আজহারুল মিদ্দা ২৫.০৮.২০২৪ তারিখে ক্যামেরা বন্দী করেছেন)